ইমদাদুস্ সুলূক

(আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর মহব্বত লাভের অনন্য সহায়িকা)

কুতুবে আলম ইমামে রাব্বানী
হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মাদ গঙ্গোহী রহ.

অনুবাদক
মাওলানা নূরুল আলম নদভী
প্রাক্তন মুহাদ্দিস ও আদীব
আহছানাবাদ রশীদিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা
চরমোনাই, বরিশাল।

সম্পাদনা
মাওলানা আলাউদ্দীন আবদুল হাকীম
ফাযেলে দারুল উলূম হাটহাজারী
প্রকাশনা কর্মকর্তা, বামুক

মুজাহিদ প্রকাশনী

ইমদাদুস্ সুলূক

প্রকাশক
মুজাহিদ প্রকাশনী

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী/২০০৭ ইং
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল/২০১০ ইং
তৃতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর/২০১২ ইং
চতুর্থ মুদ্রণ : এপ্রিল/২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস
মুজাহিদ কম্পিউটার

মূল্য : ৭০.০০ (সত্তর টাকা) মাত্র।

বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি
আল-মদীনা প্লাজা (৩য় তলা)
৫/১/৩, সিমসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১১ ৪০ ৪০, ফ্যাক্স : ০২-৯৫১২১৫৪

আমীরুল মুজাহিদীন আলহাজ হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম, পীর সাহেব, চরমোনাই রহ. এর

দোয়া ও বাণী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ

আল্লাহ তায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা, রহমতে দোজাহাঁ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ ইলমে তাসাউফ শিক্ষা ও বাস্তব জীবনে তার আমলের প্রয়োজনীয়তার ওপর কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের তরীকার অন্যতম বুযুর্গ কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী রহ. কর্তৃক সংকলিত তাসাউফ জগতের উচ্চ মানের একটি কিতাব **'ইমদাদুস্ সুলূক'**। এ বক্ষমান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন জামিয়া রশীদিয়া আহছানাবাদ চরমোনাই কওমিয়া মাদাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস ও আদীব আমার স্নেহধন্য মাওলানা নূরুল আলম নদভী।

আমি মনে করি, কিতাবটি সর্বস্তরের মুসলমান বিশেষ করে তরীকতপন্থীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি, কিতাবখানা পাঠ করে আমলে যিন্দেগী গড়ার মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় উম্মত হতে পারবেন।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা কিতাবটি পাঠ করে মুসলমানগণকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং পাঠক, লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন এবং কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ রাহ. এর রূহানী ফয়েয ও বারাকাত আমাদের সকলের নসিব করুন। আমীন!

(সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম)
পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল।

উৎসর্গ

যাঁদের আদর ও মমতার স্নিগ্ধ পরশে দিনে দিনে বড় হয়েছি, যাঁদের দীক্ষা, অসীম ত্যাগ ও নেকদোয়ায় ইল্‌ম শিক্ষার তাওফীক হয়েছে, আমার সে শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতাকে।

হে আল্লাহ্! আমার এ ক্ষুদ্র খেদমতটুকু কবুল করে এর অসীলায় তাঁদেরকে ও তাঁদের সন্তানদেরকে উভয় জাহানে সুখী করুন।

আমীন!

নূরুল আলম

উপহার

ইমদাদুস্ সুলূক বইটি আমার শ্রদ্ধেয় / স্নেহের

জনাব/বেগম .... গ্রাম :......................... পো-..

উপজেলা :.................... জেলা :....................................... কে হাদিয়া দিলাম।

স্বাক্ষর

নাম : ....

ঠিকানা:..

....

অনুবাদকের কথা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشۡرَفِ الۡاَنۡبِيَاءِ وَالۡمُرۡسَلِيۡنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحۡبِهٖ اَجۡمَعِيۡنَ اَمَّا بَعۡدُ

তাসাউফ ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান বুনিয়াদ। কুরআনে মাজীদ ও হাদীসে নববীর মধ্যে এর অতীব প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব ফিক্হ, হাদীস, তাফসীরের মত এর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এর নাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় ইহ্সান। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

اَلۡاِحۡسانُ ...اَنۡ تَعۡبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنۡ لَّمۡ تَكُنۡ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

অর্থাৎ, ইবাদত হচ্ছে, মা'বূদকে প্রত্যক্ষ করার স্তরে পৌঁছে যাওয়া। এর নামই ইহ্সান। এটি ইলমের সর্বোচ্চ স্তর। এর ওপরের স্তরে আরোহণ ও উন্নতি সাধন মানুষের জন্য কেবল অসম্ভবই নয়; বরং কল্পনাতীত। ইসলামে ইহ্সানের সঠিক বিশ্লেষণ ও অবস্থান এটিই। সকল তরীকার ইমামগণ যেমন হযরত জিলানী রহ., হযরত সোহরাওয়ার্দী রহ., হযরত চিশ্তী রহ., হযরত নক্শবন্দী রহ. প্রমুখ মাশায়েখে তরীকত সম্বিলিতভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। কিন্তু মাঝখানে এক শ্রেণির নামধারী বাতিল পীর-ফকীরের বিভ্রান্তিকর অপতৎপরতার কারণে এর ওপর কুসংস্কারের মোটা আবরণ পড়ার ফলে তার প্রকৃত স্বরূপ বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তীকালে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ., হযরত শাহ অলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ও তাঁর খলিফাবৃন্দ যেমন- ইমামে রাব্বানী কুতুবে আলম রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী রহ. ও হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশ্রাফ আলী থানভী রহ. এর মত মহান ইমামগণের অক্লান্ত শ্রমের ফলে এ মহান শাস্ত্রটি বিদ্‌য়াত ও কুসংস্কারমুক্ত হয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنۡ هٰذِهِ الۡاُمَّةِ خَيۡرًا

আজ আমরা তাসাউফ বলতে বুঝি, কুরআন ও হাদীসের স্বচ্ছ, অপরিহার্য বা উত্তম শিক্ষাবলী। এর মধ্যে কতক বিষয় এমন রয়েছে, যার ওপর পরকালীন নাজাত নির্ভরশীল। কতক হচ্ছে আদাব ও আফযাল তথা শিষ্টাচার ও উত্তম পর্যায়ের। অধিকন্তু এগুলো মহান আল্লাহর অধিক সন্তুষ্টি লাভের কারণ। অনন্তর এটি সিরাতে মুস্তাকীম তথা নবী ও অলীগণের পথ ও উলুল আল্বাব তথা মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত মহা জ্ঞানীদের ইলম।

সম্প্রতি বিশ্বের একটি বিশাল জনগোষ্ঠি তাসাউফবিমুখ হয়ে পড়েছে। অথচ হাদীসে জিবরাঈলের মধ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সান এ তিনের সমষ্টিকে দীন আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহের মত ইহ্সানও একটি স্বতন্ত্র বিষয় ও শাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। আজ যা তাসাউফ ও সুলূক নামে পরিচিত।

এ তাসাউফের ব্যাপারে উদাসীনতার মূল কারণ হচ্ছে জাহালত ও আহলুল্লাহর সোহ্বত থেকে বঞ্চনা। সোহ্বতশূন্য ইল্ম অনেক ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে অধিক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। বস্তুত ইল্মের অনিবার্য সুফল হচ্ছে আল্লাহ ভীতি।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّمَا يَخۡشَى اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا

"আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করেন।"

(সূরা ফাতির : আয়াত-২৮)

কিন্তু সোহবতশূন্য ইল্ম আল্লাহভীতির পরিবর্তে ধৃষ্টতা ও বেয়াদবিকেই কেবল বৃদ্ধি করে। এ সমস্যার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে মুসলিহীন তথা আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের সান্নিধ্যে ও তার তত্ত্বাবধানে পর্যাপ্ত সময় কাটানো।

আলেম হোক বা জাহেল জ্ঞানী হোক বা মূর্খ এ ইল্‌ম হাসিল করা সবার জন্য জরুরি। যার তাসাউফের সর্বোচ্চ স্তর তথা ইহ্‌সান হাসিল হয়নি, সে যেমন আত্মপরিচয় লাভে ব্যর্থ, তেমনি রাব্বুল আলামীনের মারেফত হতেও বঞ্চিত।

এমন ইল্‌মকে কিভাবে অস্বীকার করা যায় যখন স্বয়ং আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

"কিয়ামত দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; কেবল কাজে আসবে রোগমুক্ত ও সুস্থ একটি অন্তর।"(সূরা শুআ'রা : আয়াত-৮৯)

আল্লাহ্‌ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"বলুন, আমার পালনকর্তা! তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরণের অশ্লীলতা হারাম করেছেন।"

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩৩)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অনু পরিমান অহংকার বিদ্যমান থাকবে।" (মুসান্নাফে আবি শাইবা : ১৯/২৯৯, মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদ : ৩/৪৪৫)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

"আগুন যেমনিভাবে জ্বালানী খেয়ে ফেলে তদ্রূপ হিংসা-দ্বেষও পরশ্রীকাতরতাও নেকীসমূহকে খেয়ে ফেলে।"

(জামে সগীর : ১/৪৪৯, মুসান্নাফে আবি শাইবা : ২১/৪৭৮)

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ

"নিশ্চয়ই কিয়ামতে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে এমন আলেমের যে স্বীয় ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না।"

(তাবরানি : ১/৩০৫, কানযুল উম্মাল : ৬/৩৪৩)

প্রশ্ন হল, অন্তরের রোগ বলতে কী বোঝানো হয়েছে, যার সুচিকিৎসা করে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে? গোপন ও সুপ্ত অশ্লীলতা কী, যা পরিত্যাগের নির্দেশ এসেছে কুরআন মাজীদে? অহংকারের সংজ্ঞা কী? যার সর্বনিম্ন পরিমাণও জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক এবং তার প্রতিকারই বা কী? হিংসা কী? যা সারা জীবনের উপার্জিত নেকীসমূহ ভস্ম করে দিবে? আসলেই তা আমার জীবনের সকল কামাই শেষ করে দিয়েছে কী-না? অথচ আমি নিজেকে বড় সাধু ও নির্দোষ ভেবে বসে আছি।

আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

"বলুন, আমি কী তোমাদেরকে সে সব লোকের সংবাদ দেব? যারা কর্মের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে সকল লোক, যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনা দুনিয়ার পেছনে নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ মনে করে বসে আছে যে, তারা বড় ভালো কাজ করে চলেছে।" (সূরা কাহাফ : আয়াত-১০৩-৪)

পৃথিবীতে এমন কোনো শাস্ত্র আছে কী যে, এসব প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিতে সক্ষম? এসব সমস্যার সমাধান দিবে? মানুষকে এ ধরণের রোগ-ব্যাধি থেকে পূর্ণ আরোগ্য করে তার আখেরাতের সফলতা নিশ্চিত করবে? এর জবাবে সকলেই নিরব।

এর সঠিক উত্তর/সমাধান কেবল তাসাউফের মাঝেই বিদ্যমান আছে। এটি্ই হচ্ছে ইহ্সান তথা তাসাউফের মূল্য আলোচ্য বিষয়। এবার আপনিই বলুন, এমন গুরুত্ববহ একটি শাস্ত্রকে শরীয়ত পরিপন্থী আখ্যায়িত করা কত বড় অন্যায়।

সম্প্রতি সমাজে এক শ্রেণির জনদরদি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তাসাউফ শব্দটি শুনলেই তাদের অন্তর্জ্বালা শুরু হয়ে যায়, বেশ কষ্ট পান তারা। পরন্তু সূফী সাহেব বা সূফিবাদ শব্দটি আজ একটা গালিতে পরিণত হয়েছে। তবে এর দ্বারা যদি মধ্যবর্তীকালীন ভেজাল তাসাউফ উদ্দেশ্য হয়, তবে আপত্তি নেই। আর যদি খাঁটি ইসলামী তাসাউফকে কটাক্ষ করা হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক।

ইতিহাসে বহু দেশের নাম বদলে গেছে, তাই বলে ভূ-খন্ডও কী পাল্টে গেছে? তদ্রূপ লোকমুখে ইহ্সানের নাম পড়েছে তাসাউফ, তাই বলে মূল বিষয়ের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা কোন্ ধরণের সুবিচার?

অনেকে আবার যিকির-আযকারকেই মুখ্য মনে করে। এটা ঠিক নয়। আসল জিনিস হচ্ছে ইসলাহে বাতেন বা আত্মশুদ্ধি যা কেবল সত্যবাদী ও আল্লাহ্ওয়ালাদের সাহচর্যে হাসিল হয়।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"তোমরা সাদেক্বীনদের (সত্যবাদীদের) সঙ্গী হও।" (সূরা তাওবা : আয়াত-১১৯)

আল্লামা আ'লূসী বাগদাদী রহ. 'তাফসীরে রূহুল মাআ'নী' এ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, اَیْ خَالِطُوْهُمْ لِتَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ

অর্থাৎ, তোমরা সাদেকীনদের (সত্যবাদীদের) সাথে এত বেশী ওঠা-বসা কর, যাতে আমল-আখলাকে তোমরাও তাঁদের মত হতে পার।

নামকা ওয়াস্তে কেবল বাইয়াত হলেই চলবে না; বরং আপন চিকিৎসক তথা শায়খের পরামর্শের অধীনে স্বীয় জীবনের সংশোধন করতে হবে তবেই কামিয়াবীর আশা করা যায়। নিজে নিজে যিকির ও আমল করলে তখন এ আমলই অহংকারের কারণ হতে পারে- কী চাও, আমি বড় যাকির ও আমলকারী হয়ে গেছি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আল্লাহুম্মা আমীন!

কিতাব পরিচিতি

"রেসালায়ে মক্কিয়া" ইলমে তাসাউফের একটি প্রসিদ্ধ আরবী কিতাব। রচয়িতা অষ্টম হিজরী শতাব্দীর তাসাউফ শাস্ত্রের ইমাম শায়খুল মাশায়েখ আরেফ বিল্লাহ হযরত কুতুবুদ্দীন দামেশ্কী সোহরাওয়ার্দী রহ.। তদানীন্তন পাক-ভারত উপমহাদেশের তরীকতের পথিকৃত কুতুবে আলম ইমামে রাব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী রহ. স্বীয় চাচা পীর ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে শামিলী প্রান্তরের শহীদ বীর সেনানী হযরত যামিন রহ. এর আদেশক্রমে তৎকালীন ভারতের ভাষা ফারসীতে আলোচ্য কিতাবের নির্বাচিত কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ করেন। অনূবাদগ্রন্থটির নামকরণ করেন "ইমদাদুস্ সুলূক"। আপনার হাতের কিতাবটি সে ইমদাদস্ সুলূক এরই বঙ্গানুবাদ।

অনূবাদের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়, ঠিক সে মুহূর্তে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ কৃত "ইমদাদুস্ সুলূক" এর এক অনুবাদ গ্রন্থটিও হস্তগত হয়। ইলমে তাসাউফের কিছু পরিভাষা ও আরবী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আল্লামার অনূবাদগ্রন্থ থেকে বেশ উপকৃত হয়েছি। এজন্য আল্লামার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

সংক্ষিপ্ত কলেবরে অনুদিত একটি কিতাব মানুষের জীবনে এনে দিতে পারে আমুল পরিবর্তন। হৃদয় সমুদ্রে সৃষ্টি করতে পারে উত্তাল তরঙ্গ, এ কিতাবটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে হ্যাঁ, এখানে একটি কথা থেকে যায়, এ কিতাব থেকে উপকৃত হবে কে? যে আল্লাহ্ অন্বেষী, মাওলার পথে আগানোর জন্য প্রস্তুত। অভাব কেবল একজন পথের দিশারীর। এ কিতাব দিবে সে পথনির্দেশনা। যেমন- কুরআন কারীম মানবজীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। কথা হচ্ছে, সে সৌভাগ্য কার ভাগ্যে? পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, যে তাকওয়ার পথে চলে বা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত।

অনূবাদ কালে কিতাবের যথাযোগ্য আদব রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সে জন্য মাওলা পাকের দরবারে কায়মনোবাক্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

রাব্বুল আলামীন! জীবনের ভুল-ভ্রান্তি অগণন। "ইমদাদুস্ সুলূক" এর সাথে তায়াল্লুকের অসীলায় ও তোমার আরহামুর রাহিমীন সিফাতের গুণে তোমার অনুতপ্ত গোলামকে মা'ফ করে দাও এবং সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর অবিচল রাখ। অনুবাদের ক্ষেত্রে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজ গুণে ক্ষমা কর। কিতাবে উল্লেখিত আরেফীনে কামেলীন ও মাশায়েখে এযামের ফুয়ূয ও বারাকাত দ্বারা আমাদের কলব সমৃদ্ধ কর। তোমার মাগফিরাতের ছিঁটে ফোঁটা পাওয়ার আশায় তোমার দুয়ারে পড়ে রইলাম।

রাব্বুল আ'লামীন! তুমি হাজার বার 'না' বললেও তোমার পাক দরবারই এ গোলামের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

اَللّٰهُمَّ بِبَابِكَ اَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنِيْ وَاِلٰى جَنَابِكَ الْمُصْطَفٰى اَنْتَسِبُ فَلَا تَبْعُدْنِيْ وَاِيَّاكَ أَسْأَلُ فَلَا تُخَيِّبْنِيْ.

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্ নাবিয়্যিল কারীম।

নাচিজ
নূরুল আলম
২২ রজব, ১৪২৭ হি.

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ-১
সুলূক ও তরীকতের গুরুত্ব ও লক্ষ্য
অনুচ্ছেদ-২
তালেবে হক বা সত্যান্বেষী সালেকের দাায়িত্ব ও কর্তব্য
অনুচ্ছেদ-৩
সালেকের জন্য কামেল পীরের আবশ্যকতা
অনুচ্ছেদ-৪
কামেল ও খাঁটি পীরের পরিচয়
অনুচ্ছেদ-৫
কামেল শায়খ বা পীর হওয়ার শর্তাবলি
শায়খের নিঃশর্ত আনুগত্য মুরীদের অন্যতম কর্তব্য
অনুচ্ছেদ-৬
সুলূকের প্রাথমিক আমল ও সূচনা পরিশুদ্ধির শর্তাবলি
শর্ত-১ : সব সময় অযূ অবস্থায় থাকা
শর্ত-২ : বেশি বেশি নফল রোযা রাখা
শর্ত-৩ : নীরবতা অবলম্বন করা
শর্ত-৪ : খিলওয়াত বা নির্জনবাস অবলম্বন করা
খিলওয়াতনাশী'র আদব
খিলওয়াত সম্পর্কে একটি সংশয় ও তার নিরসণ
খিলওয়াত বা নির্জবাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
খিলওয়াত বা নির্জনবাসের সুফল ও উপকারিতা
খিলওয়াতের মাঝে নিহিত রয়েছে বিরাট হিকমত
সতর্কবাণী
পরিশিষ্ট
শর্ত-৫ : মতলব কলবে হাজির রেখে যিতির করা
যিকিরের পদ্ধতি
যিকিরের শর্তাবলি
যিকিরের উপকারিতা ও সুফল
রেসালায়ে মক্কিয়ার গ্রন্থকার ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী রহ. এর
শাজরানামা
সতর্কবাণী
সারকথা

যিকিরের প্রকার ও তার বিশ্লেষণ
যিকির সুফল প্রাপ্তির জন্য আল্লাহপ্রেমিকের করণীয়
শর্ত-৬ : খাওয়াতির বা অন্তরে উদিত অবাঞ্ছিত চিন্তা
পরিত্যাগ করা
খাতরা বা মনের মাঝে উদিত ভাবনা প্রকার ও তার বিশ্লেষণ
শর্ত-৭ : পূর্ণ ভক্তিসহ শায়খের সাথে কলবী সম্পর্ক রাখবে
শর্ত-৮ : কখনই আল্লাহর বিরুদ্ধে আপত্তি
উত্থাপন করা যাবে না
অভিযোগ প্রবণতা ত্যাগ করা
সম্পূরক পর্যালোচনা
অনুচ্ছেদ-৭
সব সময় সালেককে ইবাদতে ব্যস্ত থাকতে হবে
অনুচ্ছেদ-৮
কথা কেবল জনসাধারণের উপকারের নিয়তে বলবে
যাহেরী এহ্‌তেরাম
বাতেনী এহ্‌তেরাম
অনুচ্ছেদ-৯
আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতের বর্ণনা
ফায়দা
অনুচ্ছেদ-১০
দেহের অভ্যন্তরীণ স্তর এবং মুরীদের দৃষ্টি কোথায়
থাকবে ও কখন সে ইবাদতের যোগ্য হবে
অনুচ্ছেদ-১১
তরীকতের যাহেরী ও বাতেনী রোকন এবং
সালেকের শ্রেণিবিন্যাস
আদব রক্ষা করা
সূফিয়ায়ে কেরামের আখলাক
মা'রেফত মর্মার্থ
অনুচ্ছেদ-১২
উসূলে দীন বা দীনের মূলনীতি ও ইলমের স্তর
ইলমে লাদুন্নী
ঈমান
ইবাদত
হাকীকত
অনুচ্ছেদ-১৩

সহীহ ইলম ও আমলে সালেহ এর গুরুত্ব এবং
ঈমান ও তাকওয়ার স্তর
ঈমান ও তাকওয়ার স্তর
তাকওয়া
আল্লাহর অলী কে
অনুচ্ছেদ-১৪
খিলওয়াত বা নির্জনবাস অবলম্বনকারীদের কয়েকটি ঘটনা
মানুষ তৈরির উপাদান ও তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য
অনুচ্ছেদ-১৫
উম্মতের মুহাম্মদী সা. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব
পরিশিষ্ট
কয়েকটি ব্যবহারিক পরিভাষা ও তার বিশ্লেষণ
অনুচ্ছেদ-১৭
মোটকথা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চর্মচোখ দ্বারা
আত্মশুদ্ধির ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নফ্‌সকে
নূরে রূপান্তরিত করা সম্ভব
নফ্‌সের সায়ের
উপসংহার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ-১

সুলূক ও তরীকতের গুরুত্ব ও লক্ষ্য

সুলূক ও তরীকত দ্বারা উদ্দেশ্য চরিত্র সংশোধন। অর্থাৎ, নিজের ভিতর থেকে কৃপণতা, হিংসা, রিয়া, অহংকার, আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি ঘৃণিত ও নিন্দনীয় স্বভাবগুলো দূর করে তদস্থলে ইখ্‌লাস, দানশীলতা, বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় গুণাবলীতে সুসজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার ঈর্ষণীয় যোগ্যতা অর্জন করা।

সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় তরীকত অর্থ আল্লাহ্ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছার বিভিন্ন ঘাঁটি অতিক্রম করা। প্রথম স্তর হচ্ছে, সার্বক্ষণিক শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ ও তৎকর্তৃক অবধারিত বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে সদা আল্লাহর রেযামন্দি ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। তরীকত বা তাসাউফের প্রথম কাজ হচ্ছে, শরীয়তের সহজ পন্থা পরিত্যাগ করা। সাথে সাথে জায়েয–নাজায়েয প্রভৃতি পরিভাষাকে যথেষ্ট মনে না করে মোস্তাহাব তথা আমলের উত্তম ও উৎকৃষ্ট পন্থাকে অপরিহার্য স্থির করা। উদাহরণ স্বরূপ, বিনা ওযরে শরীয়তে বসে নফল নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু মোস্তাহাব হচ্ছে দাঁড়িয়ে পড়া। এক্ষেত্রে সালেক বা আল্লাহর পথের যাত্রীর জন্য জরুরী হচ্ছে, এ মোস্তাহাবকে নিজের ওপর আবশ্যিক করে নেয়া।

তরীকতের চূড়ান্ত স্তর বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. বলেন, তরীকতের চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে, বেদায়া বা সূচনায় প্রত্যাবর্তন করা। হযরত জোনায়েদ রহ. এর এ কথার মর্মার্থ নির্ধারণে সূফিয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, এখানে বেদায়া দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার মহামহিম সত্তা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালার যাত ও সত্তার দিকে ফিরে আসাই সুলূকের সর্বোচ্চ মাকাম।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তায়ালাই সব কিছুর মূল উৎস ও প্রারম্ভিকা এবং তিনিই সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন স্থল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِلَيْهِ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهٗ

"তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে সবকিছু।" (সূরা হূদ : আয়াত-১২৩)

ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"তাঁর নিকটই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে (ফিরে যেতে) হবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮)

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا

"হে মুহাম্মদ! প্রত্যেক কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আপনার প্রতিপালকের দিকেই আবর্তিত।"

(সূরা নাযিয়াত : আয়াত-৪৪)

অতএব, সালেক ও আল্লাহর পথের পথিক যখন নিজের সূচনা অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র যাতের দিকে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন সে তার চূড়ান্তে উপনীত হতে পারবে। কেউ কেউ বলেছেন, বেদায়া বা সূচনায় প্রত্যাবর্তন অর্থ শিশু অবস্থায় ফিরে যাওয়া। যখন আল্লাহ্ তায়ালা মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করে আকৃতি প্রদান করে তন্মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দিলেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত সেখানে বাহ্যত কোন সংরক্ষক ও প্রতিপালক ছিল না। চরম মুখাপেক্ষীতা, অক্ষমতা ও দীনতায় সে তো একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এসময় সে বিনয়-নম্রতার মত মহৎ গুণে গুণান্বিত এবং হিংসা-দ্বেষ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি দোষ ও রোগ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত ছিল।

তখন তার কোনো আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। এমনকি এ বোধহীনতা ও অনুভূতির বিনাশ সম্পর্কেও ছিল সে সম্পূর্ণ বে-খবর। একজন সালেক যখন নিজের অবস্থাকে অনুরূপ শিশুর মত বানিয়ে নিতে সক্ষম হয়, তখনই সে তরীকতের চূড়ান্ত মাক্‌সাদে উপনীত হয়। এটিই সূফিদের সর্বোচ্চ হালত। এপর্যায়ে পৌঁছার পরেই মাওলা পাকের পূর্ণ আবদিয়ত ও দাসত্ব লাভ হয়। সাথে সাথে নফ্‌সের আবিলতা ও কালিমা থেকে মুক্তি পায়।

তরীকতের মাকাম ও স্তর অগণন এবং প্রত্যেক স্তরেরই সূচনা ও সমাপ্তি আছে। যার এক স্তরে পরিশুদ্ধি ব্যতীত পরবর্তী স্তরে আরোহন অসম্ভব। এ কারণেই হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. বলেছেন, "তরীকতের সূচনা পরিশীলিত না করে কারো পক্ষেই তার শীর্ষে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কোন কোন বুযর্গ বলেছেন, তরীকতের মূলনীতি ভঙ্গ করলে উসূল তথা হাকীকত ও মা'রেফতের সর্বনাশ হয়ে যায়। হযরত আবূ সোলায়মান দারানী রহ.ও একই কথা বলেছেন।

অতএব, তরীকত ও তাসাউফের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে সালেকের পথ পরিষ্কার হয় ও তার জন্য আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা সহজ হয়।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. এর মতে তরীকতের মৌলিক বিষয় পাঁচটি; যথা-

১. দিনের বেলা রোযা রাখা।

২. রাত জেগে ইবাদত করা।

৩. ইখলাস ও একনিষ্ঠতা।

৪. প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রে তারতীব বা অনুক্রমিকতা রক্ষা করা।

৫. সর্বকাজে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা।

হযরত সোহায়েল তস্তরী রহ. এর মতে, তরীকতের মৌলিক বিষয় সাতটি; যথা-

১. কিতাবুল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করা।

২. সুন্নতে নববীর অনুসরণ করা।

৩. হালাল খাদ্য গ্রহণ।

৪. মাখলূককে কষ্ট না দেয়া।

৫. গুনাহ্ পরিহার করা।

৬. অতীত জীবনের পাপরাশি থেকে তওবা করা।

৭. আল্লাহ্ ও বান্দার সর্বপ্রকার হক আদায় করা।

বলাইবাহুল্য, সূফিদের ইল্ম হচ্ছে, নিদৃষ্ট কিছু হালত ও কাইফিয়ত বা বিশেষ অবস্থার নাম। হালত, সে তো আমলের ফলাফল মাত্র। কাজেই, আমলের শুদ্ধতা ব্যতিরেকে কোনোভাবেই কাইফিয়ত পয়দা হতে পারে না। তাই তো সূফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দরূদ ও অযীফা থেকে বঞ্চিত, সে হালত ও ওয়ারেদাত থেকেও বঞ্চিত। অর্থাৎ, তার কলবে মাওলা পাকের পক্ষ থেকে নতুন নতুন ইল্মের উন্মেষ ঘটে না। হযরত আবূ সোলায়মান দারানী রহ. বলেন, যে আমল দ্বারা দুনিয়াতে হুযূরি কলব, আমলের একাগ্রতা, খুশূ-খুযূ ও বিনয়-নম্রতা পয়দা হয় না, সে আমল আখেরাতে কোন কাজে আসবে না।

আমল সহীহ্ হওয়ার জন্য ইসলামী ফিক্হ এর জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরি। নামায, রোযা প্রভৃতি ইবাদতের মধ্যে কোন্টি ফরয, কোন্টি ওয়াজিব, কোন্টি সুন্নত এবং কোনোটি মোস্তাহাব তা অবশ্যই ভালোভাবে জানতে হবে। সাথে সাথে ব্যবহারিক জীবনে হালাল, হারাম ও মাকরূহ্ তথা বৈধাবৈধের জ্ঞান থাকা যে কত জরুরী তো বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং সালেকের জন্য আকীদা-বিশ্বাস সহীহ্ করার পর সর্বাগ্রে দরকার হচ্ছে, মাসয়ালা-মাসায়েলের ইল্ম হাসিল করা।

এ কারণেই কোনো কোনো বুযর্গ বলেছেন, ইল্মহীন আমল রোগী ও আমলহীন ইল্ম হচ্ছে বন্ধ্যা ও নিরর্থক। কাজেই, আমলের পাশাপাশি ইল্ম থাকাই সিরাতে মোস্তাকীম তথা সঠিক পথ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ইল্ম তলব করা ফরয।" এটি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, এখানে ইল্ম বলতে সে জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা ঈমান-আকীদা ও আমাল-আখলাক দুরস্ত হয়। ঈমানের কল্যাণে কলবের আমল আদায় হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্তব্য সম্পন্ন হয় শারীরিক ইবাদতের মাধ্যমে।

এখানে তথাকথিত শরীয়ত পরিপন্থী জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্দেশ্য নয়, যা কেবল কালক্ষেপণের কারণ হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়; বরং আখেরাতে তা হবে লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। কুরআন কারীম হচ্ছে সকল বিশুদ্ধ, নির্মল

ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের উৎস ও ঝর্ণাধারা। অনন্তর এ মহাগ্রন্থ তাওহীদ ও একত্ববাদ, মা'রেফত ও অভিজ্ঞান, ইবাদত, হালত সবকিছুর ইমাম ও পথ নির্দেশিকা।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

"হে মুহাম্মদ! যে কিতাব আপনার ওপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছি, তাই হক ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ তার দ্বারা সত্যায়িত।" (সূরা ফাতির : আয়াত-৩১)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ কর।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যত দিন তোমরা তা দুদৃঢ় হস্তে ধারণ করবে, ততদিন বিপথগামী হওয়ার আশংকা নেই। তার একটি হচ্ছে কুরআন মাজীদ ও দ্বিতীয়টি আহলে বাইত।

অতএব, সালেক নিজে আলেম হলে তো জরুরি দীনি ইল্‌ম তার আছেই। যদি তার দীনি ইল্‌ম না থাকে, তবে তার জন্য অবশ্যই কোন শায়খ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যিনি তাকে সর্বাগ্রে তাওহীদ পরিশুদ্ধ করার জন্য সহীহ্ ইসলামী আকীদা শিক্ষা দিবেন। সাথে জরুরি ফিক্‌হী মাসয়ালা-মাসায়েলও তা'লীম দিবেন। অতঃপর যুহ্‌দ তথা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, মোজাহাদা, সাধনা ও তাকওয়ার পথ দেখাবেন।

প্রবাদ আছে, "যার পীর নেই, তার পীর শয়তান।"

কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, দীনের ওপর চলার জন্য যার সামনে কোন পথ প্রদর্শক তথা পর্যাপ্ত দীনি ইল্‌ম নেই। এমনকি কোনো হক্কানী শায়খ বা পীরের সোহ্‌বত বা সান্নিধ্যও লাভ করতে পারেনি, এ ধরণের মানুষকে শয়তান সহজেই পদচ্যুত ও বিভ্রান্ত করার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেমনই হোক, এ পথে চলার জন্য কোন ইল্‌মের মশাল ও হক্কানী পীরের সোহ্‌বত সংগে রাখা জরুরি যাতে অনায়াসে গোমরাহী থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, ইল্‌ম হচ্ছে কলবের নূর, ইল্‌মবিহীন কলব অন্ধকার ঘরতুল্য। হক্কানী পীর হচ্ছে রাহবার। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

"দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দীনি জ্ঞান না থাকায় সত্য পথ সম্পর্কে অন্ধ, আখেরাতেও সে অন্ধ থাকবে।"

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭২)

আবূ আলী রুদবারী রহ. বলেন, আমি হযরত জোনায়েদ রহ. থেকে তাসাউফ, আবুল আব্বাস ইবনে শুরাইহ্ রহ. থেকে ইলমে ফিক্‌হ, হযরত ছা'লাবা রহ. এর নিকট ইলমে নাহু এবং হযরত ইব্‌রাহীম রহ. এর নিকট ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করেছি। ইসলাহে নফ্‌সের জন্য এসব বিষয়ের জ্ঞানই যথেষ্ট। বুযুর্গানে দীন সবকিছুর ওপর ইল্‌মে দীন শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, ইল্‌ম না থাকলে আমল করা যায় না। বে-ইল্‌ম সালেক অনেক সময় বাতিল আকীদার শিকার হয়ে বিদ্‌য়াতকে সুন্নত ও বাতিলকে হক ভেবে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

আবার অনেককে দাড়ি কাটতে, হাতে লোহার চুড়ি বা রিং পরতে এবং গলায় লোহার জিঞ্জির লটকে রাখতে দেখা যায়। এ জাতীয় কুসংস্কারকে তারা তরীকত ও মা'রেফত মনে করে থাকে। অধিকন্তু একে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার অসীলা বা মাধ্যম জ্ঞান করে। এগুলো হচ্ছে আকীদাগত বিভ্রান্তি। আবার কখনো কখনো আমলের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ভুল করে বসে ফলে সারাজীবনের সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী এক নিমিষে বরবাদ হয়ে যায়। এর চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, ইলমের দৈন্যতার কারণে বেচারা টেরও পায় না যে, তার আমলের এত বিশাল পাহাড় মুহূর্তেই ভস্ম হয়ে গেল।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আমল কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে; যথা-ক. (اطاعت)আমলটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে এবং খ. (اخلاص) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে।

কাজেই, আমল সহীহ্-শুদ্ধ হল কী-না তা যাচাই করার জন্য ইল্ম থাকা চাই।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

"তাদেরকে কেবলমাত্র এ নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে।"

(সূরা বাইয়িনা : আয়াত-৫)

মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা সর্বসম্মত রায় ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয় ফরয, ওয়াজিব ও অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে, তা প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য পালনীয়। যত উচ্চমানের পীর বা অলী হোক না কেন, হুঁশ- জ্ঞান ঠিক থাকা পর্যন্ত সেসব ব্যাপারে মুহূর্তের জন্যও কারো কোন ছাড় বা ছুটি নেই, নেই হ্রাস-বৃদ্ধির কোন অধিকার। সালেক সাধনা করে আধ্যাত্মিকতার যত উচ্চ মাকামই হাসিল করুক না কেন, শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই সে অব্যাহতি পেতে পারে না।

আম্বিয়ায়ে কেরামের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জগতে আর কে হতে পারে? শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিও কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়নি। তাহলে অন্যদের ব্যাপারে এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা মূর্খতা ও ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী হতে পারে? আসল কথা যার মর্তবা যত বুলন্দ, পদমর্যাদা যত বড়, শরীয়তের হুকুম-আহকামও তাঁর ক্ষেত্রে তত শক্ত ও কঠোর হয়ে থাকে। অধিকন্তু জবাবদিহিতাও তাঁর বেশি। তাই তো তাঁর সামান্য ভুল-ক্রটিও বড় করে দেখা হয়।

মোটকথা, ইল্মশূন্য আমল বিশুদ্ধ হতে পারে না। যারা এর বিপরীত ভাবনা লালন করেন তারা বড় ভ্রান্তির শিকার। বস্তুত এজন্য তাদের মূর্খতাই একমাত্র দায়ী। কারণ, ইল্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্যও ইল্ম থাকা দরকার।

হযরত সোহায়েল তস্তরী রহ. বলেন, অহংকারী, গাফেল, দুর্বল ঈমানের কারী ও জাহেল সূফী থেকে তীরের মত ক্ষীপ্র গতিতে পলায়ন করা উচিত। নিঃসন্দেহে এদের সংস্পর্শ দীনের জন্য ক্ষতিকর।

স্মরণ রাখতে হবে, তাওহীদ, মা'রেফাত ও ঈমান হচ্ছে শরীয়তের মূল বা শিকড়। বাদবাকী সমস্ত ইবাদত, আমল হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা আর যাবতীয় হালত ও মাকাম হচ্ছে এ দু'য়ের সমন্বিত ফসল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, ইল্ম কাকে বলে? উত্তর, ইল্ম হচ্ছে, খবর তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অথবা আছার তথা সাহাবায়ে কেরামের বাণী, ইল্মে ফিক্হ, ইল্মে কালাম ও আকায়েদকে। আরেক প্রকার ইল্ম রয়েছে, যাকে ইল্মে হাকীকত বলা হয়, যার মাধ্যমে গাইরুল্লাহ্ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। মূলত এ শেষোক্ত ইল্মই সর্বোৎকৃষ্ট ও সকল ইল্মের সারনির্যাস এবং কাঙ্খিত ফলাফল। সংশ্লিষ্ট দক্ষ আলেমের কাছ থেকেই নিয়মিত এ পবিত্র ইল্ম অর্জন করতে হয়।

এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকলে বা কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হলে শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ আলেমের শরণাপন্ন হয়ে তার থেকে সমাধান নিতে হবে। কেননা, কামেল ছাড়া সর্বসাধারণের পক্ষে এ বিষয়ের গভীরে পৌঁছা সম্ভব নয়। সত্যিকারেই ভাগ্যবান কেবল তিনিই, যিনি এ অমূল্য ইল্মের অধিকারী হতে পেরেছেন। তিনিই লাভ করেছেন অকূল সমুদ্রের সন্ধান। অনন্তর যিনি এ চার প্রকার ইল্মের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি যমানার কুতুব, যুগের ইমাম। মানবকুলকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া তাঁরই কাজ।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

سَيَظْهَرُ فِيْ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের উপর অবিচল থাকবে, কারো বিরোধিতা, অসহযোগিতা, তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। পরন্তু কিয়ামত পর্যন্ত তারা হকের ওপর সু-প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (আবূ দাউদ : ২/৪৯৯, জামেউল উসূল : ৯/২০৫)

হযরত আলী রা. বলেন,"পৃথিবী কখনো হকপন্থী মনীষীশূন্য থাকে না। তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাঁদের মর্তবা অনেক উঁচু।"

মোদ্দাকথা, আল্লাহর পথের পথিকের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে, ইল্‌ম হাসিল করা। যাতে নিজের আকীদা-বিশ্বাস, আমাল ও ইবাদত পরিশুদ্ধ করে তরীকতের প্রাথমিক কাজগুলোও পরিশীলিত করে নিতে পারে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বেসাল ও মহামিলনের যোগ্য হতে পারে। উল্লেখ্য, গাইরুল্লাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামই হল বেসাল ও ইত্তেসাল বা মহামিলন।

উল্লেখ্য, বেসালের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, সালেকের কলবের পর্দা অপসৃত হয়ে মাহবূবে হাকীকি মহান আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য অন্তরের চোখে অবলোকন করতে থাকা। অতঃপর হিম্মত অনুযায়ী সর্বক্ষণ এ দেখার মাধ্যমে তার ক্রমোন্নতি সাধিত হতে থাকবে। ফলশ্রুতিতে বেসাল ও মহামিলনের সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ, উন্‌স তথা নিত্য সৌহার্দ্র ও বস্‌ত তথা প্রফুল্লচিত্ততার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত আবূ যর গিফারী রা. কে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবূ যর! তুমি জান কী, যখন একজন মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তার পিছে পিছে চলতে থাকে। তারা সকলেই তার জন্য মাগফিরাত কামনা ও দোয়া করে, হে আল্লাহ্! যেমনিভাবে আপনার বান্দা আপনার নিসবত ও সম্পর্কের খাতিরে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বের হয়েছে তদ্রূপ আপনিও তাকে আপন মিলনে ধন্য করুন, আপনার মিলনপ্রাপ্ত হিসেবে তাকে গ্রহণ করুন।"

আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ্ তায়ালার বেসাল বা মিলনের দলিল পাওয়া যায়। বেসাল অর্থ সকল গাইরুল্লাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে মহান আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া। আল্লাহর সাথে বান্দার এ মিলনকে অন্যান্য জাগতিক বস্তুর ওপর অনুমান করে অনেক লোক ঈমান হারিয়েছে। ইহ ও পরকালে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আ'মীন!

এ মহামিলনকে পার্থিব দু'টি বস্তুর মিলনের ওপর অনুমান করা সম্পূর্ণ কুফরি। কারণ, আল্লাহর সাথে মিলনের অর্থ কখনই এটা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে গাইরুল্লাহ থেকে যত দূরে থাকা যাবে আল্লাহর নৈকট্যও তত বেশি অর্জন করা যাবে। পরন্তু জাগতিক সম্পর্ক থেকে যে যতটুকু আলাদা থাকবে, তার মিলনের স্তরও তত বেশি উন্নত হবে।

তাই তো সালেকের কর্তব্য হচ্ছে, মাওলা পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর একে আরো গভীর থেকে গভীরতর এবং নিবিড় থেকে নিবিড়তর পর্যায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট হয়ে কোন একটি পর্যায়ে এসে থেমে যাওয়া মানে মিলনের সে অপূর্ব স্বাদের চরম অবমূল্যায়ন ও অবমাননা করা। পক্ষান্তরে সেটি নিজের বড় বদনসীবি ও মাহরূমী।

মাওলানা রূমী রহ. চমৎকার বলেছেন,

اے برادر بے نہایت در گہے ست ہر چہ بروے میروی بروے منزلے ست

বন্ধু! এ বড় অনন্ত-অসীম দরবার, তুমি কুর্‌ব ও নৈকট্যের যে স্তরেই পৌঁছতে সক্ষম হও না কেন, তোমার সামনে থাকবে আরো সহস্র মনযিল। অতএব, একটি স্তরে পৌঁছেই তোমার মহাযাত্রা বন্ধ করো না। মন্থর করো না সফরের গতি

একটি কথা সবসময়ে মনে রাখতে হবে, কখনই নিজেকে সর্বজ্ঞানী ও সর্বজান্তা ভেবে আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে ফিরা ও তাঁদের ছিদ্রান্বেষণের জন্য মেতে ওঠা, অজ্ঞতাবশতঃ তাঁদের সম্পর্কে লাগামহীন মন্তব্য করা, তাঁদেরকে বেদ্‌য়াতী ও কাফের আখ্যায়িত করা জঘন্য অন্যায় ও বড় গোমরাহী।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ

"বরং কাফেররা এমন বিষয়কে অস্বীকার করল, যা তাদের জ্ঞানের অতীত।" (সূরা ইউনুস : আয়াত-৩৯)

না বুঝে কারো কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া ভুল। পরন্তু এটা মূর্খতার পরিচায়কও বটে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ

"যখন কাফেররা এ কালামের মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হয় তখন বলতে আরম্ভ করে এতো পৌরানিক মিথ্যা কাহিনী।" (সূরা আহ্কাফ : আয়াত-১১)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত ইল্মে ওহীর বহু প্রকরণ রয়েছে। তার মধ্যে কোনটি সকলের জন্য সমানভাবে পালনীয় ও অনুসরণীয়। যেমন- শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারামের ইল্ম। কোন ইল্ম ব্যক্তি বিশেষের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন রহস্যজ্ঞান। এ সম্পর্কে একমাত্র রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহস্যবিদ সাহাবী হযরত হুযায়ফা রা. অবগত ছিলেন। অন্যরা এ ব্যাপারে ওয়াকিফ (জ্ঞাত) ছিলেন না।

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জ্ঞানের এমন সত্তরটি অধ্যায় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রকাশ করেননি। এছাড়া জ্ঞানের আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে বিশেষ শ্রেণির মনীষীগণকেও বলা হয়নি। বিষয়টি কেবলমাত্র রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সীমিত ছিল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সহীহ্ হাদীসে ইরশাদ করেন, "আল্লাহর শপথ, আমি যেসব বিষয় জানি, তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে বেশী, সুখশয্যায় স্ত্রীর স্বাদও গ্রহণ করতে পারতে না। এমনকি হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পাহাড়ে ও জঙ্গলে গিয়ে হা-হুতাশ করে বেড়াতে। আমি আরো বলছি, আমার মন চায়, হায়! যদি আমি বৃক্ষ হতাম, তবে কেটে ফেলত।" (কোনো হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হত না।)

ইল্ম হচ্ছে এক মহাসাগর, তাই তো তার বহু স্তর ও দরজা রয়েছে, তাহলে কীকরে মানুষ নিজেকে সর্বজ্ঞ ও সর্বজান্তা জ্ঞান করতে পারে?

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

"প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছেন কোন মহাজ্ঞানী।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৭৬)

এজন্য বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের বুঝবার বিষয় আছে। বক্তাকে শ্রোতার বোধশক্তি ও জ্ঞানের দৌড় বুঝে আলোচ্য বিষয়ের নির্বাচন ও উপস্থাপন করা উচিত। শ্রোতাকেও নিজের দীনতা ও দুর্বলতার অনুভূতি থাকতে হবে। না বুঝেই আলোচকের কোন কথা হুট করে ভুল আখ্যায়িত করা মূর্খতা। কোনো কথা না বুঝে বক্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে নিজেকে দায়ী করলে সমাধান অনেক সহজ।

অনুচ্ছেদ-২

তালেবে হক বা সত্যান্বেষী সালেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তালেবে হকের দিলে ইসলাহে নফ্স ও আত্মশুদ্ধির আগ্রহ সৃষ্টি হলে তাকে সর্বপ্রথম উল্লেখিত গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী শায়খ দেখে তার হাতে বাইয়াত হতে হবে। এরপর শায়খ তাঁর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন যিকির বাতলে দিবেন। অতঃপর শায়খের হুকুম মোতাবেক পাবন্দী সহকারে সে যিকির আদায় করতে থাকবে। বেশ কিছু দিন এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে যিকিরের উষ্ণতা ও উত্তাপ একসময় তাঁর দেহ-মন তথা পূর্ণ অস্তিত্বকে বেষ্টন করে নিবে। এরপর ক্রমান্বয়ে আল্লাহর ফযলে কামেল সূফী হয়ে তাসাউফের খেরকা লাভ করতঃ অন্যদের জন্য তরীকতের সুদক্ষ মুয়াল্লিম ও ওস্তাদ হিসেবে গড়ে উঠবে।

তাসাউফের সূচনাকারী সালেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অযীফা হচ্ছে নফী-ইছবাতের যিকির (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।) শায়খের পরামর্শ অনুযায়ী নিম্ন অথবা উচ্চস্বরে এমনভাবে আদায় করতে থাকবে যে, لَا اِلٰهَ বলার সময় কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুর নফী (অস্থিত্বহীনতা) এর ধ্যান করবে। আর اِلَّا اللّٰهُ বলার সময় আল্লাহর পবিত্র যাতের ইছবাত বা স্বীকৃতি প্রদান করবে যে, তাঁর অস্থিত্বহীনতা অসম্ভব। যিকির বা নির্জনতায় যদি ভালো-মন্দ কোন আকৃতি দেখা যায় অথবা কোন জ্যোতি বা ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।

পরন্তু একীনের সাথে জানবে যে, নূরে হাকীকী বা আল্লাহর নূর সর্বপ্রকার রূপ, প্রতিকৃতি, দিক, গণ্ডি, সীমা ও স্থান-কাল-পাত্র থেকে পূত-পবিত্র। পক্ষান্তরে যে নূর বা জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা সবই কল্পনা প্রসূত যা অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বলাবাহুল্য, নশ্বর ও ক্ষয়ীষ্ণু বস্তুর এ উপযোগিতা নেই যে, তার প্রতি কখনো মন লাগানোর যায়। এ কারণেই হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ আ. তারকারাজিকে অস্তমিত হতে দেখে মন্তব্য করেছিলেন, হারিয়ে যাওয়া বস্তু আমি পছন্দ করি না। বস্তুত সে পালনকর্তা আল্লাহ হওয়ার যোগ্য নয়।

জেনে রাখা দরকার, পার্থিব জগতে যে সমস্ত বস্তু দৃশ্যমান, আলমে মা'না তথা প্রাকৃতিক জগতে তার বিশেষ তাৎপর্য বিদ্যমান। আলমে মেছাল বা রূপক জগতে যাকিছু প্রকাশিত, তা সবই সে হাকীকতেরই ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। তাই তো এর প্রতি মনোযোগ আরোপ উচিত নয়। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা এ সুলূকের রাস্তায় নূর ও যুলমত তথা আলো ও আধাঁরের সত্তর হাজার পর্দা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ইয্‌যত, আযমত, সম্ভ্রম ও মাহাত্মের কারণে তাকে পর্দায়ে কা'বায়ে আসরার তথা অন্তহীন রহস্যসমূহের কা'বা বা মহাকেন্দ্রের আবরণ ও আচ্ছাদন হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে রহস্যের দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, "আল্লাহ্ তায়ালার নূর ও যুলমাতের সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে। যদি তা অপসারণ করা হয়, তাহলে সমগ্র পৃথিবী জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।" সে পর্দাই মূলতঃ রূহানী আনোয়ার ও জিসমানি যুলমত। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক আলোকরশ্মি ও তিমিরতা। পঞ্চ ইন্দ্রীয়, জৈব প্রকৃতি, দুশ্চরিত্রসমূহ, মনের কু-প্রবৃত্তি, শাহওয়াত, জৈব প্রবৃত্তি, শয়তান প্রভৃতি একেকটি পর্দা ও আবরণ। পবিত্র নফ্স যেহেতু স্বভাবতই আঁধার ও আবিলতার প্রতি বিতৃষ্ণ এবং নূর ও আলোর প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরাগী, তাই একজন তালেবের পক্ষে আঁধারের পর্দাগুলো অপসারণের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু নূরের পর্দা উম্মোচন করা বড় কঠিন। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে সালেকের লতীফায়ে কল্‌ব মূল কাঠামো বিজড়িত মেটে বর্ণের দশ হাজার যুলমতের পর্দা আছে।

নিয়মিত যিকির করার দ্বারা যিকিরের রোশনিতে সে যুলমতসমূহ পরস্পর ওপরে, নীচে, ভাঁজে ভাঁজে চড়া অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। যখন যিকিরের নূরে দেহ পবিত্র হয়ে যায় তখন তা শুভ্র মেঘরাশির মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে যায়। লতীফায়ে নফ্সের দশ হাজার নূরানী পর্দা আকাশী রং এর।

ভালো করে জেনে রাখা উচিত, নফ্স হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের তরবিয়তকারী। সে তার স্বভাবের বদ-তাছীর অস্তিত্বের ওপরে ফেলতে থাকে। সুতরাং যখন প্রশিক্ষণদাতা পবিত্র ও নির্মল হয়ে যাবে তখন সৎকাজের ফয়যান ও প্রবাহ অস্তিত্বের ওপরে ফেলতে থাকবে। অনন্তর এভাবে নফ্সের বিমলতাজনিত আঁধারের পর্দা বিদূরিত হয়ে যাবে। লতীফায়ে কলবের দশ হাজার নূরানী পর্দা আগুনের মতো লাল। যদি চাহিদা মতো খানা খাওয়া হয় তাহলে তার মধ্যে ধোঁয়ার সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে দ্রুত উর্ধ্বারোহণের গতি আর থাকে না।

অন্যথায় দ্রুত উর্ধ্বে আরোহন করে। লতীফায়ে সির্‌র এর নূরানী পর্দা দশ হাজার। তার রং সীসার মতো সাদা, মনে হয় যেন তার ওপরে সূর্যের আলোকচ্ছটা পড়ার কারণে জ্বলজ্বল করছে। দশ হাজার নূরানী পর্দা রয়েছে লতীফায়ে রূহের মধ্যে যা পরিষ্কার টকটকে হলুদ বর্ণের। বস্তুত লতীফায়ে খফীর নূরানী পর্দা দশ হাজার রোমীয় আয়নার মতো ইস্পাত উজ্জ্বল ঝকঝকে। যা দেখতে চোখে মণির রঙের মতো টলমলে। লতীফায়ে হাকীকতের পর্দা দশ হাজার সবুজ রংয়ের। অন্যান্য সমস্ত লতীফার অস্তিত্ব ও অবস্থান এ লতীফার সংগে সংযুক্ত। চোখের শীতলতা ও হৃদয়ের প্রশান্তির উৎস এটিই।

এটিই হচ্ছে হৃদয়ের সঞ্জীবনী বর্ণ। তারপরে কেবল আকীকের বর্ণই অবশিষ্ট থেকে যায়। নজমুদ্দীন কুবরা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি এসব বর্ণে বর্ণিল হবে তার ইচ্ছে থাক বা না থাক, সে অবশ্যই ফানার স্তরে উপনীত হবে। এর

দৃষ্টান্ত যেমন আগুণ দেখলেই ভয় লাগে। এতে মানুষের ইচ্ছার দখল থাকে না। তবে সীমাহীন মোজাহাদা ও কষ্ট-ক্লেশ করতে হয়, তারপর এ বর্ণের বিকাশ ঘটে।

উপরোক্ত পর্দাসমূহ বিদূরিত হওয়ার পরে সপ্ত লতীফার আনোয়ারই দৃষ্টিগোচর শুরু হয়। লতীফায়ে কলবে জ্বিন সম্প্রদায়কে, লতীফায়ে নফ্‌সে জাহান্নাম, লতীফায়ে কলবে জান্নাত, লতীফায়ে সির্‌র ফিরিশ্‌তাগণকে, লতীফায়ে রূহ এর ভিতরে আউলিয়ায়ে কেরামকে এবং লতীফায়ে খফী'র ভিতরে অন্যান্য নবী-রাসূলকে, আর লতীফায়ে হাকীকতে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবলোকন করতে থাকে। অতঃপর সমস্ত নূরের নূর মাহাত্ম্যের আধার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাজাল্লী দেখান। ফলশ্রুতিতে অতীতের সব নূর নিস্প্রভ ও ম্লান হয়ে যায়। তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এরপর সালেক স্বপ্রণোদিত হয়ে পথ চলার পরিবর্তে মাহবূবে হাকীকির সরাসরি আকর্ষণে সামনে বাড়তে থাকে।

স্মর্তব্য, সালেক যখন আল্লাহর মহব্বতে সুলূক অবলম্বন করে নানাবিধ ইবাদত যথা- নামায, রোযা, তাহারাত, লাতাফাত, পবিত্রতা ও প্রসন্নতায় নিমগ্ন হয়ে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান করে, একে জযবায়ে খফী (গোপন আকর্ষণ) ও সায়ের ইলাল্লাহ বা আল্লাহ পানে গমন বলে। একে সুলূক ও মাওলার দিকে অভিযাত্রার সূচনা পর্বও মনে করা হয়। মনে রাখতে হবে, এ ধরণের জযবা ও আকর্ষণ ছাড়া এ পথে চলা অসম্ভব।

মহান আল্লাহর বাণী : "يُحِبُّوْنَهٗ" এর উদ্দেশ্য এটিই। অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসায় দৃঢ়পদ থাকলে আল্লাহ তায়ালা সালেককে প্রিয়পাত্র বানান ও ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নেন, এরপর আপন প্রেমের রহস্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।

তাসাউফের পরিভাষায় একে জযবায় আলী বা উচ্চাকর্ষণ বলা হয়। কুরআনে পাকের ভাষায় "يُحِبُّهُمْ" (মহান আল্লাহ তাঁদেরকে ভালোবাসেন) বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। বস্তুত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তের অনুকরণ ব্যতিরেকে এ জযবা ও আকর্ষণ লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিবেন।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

এটি এমন এক গুঢ় রহস্য। যে ব্যক্তি তা আস্বাদন করেনি সে তা বুঝতে অপারগ। কোন তালেবে হক ও সত্যান্বেষী যদি একটানা চল্লিশ দিন এসব শর্তের ওপর স্থির থাকতে পারে, ইন্‌শাআল্লাহ্ তার জন্য অদৃশ্য বিষয়াবলি দর্শন করার দ্বার উন্মোচিত হয়ে যাবে। প্রথমে রূহানী আনোয়ার ও রূহানী কাওয়াকিব তথা আধ্যাত্মিক আলোকরশ্মি ও আধ্যাত্মিক নক্ষত্রপুঞ্জ অবলোকন করতে থাকবে। অতঃপর ফেরেশ্‌তাদের মোশাহাদা করবে, তার সিফাতের মোশাহাদা হবে। ঐ সকল সিফতের মাধ্যমে সালেকের ওপর কিছু হাকায়েক বা মর্মমূলের উদ্ভাসন ঘটতে পারে। এ অবস্থা শুরুতে হয়ে থাকে।

যখন আলমে মেছাল তথা রূপক জগত থেকে তার অবস্থান আরো উর্ধ্বে চলে যায়, তখন সব জিনিসের মধ্যে একমাত্র হক তায়ালাকেই দেখতে পায়। পুনরায় যখন এ রূপক জগতে (যা বস্তুতঃ প্রতিচ্ছায়া সদৃশ) ফিরে আসে, তখন মাখলূকের ওপর দয়া পরবশ হয়ে তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকায় যে, হায়! এ জনগোষ্ঠী জামালে হাকীকি তথা মহাসত্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রূপসুষমা দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে ধোঁকা ও প্রতিবিম্বের জগতে বসে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন। এমনকি সে দৈহিকভাবে মানুষের মাঝে অবস্থান করছেন বলে মনে হলেও আসলে অন্তরের দিক থেকে বহুদূরে আলমে গায়বে অবস্থান করেন। বড় বিস্ময় বোধ করেন যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত এখনো পর্যন্ত বহাল তবিয়তে রইল কী করে? আল্লাহর তায়ালার যুহূর ও উদ্ভাসনে এরা লীন ও ম্লান হয়ে গেল না কেন? অপরদিকে দুনিয়াবাসী তাঁর অবস্থা দেখে তাজ্জব বনে যায় যে, হায়! মানুষের দেহ অবয়ব থাকা সত্ত্বেও এরূপ হুশহারা ও বোধশূন্য কেন? বস্তুতঃ এ সবকিছুই যিকিরেরই কারিশমা। অর্থাৎ, প্রথমে মৌখিক যিকির চলছিল, অতঃপর কলবী যিকির। তারপর যিকিরের গলবা ও প্রাবল্য।

এর সর্বশেষ পর্ব হচ্ছে, যিকিরের মধ্যে লীন হওয়া। অর্থাৎ, যিকিরকারী মহামহিম চিরস্মরণীয় সত্তা আল্লাহর মধ্যে নিমগ্ন ও বিলীন হয়ে যায়। একে আমলে সালেহ ও এত্তেবায়ে সুন্নতের সুফলও বলা যায়। অনন্তর সুলূক ও তরীকতের পরিসমাপ্তি এখানেই; যার সূচনা হয়েছিল সুলূকের সূচনা পরিশীলনের মাধ্যমে।

অনুচ্ছেদ-৩

সালেকের জন্য কামেল পীরের আবশ্যকতা

সালেকের জন্য একজন কামেল পীর নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি হবেন সালেকের আধ্যাত্মিক সফরসঙ্গী। অধিকন্তু তাকে পথের সরলতা ও বন্ধুরতা এবং উচুঁ-নীচুর জ্ঞান দিবেন।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর পথে অসীলা তালাশ কর।"(সূরা মায়েদা : আয়াত-৩৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন তারকাতুল্য। তাঁদের মধ্যে যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।" (আহকাম ফী উসূলিল কুরআন : ১/৪৪৫)

উপরে উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, হেদায়াতের সুমহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কোন আহলুল্লাহকে জীবনের ইমাম বা রাহ্বার হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইমাম গাযালী রহ. "এহ্য়াউল উলূম" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ الشَّيْخَ فِيْ جَمَاعَتِهٖ كَالنَّبِيِّ فِيْ اُمَّتِهٖ

"উম্মতের মাঝে নবীর মর্যাদা যেমন স্বীয় অনুসারীদের মাঝে শায়খের মর্যাদা তেমন।"

এর মর্মার্থ হচ্ছে, শায়খে কামেল নবীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁরই মত মানুষের মাঝে রাসূলওয়ালা কাজের খেদমত আঞ্জাম ও উম্মতকে সঠিক পথের সন্ধান দেন সাথে সাথে তাদেরকে বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন। এভাবেই তিনি নবীর মতোই আপন অনুসারীদের নাজাতের অসীলা হন।

ইমাম গাযালী রহ. আরো বলেন, "শায়খের এ অসামান্য মর্যাদা তাঁর অঢেল ধন–সম্পদ ও সুনিপুণ অঙ্গসৈষ্ঠব ও আকর্ষণীয় দৈহিক অবকাঠামোর জন্য প্রদান করা হয়নি; বরং প্রদত্ত হয়েছে তাঁর হেদায়াতের অভিজ্ঞতা ও পথনির্দেশনার বিশেষ যোগ্যতার কারণে।

তাই তো দেখা যায়, কেবল সম্ভ্রান্ত পরিবার ও অভিজাত বংশের লোকজনই নয়; বরং নিম্ন বংশের দরিদ্র ও ঘৃণ্য শ্রেণিপেশার মানুষও এ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। সুতরাং শায়খ যে আকার-আকৃতির অধিকারী বা যে বংশেরই হোন না কেন, সেটা মূখ্য নয়; বরং তিনি যে পথের যাত্রী, সে পথের আসন্ন আশঙ্কা ও বিপদাপদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কী-না এটিই হচ্ছে মূল বিবেচ্য। যাতে তিনি মুরীদ বা মুজাহিদগণকে লাভ লোকসান ও হিতাহিত সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন।

একজন হক্কানী পীরের প্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব হল মুরীদানের অন্তরে এ বুঝ জাগরুক করার চেষ্টা করা যে, তরীকতের কষ্টিপাথর হচ্ছে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। যে কোন তরীকা এ কষ্টিপাথরে যাচাই ও নিরূপণে সঠিক প্রমাণিত হলে, তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত। হক্কানী পীরের হাতে বাইয়াত হতে পারা অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাঁর সোহবতে বসাও অনেক বড় নেয়ামত।

একটি সহীহ হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৎ সহচর ও নেক সাথী সম্পর্কে যা বলেছেন, একজন খাঁটি পীর অবশ্যই সে অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করে থাকেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আতর বিক্রেতার মত, সে আতর না দিলেও অন্তত তার সুগন্ধি থেকে কখনো

বঞ্চিত হবে না। পক্ষান্তরে অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ কর্মকারের মত, তার আগুণ শরীর বা কাপড় দগ্ধ না করলেও তার ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ অবশ্যই তাকে পীড়া দিবে, অস্থির করে তুলবে। মুরীদ হতে চাইলে খুব যাচাই বাছাই করে নিবে যে, পীর সাহেব কামেল বা অনুসরণযোগ্য কী-না? কেননা, এ পথ অন্বেষীদের অনেকেই বদ্‌দ্বীন ও গোমরাহ্ পীরের খপ্পরে পড়ে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। সত্য কথা বলতে কী পীরের অনুসন্ধান ও যাচাইয়ের কাজটা পুরোপুরি সঠিক ও নির্ভুল না হওয়ার কারণেই এ পথে সবচেয়ে বড় বিপদ নেমে আসে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

যখন জান্নাতবাসীগণ ও জাহান্নামবাসীরা নিজ নিজ ঠিকানায় চলে যাবে তখন শয়তান চিৎকার করে বলবে-

إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّآ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا أَنْفُسَكُمْ

(সূরা ইবরাহীম : আয়াত-২২)

"হে লোক সকল! আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন- তোমরা নেককাজ কর, তবে জান্নাত পেয়ে চিরসুখী হবে। নবী-রাসূলের কথা অমান্য করলে তোমাদের নিবাস হবে জাহান্নাম। তবে আমি মিথ্যা অঙ্গীকার করেছিলাম- যদি তোমরা শরীয়তের বন্ধনমুক্ত হতে পারো, তাহলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। অযথা হিসাব-নিকাশের চিন্তা করলে অভাব-অনটন লেগেই থাকবে, বিত্ত-সম্পদ ও প্রাচুর্যের মুখ কখনো দেখবে না। আমার অঙ্গীকারের পক্ষে কোন দলীলও পেশ করিনি। আমি তোমাদের কেবল আহ্বান করেছি, আমার আনুগত্য করতে তোমাদের বাধ্য করিনি। তোমরা স্বেচ্ছায় সানন্দে আমার পিছনে চলেছ, যার পরিণতি আজ তোমরা ভোগ করছ। সুতরাং আজ তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা কর না, নিজকেই নিজে ভর্ৎসনা কর।"

সমাজে এক শ্রেণির মানুষ রয়েছে যারা মানবরূপী শয়তান তথা ভণ্ড পীরের ফাঁদে পড়ে নিজের দীনকে বরবাদ করেছে, কিয়ামত দিবসে তাদেরকে পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তখন তারা নিশ্চয়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তখনকার লজ্জা কেবল দুঃখই বাড়াবে।

খুব ভালো করে বুঝতে হবে, এ ভয়াবহ পরিণতি ও বিভ্রান্তির পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে, শায়খ বা পীর বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কারো বাহ্যিক দরবেশী দেখে মোটেই প্রভাবিত হওয়া যাবে না; বরং শায়খ ধরতে হলে তাঁর দীনি পরিপক্বতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "কলবের হালত ও আকীদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয়ে কেবল বাইরের দীনদারি দেখে আনন্দিত হবে না। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির হক ও নাহক হওয়া নির্ভর করে তার আকীদা শুদ্ধাশুদ্ধির ওপর। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার নিকটও কলবের ভালো-মন্দ অবস্থার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

অতএব, যার অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে, তার বাহ্যিক ইবাদত যতই ভালো হোক না কেন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তা পছন্দনীয় নয়। পরন্তু এমন লোকের অনুসরণ করে হেদায়াত লাভের আশা দূরাশারই নামান্তর।

মনে রাখতে হবে, সাধারণভাবে সমস্ত নবী-রাসূল এবং বিশেষভাবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ করা ফরয। কারণ, ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি যেমন- আল্লাহর যাত ও সিফাতের পরিচয়, নবী-রাসূল, ফেরেশ্‌তা ও আখেরাত সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে সকল নবী-রাসূল একমত। এতে সামান্য দ্বিমত কারো নেই। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ফলে অপরাপর নবী-রাসূলগণের শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম কিয়দংশ আমলের ক্ষেত্রে মান্‌সূখ বা রহিত হয়েছে বটে কিন্তু উসূলে দীন তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। উদাহরণ স্বরূপ, পূর্ববর্তী শরীয়তে প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীতে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। দীনের মূল অর্থাৎ, আকায়েদে দীনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

অনুরূপ চার ইমামের পারস্পরিক ইখতিলাফ ও মতানৈক্য কেবল আহ্‌কামে শরীয়তের শাখা-প্রশাখার মধ্যে সীমিত। আকায়েদ ও উসূলে দীনের ক্ষেত্রে তাঁদের মত অভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ নামায মোট পাঁচ ওয়াক্ত, এ ব্যাপারে

কোন ইমামই দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে হ্যাঁ, রাফ-ই-ইয়াদাইন অর্থাৎ, তাকবীরের সময় হাত উঠানে নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। কারো নিকট এটি সুন্নত, কারো নিকট সুন্নত নয়।

উসূলে দীনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির পরিণতি নিঃসন্দেহে বিদ্‌য়াত ও গোমরাহী। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য কিতাবুল্লাহ্, সুন্নতে রাসূল ও ইজমায়ে উম্মতের অনুসরণই হচ্ছে একমাত্র পথ, উপায়। আইম্মায়ে মুজতাহেদীন শাখাগত মাসয়ালায় যে দ্বিমত পোষণ করেছেন সেটি মূলতঃ উম্মতের জন্য রহমত। কারণ, এর ফলে মুসলিম উম্মাহ'র জন্য শরীয়ত অনুশীলনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এখন যে কোন একটি মতের ওপর আমল করলেই তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে।

মুজতাহিদ যদি ইজতেহাদে ভুলও করেন, তবুও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষিত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তিনি একটি সওয়াব পাবেন। আর যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন, তাহলে পাবেন দ্বিগুণ সওয়াব ও পুরস্কার। সুতরাং যিনি চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের অনুসরণ করবে, আকীদা-বিশ্বাস কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের আওতাভূক্ত হয়, সাথে সাথে যদি তিনি তরীকত ও হাকীকতের বিশেষ ইল্‌ম ও অভিজ্ঞানেও পারদর্শী, এমন মনীষী অবশ্যই শায়খ ও পীর হওয়ার যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-৪
কামেল ও খাঁটি পীরের পরিচয়

মা'রেফত ও সুলূকের নবযাত্রীর কাছে যেহেত শায়খের হক্কানিয়ত যাচাই করার মত ইল্‌ম নেই। তাই সহজে খাঁটি পীর শনাক্ত করার কয়েকটি নিম্নে লক্ষণ তুলে ধরা হল-

১. তাঁর মুরীদগণকে দীনদার হবে।

২. সমকালীন হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও বুযর্গানে দীন তাকে বরহক মনে করবে।

যদি মুরীদান খালেস দীনদার হয় এবং সমকালীন ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন তাঁর ওপর কোন আপত্তি না করেন; বরং তাঁর প্রতি ভক্তি ও মহব্বত রাখেন এবং দীনপিপাসুরা তাঁর সোহবত থেকে প্রভূত ফায়েয ও কল্যাণ লাভ করে, তাহলে মনে করতে হবে, তিনি তরীকতের দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এমন শায়খের সন্ধান পেলে তাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকা। তাঁর হাতে বাইয়াত হওয়ার সুযোগ হলে মনে-প্রাণে তাঁর অনুগত থাকা মুরীদের কর্তব্য। পরন্তু তাওহীদে মতলবের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন তাঁর আনুগত্যের রশি গলায় পরিধান করা। তাওহীদে মতলব বলতে এখানে নিজের শায়খ সম্পর্কে এ একীন ও বিশ্বাস রাখা যে, আমার শায়খ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে আমাকে আমার মনযিলে মাকসূদে পৌঁছাবার আর কেউ নেই। দুনিয়াজোড়া হাজারো মাশায়েখে কামিলীন তৎকালে বিদ্যমান থাকলেও তাঁদের প্রতি নজর দিবে না।

অনন্তর এ তাওহীদে মতলবই হচ্ছে, তাসাউফের প্রধান রোকন, স্তম্ভ। এটি যার হাসিল হয়নি, সে দিকভ্রান্তের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এ ধরণের লোক কোথাও গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালার কিছু যায় আসে না। তার প্রতি আল্লাহ পরওয়া করেন না। আমার শায়খের মত আরো অনেকে আমার রাহ্‌বরী করে, আমার পিপাসা নিবৃত করে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম, এরূপ ধারণা পোষণ মুরীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর; বরং মনে করতে হবে, যেভাবে আল্লাহ্ এক, কিবলা এক, তদ্রূপ আমার হাদী ও রাহ্‌বরও এক ও অদ্বিতীয়। এ ব্যাপারে অস্থিরতা ও বহুগামিতা নিঃসন্দেহে সর্ববৃহৎ দূরারোগ্য ব্যাধি।

যদি কারো মনে এরূপ ওয়াসওয়াসা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যে, পৃথিবীতে আমার শায়খ ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ আমাকে আমার মনযিলে মাকসূদে পৌঁছাতে সক্ষম, তাহলে শয়তান তার মস্তিষ্কে জেঁকে বসে এবং তার পদস্খলন না ঘটিয়ে ছাড়ে না। বেশিরভাগ সময় এমন হয় যে, শয়তান কোন পীরের আকৃতি ধারণ করে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

যেহেতু এ লোকটির মন কচু পাতার পানির মত টলমলে। যাকে তাকে পীর মানতে প্রস্তুত, তাই তার অন্তর অনায়াসে সে শয়তানের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ইবলীস তাকে নানাবিধ পীরানা ছল-চাতুরীর মাধ্যমে প্রভাবিত করে ফেলে। একপর্যায়ে তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

পক্ষান্তরে যার তাওহীদে মতলব হাসিল হয়েছে, (আপন শায়খকেই সে একমাত্র পথপ্রদর্শক মনে করে) শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে পারে না। এমনকি তার পীরের সুরতও ধারণ করতে পারে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "উম্মতের মাঝে নবীর মর্যাদা যেমন আপন সম্প্রদায়ের মাঝে শায়খের মর্যাদা তেমন।"

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উম্মতের ওলামায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের নবীগণের মতো বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং অভিশপ্ত শয়তান যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে অপারগ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখল, সে বাস্তবেই আমাকে দেখল। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।) ঠিক তেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে যাঁরা প্রকৃত শরীয়তের পাবন্দ অলী-আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখ রয়েছেন, শয়তান তাঁদের আকৃতিও ধারণ করতে পারে না।

অতএব, তাওহীদে মতলবের অধিকারী মুরীদ বহুরূপী ইবলীসের প্ররোচনা হতে রক্ষা পায়, নিরাপদে তরীকতের বিভিন্ন ঘাঁটি ও স্তরসমূহ অতিক্রম করতে থাকে।

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, বেসাল বা আল্লাহর সাথে মিলনের রোকন চারটি; যথা-

১. ই'তিবার বা শিক্ষা গ্রহণ। (অর্থাৎ, দীনদার লোকদের নেক হালত দেখে তাঁদের মত হওয়ার আগ্রহ পোষণ করা। সাথে সাথে দীনহীন, ফাসিক-ফাজির লোকের দূরাবস্থা দেখে অনুতপ্ত হওয়া ও নিজের অবস্থার ওপর আল্লাহ্র শোকর আদায় করা।

২. মোকাশাফা ও তাজাল্লীসমূহ প্রত্যক্ষ করার সময় উচ্চ মনোবল রাখা। (অর্থাৎ, কলবের নির্মলতা ও দীর্ঘ যিকির-শোগলের তা'ছীরে যদি অতীতের কোন ঘটনা অথবা দূরবর্তী স্থানের নানা অবস্থার কাশ্‌ফ হয়, কিংবা হালত ও কাইফিয়তের একটি পর্যায় গিয়ে নানা ধরণের নূরানী সুরত দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সেগুলোকে মূল উদ্দেশ্য মনে করে হিম্মত ও অন্বেষা ছেড়ে বসে থাকবে না; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও হাকীকি যাতের মহামিলনকে আসল উদ্দেশ্য মনে করবে, সৎসাহস নিয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।)

৩. হিম্মত সংরক্ষণ অর্থাৎ, লক্ষ্যার্জন ও অন্বেষায় হিম্মত হারাবে না। পরন্তু উদ্দেশ্য পূরণে বিলম্ব হলে বিরক্ত হয়ে প্রচেষ্টা ছেড়ে দিবে না।

৪. শায়খের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তরীকতের ভাইদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের সম্মান করা এবং যারা ছোট তাদের সাথে দয়া ও মহব্বতের সাথে ব্যবহার করা। কামেল ঈমানদারগণের মধ্যেই এসব মহৎ গুণের সমাহার ঘটে। দূর্বল ঈমানের মানুষের মধ্যে এসব গুণের উপস্থিতি বড় দুরূহ ব্যাপার।

মুরীদকে সত্যপন্থী হতে হবে। যাহেরে-বাতেনে, প্রকাশ্যে-গোপনে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার সাথে আচরণ ঠিক রাখবে ও সর্বদা আল্লাহ্ অন্বেষী থাকবে। শরীর, আকল, নফ্‌স, সির্‌র, কলব, রূহসহ সবকিছুতে ইখলাসের শান বজায় রাখবে। ওঠা-বসা, কাজ-কারবার ও কথাবার্তা সবকিছু কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে। সিদ্‌ক ও ইখলাস তথা সততা ও একনিষ্ঠতা এ দু'টি শর্ত আয়ত্ত করতে পারলে আশা করা যায়, সে মা'রেফত ও আল্লাহ্র মহামিলনের সৌভাগ্য অর্জনে কৃতকার্য হবে।

হযরত আবূ দারদা রা. বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَنْ طَلَبَنِىْ فَقَدْ وَجَدَنِىْ وَمَنْ طَلَبَ غَيْرِىْ فَلَمْ يَجِدْنِىْ

"যে আমাকে খুঁজেছে সে আমাকে পেয়েছে। আর যে অন্য কিছু চেয়েছে সে ব্যর্থমনোরথ হয়েছে।"

উল্লেখিত হাদীস থেকে আল্লাহ প্রেমিকরা বড় আশাবাদী হয়ে পড়েন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য হাদীসে স্বীয় সত্তার প্রতি অন্বেষণের সম্বন্ধ করেছেন। কথাটি এভাবে বলেছেন, 'যে আমাকে অনুসন্ধান করে বা খোঁজে।' বুঝা গেল, আল্লাহ্র যাতের মিলন সম্ভবপর বিষয়, যার আশা করা যেতে পারে। তবে এজন্য সিদ্‌ক, ইখ্‌লাস ও সুদৃঢ় ইচ্ছা থাকা আবশ্যক।

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন, তাওহীদে কামেলের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া না থাকবে কারো আলোচনা, না থাকবে উপলব্ধি। আর না তাঁকে ছাড়া কাউকে প্রিয়পাত্র বানাবে। অনন্তর আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসাও একমাত্র তাঁর মহান সত্তাকে পাওয়ার জন্য হবে। জান্নাতের আশা অথবা জাহান্নামের ভয়ে নয়। আল্লাহ্র মহান সত্তা এমনিতেই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য, কেবলমাত্র এ যুক্তিতেই তাঁকে ভালোবাসবে। মহান আল্লাহ্ মুমিনদের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা আল্লাহর রহমতের আশা ও আযাবের ভয় করে। বস্তুতঃ এতে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ শ্রেণির মুমিন তথা আউলিয়ায়ে কেরামের আলোচনা তো কুরআন মাজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

"তাঁরা আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছায় ও আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে। বস্তুত তাঁকে ছাড়া কাউকে পরোয়া করে না।"

কুরআন মাজীদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, "তাঁরাও আল্লাহকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁদের মহব্বত করেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন, "হে আল্লাহ্! আমি আপনার থেকে আপনার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এ ধরণের বহু উদাহরণ রয়েছে, যার দ্বারা সূফীদের এ বক্তব্যের সমর্থন মিলে- জান্নাত-জাহান্নাম নয় বরং আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বাই ভয় ও মহব্বত প্রাপ্তির সমধিক উপযুক্ত। ভালোবাসার আকর্ষণ, ভীতি সঞ্চারের কারণ স্ব-মহিমায় তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।

সারকথা, শায়খে তরীকত এমন হওয়া চাই, যিনি দীন ও শরীয়তকে মুরীদের অন্তরে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ও গেঁথে দিতে সক্ষম। তিনি কেবল কিতাব পড়ে নয়; বরং তাসাউফ ও সুলূক এখতিয়ার করে মোজাহাদা সাথে এ পথ অতিক্রম করেছেন। তরীকতের নানা চড়াই-উৎরাই স্বচক্ষে দেখেছেন। এককথায় তাঁকে ভুক্তভোগী হতে হবে।

পক্ষান্তরে মাজযূবুল হাল বা আবেগের কাছে পরাজিত ব্যক্তি কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হলেও যেহেতু সে এ পথের বিপদাপদ সম্পর্কে অনবহিত, তাই কীভাবে এ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সে বিবরণ তার আয়ত্তে নেই। সে বে-খেয়াল, হুঁশহারা। এমন ব্যক্তি কখনো শায়খ হওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ, অনভিজ্ঞ বা বে-খেয়াল ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে সতর্ক করা অথবা পথনির্দেশ করে গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

অনুচ্ছেদ-৫
কামেল শায়খ বা পীর হওয়ার শর্তাবলি

কাউকে নিজের মুসলিহ্ বা পীর হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে সর্বাগ্রে তাঁর মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আছে কী-না দেখে নেয়া একান্ত জরুরি;-

তিনি কুরআন ও হাদীসের আলেম হবেন, কামিল হবেন। এমন কামেল শায়খ থেকে তরীকতের জ্ঞান অর্জন করে থাকবেন, যার সিলসিলা অবিচ্ছিন্নভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে। আপন শায়খের নির্দেশানুযায়ী মেহনত, রিয়াযত, মোজাহাদার ঘাঁটিগুলো অতিক্রম করেছেন। চলাফেরা, কথাবার্তা, আহার, নিদ্রা ও মানুষের সাথে ওঠা-বসা কম করেন। দান-খয়রাত ও অধিক নামায-রোযা করা তাঁর আদত।

উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচার যথা- সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর প্রতি প্রবল বিশ্বাস, বদান্যতা, অল্পেতুষ্টি, আমানতদারি, সহনশীলতা, বিনয়-নম্রতা, সততা, ইখ্লাস, লজ্জা, গাম্ভীর্য, স্থিরতা, ভেবে চিন্তে কাজ করা প্রভৃতি নান্দনিক গুণবৈশিষ্ট্য হবে তাঁর স্বভাব। পদ ও অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি হবেন সম্পূর্ণ নির্মোহ। আখেরাতকে যথেষ্ট মনে করবেন। তিনি নববী মশালের আলোকবর্তিকা নিজের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করে সর্বপ্রকার নিন্দনীয় অভ্যাস ভিতর থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিয়েছেন। অহংকার, আত্মগরিমা, কৃপণতা, হাসাদ, হিংসা, লোভ, গাম্ভীর্যহীন চলাফেরা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে তাঁর থেকে।

অকৃত্রিম মোজাহাদা ও অসামান্য রিয়াযতের ফলে তাঁর চেহারায় কামালিয়তের নূর পরিস্ফুটিত হবে। কলব নূরানী হওয়ার কারণে অতি সহজেই হক ও বাতিলের মাঝে তফাত করতে পারবেন। দুনিয়াবাসীর সংশ্রব ছেড়ে মাহবূবে হাকীকি ও প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহর মহব্বতের সমুদ্র থেকে প্রেমের সূধা পান করে পরিতৃপ্ত থাকবেন। সর্বপ্রকার কয়েদ

ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এত উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন যে, তাঁর অবস্থা সাক্ষ্য দিবে- তিনি হালের যবানে বলছেন, 'যে মা'বূদকে আমি দেখি না, তাঁকে ইবাদতের যোগ্য মনে করি না। অর্থাৎ, তিনি ইহ্সানের স্তরে অবস্থান করবেন। যেন আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখে দেখে তাঁর ইবাদত করছেন।

হযরত ওয়ায়েল ইয়েমেনী রহ. একদা হযরত আলী রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলী! আপনি কী আপনার পরওয়ারদেগারকে দেখতে পান? হযরত আলী রা. বললেন, যদি তাঁকে দেখতেই না পাই, তবে কার ইবাদত করি? ওয়ায়েল রহ. পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনি তাঁকে কীভাবে দেখতে পারেন? উত্তর করলেন, হে ওয়ায়েল! বাহ্যিক চোখ দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না বটে, তবে অন্তরের চোখ দ্বারা অবশ্যই উপলব্ধি করা যায়।

শায়খের ইবাদতের শান এমন হতে হবে যে, তিনি কষ্টের পরিবর্তে প্রিয়তমের মিলনের স্বাদ অনুভব করেন। তিনি থাকবেন বিভিন্ন হালতের স্বাদ আস্বাদনে বিভোর, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের সুবাসে মাতোয়ারা। লা-মাকান ও অবস্থানহীনতার সুবিস্তৃত স্তরে এসে প্রেমাস্পদের নৈকট্যের সুগন্ধিতে মুগ্ধ, বিহ্বল। মোশাহাদার দরজা তাঁর সামনে উন্মোচিত। বিরহ বেদনার ঔষধ প্রাপ্ত। মহব্বতের শরাবে হৃদয় পেয়ালা পূর্ণ হওয়ায় তিনি পরিতুষ্ট। তাঁর বাণী হিকমতপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত। মাখলূকের অন্তর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। বাহ্যত তিনি নির্জন হলেও অন্তরে মাওলা পাকের জামাল ও সৌন্দর্য দর্শনে মশগুল। মজলিসে থেকেও তিনি নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করেন। বোধহীন হয়ে কখনো শরীয়ত পরিপন্থী কথাবার্তা বলেন না। তিনি স্বীয় অন্তরদৃষ্টি দ্বারা অন্যের যোগ্যতা নিরূপণে সক্ষম। তবে অন্যরা তাঁর মাকাম ও মর্তবা বুঝতে অক্ষম।

উল্লেখিত গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী নিঃসন্দেহে মহামানব এবং একমাত্র তিনিই শায়খ বা পীর হওয়ার যোগ্য। কেননা আমলের ক্ষেত্রে সুউঁচ্চু হালত তাঁর নসীব হয়েছে। কলব নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চর্ম ও ত্বক পর্যন্ত বিনম্র ও আজ্ঞাবহ হয়ে গেছে। অধিকন্তু কলবের মত তাঁর শরীরও আমলের তাছীর যথাযথ গ্রহণ করে নেয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এত তারাক্কী ও উন্নতি দান করেন যে, সমস্ত গাইরুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন মিলনের পরশে তাঁকে ধন্য করেছেন।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

"আল্লাহ্ তায়ালা সর্বোত্তম বাণী তথা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপঠিত। এতে তাদের লোম শিহরে ওঠে, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। অতঃপর তাদের ত্বক ও অন্তর আল্লাহ তায়ালার স্মরণে কোমল হয়ে যায়।" (সূরা যুমার : আয়াত-২৩)

স্মরণ রাখতে হবে, শায়খ হওয়ার জন্য জ্ঞানের সকল শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন অথবা বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া শর্ত নয়; বরং ইবাদতের ক্ষেত্রে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফলের জ্ঞান ও জায়েয-নাজায়েযের ইল্ম থাকাই যথেষ্ট। এছাড়া তরীকতের ক্ষেত্রে রিয়াযত-মোজাহাদার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তার পাশাপাশি সালেকীনদের বহুবিধ রূহানী আমরায তথা আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি ও তার প্রতিকারের বিষয়ে জরুরি জ্ঞান থাকতে হবে; যাতে প্রত্যেক মুরীদকে স্ব স্ব যোগ্যতা, তবিয়ত ও রুচি অনুসারে যথাযোগ্য তা'লীম ও ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন।

শায়খকে অবশ্যই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন বিবেকের অধিকারী হতে হবে, যাতে তিনি মুরীদের স্বভাব-প্রকৃতি ও মেজাজ বুঝতে পারেন এবং কার কোন্ ধরণের চরিত্র তা সহজে আঁচ করতে পারেন। তাসাউফের রাস্তায় যে সকল উলূম ও মায়া'রিফ তথা জ্ঞান ও পরিজ্ঞান মুরীদানের সামনে উদ্ভাসিত করে, সে বিষয় তাঁকে হতে হবে পূর্ণ দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত। হাকীকত বা তত্ত্ব কথা, মাকামাত, মনযিল, আধ্যাত্মিক স্তরসমূহ, তালবীনাত, তামকীনাত, রূপাঙ্গতা, স্থিরতা, উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়াদি সম্পর্কে অবশ্যই পূর্ণ ওয়াকিফ্হাল হতে হবে।

মোকাশাফাত, মোয়ানাত, প্রত্যক্ষ অবলোকনের স্তর অতিক্রম করে ফানা-উল-ফানা অস্তিত্ত্ব ও চেতনা বিনাশ সাধনের পর্যায় অতিক্রম করে বাকা-উল-বাকা ও চরম অস্তিত্ব লাভে ধন্য হন তিনি। আল্লাহ্ তায়ালার আয্মত ও মহত্ব, কিবরিয়া ও বড়ত্ব, ওয়াহ্দানিয়ত ও ফরদিয়ত তথা একত্বতা ও একত্ববাদের অভিজ্ঞানের তিনি পাকা ওস্তাদ। যাতে

তিনি যথাযোগ্যভাবে দিতে পারেন মুরীদ ও সালেকীনদের পথের দিশা। যোগ্যতার এ মাপে যিনি আসবেন তিনিই হচ্ছেন মানসম্পন্ন পীর। শায়খে কামেল। উম্মত এমন পীরেরই মোহ্তাজ।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

"হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, এটিই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা দেখে ও বুঝে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করি।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-১০৮)

কুরআনে কারীমের এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী পীর-মাশায়েখেরও পূর্ণ দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তার মাহাত্ম্যের বিষয়ে পরিপূর্ণ মা'রেফত অর্জিত হতে হবে। অন্যথায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত নায়েব হিসেবে মানুষকে হেদায়াতের পথে বিশুদ্ধভাবে আহ্বান করা যাবে না। এ ছাড়া শায়খের আরো বহু সিফাত ও গুণবৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেমন- তাঁকে হতে হবে দয়ালু, ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। তিনি অতিশয় রাগী, বদমেজাজী, কর্কশভাষী, বক্র স্বভাব ও একগুঁয়ে প্রকৃতির হলে চলবে না। সাথে সাথে তিনি দুনিয়াপূজারী, সাজ-সজ্জা প্রিয় ও সম্মান লোভী হবেন না।

মুরীদের আধিক্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা কামনা করবেন না। অধিকন্তু মাগলূবুল হাল বা হালত পরাভূত হয়ে কখনো শরীয়ত বিরোধী কথা মুখে আনবেন না। সর্বোপরি তিনি মুরীদের অবস্থার ওপর দয়াবান হবেন, যেমন ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিফাত বা গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের মাঝে আগমন করেছেন তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহনীয়। অনন্তর তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।" (সূরা তাওবা : আয়াত-২৮)

সুতরাং শায়খ যখন দয়া-মায়া, স্নেহ প্রভৃতি রাসূল চরিত্রের অধিকারী হলেন, তখন তিনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাঁটি নায়েব ও স্থলাভিষিক্ত।"

শায়খের নিঃশর্ত আনুগত্য মুরীদের অন্যতম কর্তব্য

শায়খ থেকে মুরীদ পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার জন্য তাকে শরীয়তের গণ্ডির ভিতরে থেকে চোখ বন্ধ করে শায়খের নিঃশর্ত অনুকরণ করে যেতে হবে। মুর্শিদের পক্ষ থেকে আরোপিত শর্ত যতই কঠিন হোক না কেন কায়মনোবাক্যে মেনে নিতে হবে। অন্যথায় উদ্দেশ্য সফল হবে না। এক্ষেত্রে হযরত মূসা আ. ও খিযির আ. এর ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা আ. একদা বিশেষ হেদায়াত ও অভিজ্ঞানের জন্য হযরত খিযির আ. এর সঙ্গ কামনা করলেন। হযরত খিযির আ. বললেন, আমার সাহচর্য আপনি বরদাশ্ত করতে পারবেন না। হযরত মূসা আ. সবরের ওয়াদা করলেন। পরিশেষে দেখা গেছে, হযরত মূসা আ. সে প্রতিশ্রুত ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারলেন না; বরং হযরত খিযির আ. এর বিভিন্ন কার্যকলাপে একে একে তিনবার আপত্তি তুললেন। চূড়ান্ত আপত্তি উত্থাপনের কারণে তাঁকে খিযির আ. থেকে পৃথক হতে হল।

ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহাফে রয়েছে। তদ্রূপ মুরীদের জন্য শায়খের এত্তেবা জরুরী। এক্ষেত্রে কোনরূপ গড়িমসি করলে তার পরিণতি ব্যর্থতা ও বঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। শায়খের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও তাঁর হুকুম তামিলকে নিজের ওপর ফরয মনে করবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা চরম ক্ষতিকর। হযরত মূসা আ. নিজেই ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় পয়গম্বর ও স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী। তাই তিনি ছিলেন তৎযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। এতদসত্ত্বেও তিনি কেবল মনের আগ্রহে অনাবশ্যক এক প্রকার বিশেষ ইল্‌ম শিখার জন্য হযরত খিযির আ. এর সঙ্গী হয়েছিলেন ও এজন্য তাঁকে অনেক কঠিন শর্তে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। যা তার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

ওস্তাদের কাজে আপত্তি উত্থাপনের কারণে তিনি যদিও গুণাহ্গার হননি কিন্তু কাঙ্খিত ইল্ম অর্জনে তাঁকে অকৃতকার্য হতে হয়েছে, যা অর্জন করার জন্য হযরত খিযির আ. এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাহলে মুরীদের ব্যাপার কী হতে পারে তা খুব সহজেই অনুমেয়। কারণ, সে তো নিজেকে জাহেল মনে করে একজন অভিজ্ঞ শায়খের হাত ধরেছে এবং আল্লাহর মা'রেফতের মতো এত জরুরি ইল্ম অর্জনের জন্য নিজের চেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সোহবত গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় যদি শায়খের কাজেকর্মে সে বীতশ্রদ্ধ হয় অথবা প্রশ্ন তোলে, তাহলে তার পরিণতি যে কী দাঁড়াবে, তা কারো চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

অনুচ্ছেদ-৬

সুলূকের প্রাথমিক আমল ও সূচনা পরিশুদ্ধির শর্তাবলি

ইমামে তরীকত হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. এর মতে সালেকের সূচনা পরিশুদ্ধির জন্য আটটি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো তরীকতের অন্যান্য মাশায়েখে কেরামের বাতানো লম্বা-চওড়া আদব ও শর্ত এর চেয়ে তুলনামূলক সহজ। সে আট শর্ত নিম্নরূপ-

১. নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী অব্যাহত রাখা।

২. ক্রমাগত রোযা রাখা।

৩. সবসময় নীরব থাকা।

৪. সদা নিঃসঙ্গ থাকা।

৫. সর্ব অবস্থায় যিকির করা।

৬. সবসময় অন্তরে ক্ষতিকর সব কল্পনা দূরিভূত করতে থাকা।

৭. শায়খের সাথে সার্বক্ষণিক আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করা। পরন্তু বিভিন্ন বিষয় তাঁর থেকে এস্তেফাদা ও ফায়েয হাসিল করতে থাকা। এমনকি নিজের এখতিয়ার ও কর্মতৎপরতাকে শায়খের এখতিয়ার ও হস্তক্ষেপ ও তছররুফের মাঝে ফানা করে দেয়া।

৮. কোন অবস্থায়ই মাওলা পাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না করা। নফ্সের সুখ-দুঃখের খেয়ালে জান্নাতের আবেদন ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের আবেদন ত্যাগ করবে। এসবই আল্লাহ তায়ালার তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। ভাগ্যবান ব্যক্তি ভালো করেই জানেন যে, মাওলা পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সব কিছুর চেয়ে বেশি। তাই সে মাহবূবে হাকীকির ভালোবাসা অন্তরে স্থান দিয়ে মাখলূক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করে। দূরত্ব ও বিরহের পথ পেরিয়ে নৈকট্য ও মহামিলনের প্রার্থী হয়। অলসতা, উদাসীনতা পরিত্যাগ করে মেহনত মোজাহাদার পথ ধরে।

হযরত সোহায়েল তস্তরী রহ. বলেন, "হিজরত ফরয, এ হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, কিন্তু ফরয হিজরত বলতে কোন্ হিজরতকে বোঝানো হয়েছে তা বুঝতে হবে। আর তা হচ্ছে মূর্খতা থেকে ইল্মের দিকে, গাফলত থেকে যিকিরের দিকে, নাফরমানি থেকে আনুগত্যের দিকে এবং পাপাচারপূর্ণ জীবন থেকে তওবার দিকে হিজরত করা।

সালেকের সূচনা পরিশুদ্ধির শর্তসমূহ আল্লাহর ফযলে নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে।

শর্ত-১ : সব সময় অযূ অবস্থায় থাকা

প্রথম শর্ত হচ্ছে, সবসময় অযূ অবস্থায় থাকা। একটি মুহূর্ত অযূহীন অতিক্রম না করা। পানির সমস্যা হলে পানি না পাওয়া পর্যন্ত তায়াম্মুম অব্যাহত রাখবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

এক. "ইস্তিকামাত ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর। অলস হয়ো না। জেনে রেখ, তোমার আমলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে নামায। অনন্তর কেবল মুমিনরাই সবসময় অযুর প্রতি যত্নবান।

দুই. অযূ মুমিনের হাতিয়ার।

তিন. অযুর ওপর অযূ করলে নূর বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়।

ইমাম গাযালী রহ. 'এহ্য়াউল উলূম' গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"দীন তাহারাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوْءِ

"পবিত্রতা নামাযের চাবিকাঠী।" (তিরমিযী : ১/২)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।" (কানযুল উম্মাল : ১২/১)

মহান আল্লাহ কোবা মসজিদের প্রশংসায় বলেন,

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا

"এখানে এমন লোক রয়েছে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা যাদের বড়ই প্রিয়।" (সূরা তাওবা : আয়াত-১০৮)

অতএব, আহার-নিদ্রা, কথাবার্তা, কাজ-কর্ম সর্বাবস্থায়ই পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে। ইন্শাআল্লাহ্ যাহেরি তাহারাতের অসীলায় কলব ও আত্মার পবিত্রতা ও আরোগ্যের আশা করা যায়। বস্তুত মহান আল্লাহ হচ্ছেন, কুদ্দূস তথা অতি পবিত্র। তাঁর পবিত্র দরবারে নির্মল ও আবিলতামুক্ত কলব না নিয়ে কেউ পৌঁছতে পারে না। যে মানুষ শরীয়ত মোতাবেক নিজের যাহেরকে পবিত্র রাখে না, তার বাতেন কষ্মিনকালেও তরীকতের উপযুক্ত নয়। কেননা, বাহ্যিক অবস্থা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অবস্থার শিরোনাম বা আয়নাস্বরূপ। যদি কিছুদিন পবিত্রতার ওপর এস্তেকামাতের সাথে থাকা যায়, তাহলে অচিরেই তাতে মাওলা পাকের নূরের প্রতিবিম্ব ঘটবে এবং সে নূরের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হবে তার মনন ও চিন্তা-চেতনার ওপর। ফলশ্রুতিতে তার অন্তর্দৃষ্টি গভীর আঁধারও সে নূর অবলোকনে সক্ষম হবে ইন্শাআল্লাহ্। ইতঃপূর্বে যা কখনোই তার নসীব হয়নি।

শর্ত-২ : বেশি বেশি নফল রোযা রাখা

দ্বিতীয় শর্ত রোযা রাখা। শরীয়তের নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া সবদিন রোযা রাখবে ও ইফতারীতে হালকা খানা খাবে। যাতে পেট হালকা থাকে ও ইবাদতে অলসতা না আসে। আবার এতটা কম খাবে না যে, ক্ষুধার জ্বালায় কাতরাতে থাকে। উভয়টিই দোষণীয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

"তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।" (সূরা আনয়াম : আয়াত-১৪১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

"হে মুমিন সম্প্রদায়! আল্লাহ কর্তৃক হালাল ও বৈধ বস্তুকে তোমরা নিজেদের ওপর হারাম করে নিও না। প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার করে সীমালঙ্ঘন করো না। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-৮৭)

রোযাব্রত পালন করলে রোযার সম্মানার্থে সাহারিতেও কম খাওয়া উত্তম। কেননা, রোযার মাঝে মহান আল্লাহ যে বিশেষ ফযীলত রেখেছেন, তা অর্জনে অল্প আহার বেশ সহায়ক। আর এ অসামান্য ফযীলতের কারণে ইসলামের অন্যান্য রোকনের ও ইবাদতের ওপর রোযার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ . يَدَعُ طَعَامَهٗ وَشَهْوَتَهٗ مِنْ اَجْلِيْ

"অদম সন্তানের প্রত্যেক নেককাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সত্তরগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু রোযার কথা আলাদা, কারণ, রোযা কেবলমাত্র আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং তার প্রতিদান দিব। কারণ, সে পানাহার ও কামভাব কেবলমাত্র আমার জন্য ত্যাগ করে। এর সওয়াবের সঠিক পরিমাণ একমাত্র আমিই জানি; অন্য কেউ নয়।"

(তিরমিযী : ৩/৫৫, বায়হাকী : ১/৪৩৮)

রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মহান আল্লাহর নিকট মেশ্কের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযাকে ঢাল আখ্যায়িত করেছেন। নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধে মুমিন সার্বক্ষণিক যুদ্ধে লিপ্ত। কাজেই, শয়তানের তীরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাতে ঢাল থাকা আবশ্যক। রোযা হচ্ছে সে ঢাল।

বনী আদম যে বস্তুসামগ্রী উপভোগ করে, তার মধ্যে উদরপূর্তি সবচেয়ে খারাপ। কারণ, কু-প্রবৃত্তি, লোভ-লালসা ও হিংসা-দ্বেষসহ সর্বপ্রকার কু-প্রবৃত্তি ও দূরাচার এ উদরপূর্তি থেকেই জন্ম নেয়।

অতএব, খাবার কম খাবে। কত কম খাবে? যতটুকু খেলে মানুষ কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে। পরন্তু এটুকু খাবার গ্রহণই যথেষ্ট। একদা হযরত ঈসা আ. তাঁর অনুচরবর্গকে সম্বোধন করে নসীহত করলেন, "তোমরা পেটকে ক্ষুধার্ত, কলিজা পিপাসার্ত ও (সতর ছাড়া) শরীর বিবস্ত্র রাখ।" যাতে আল্লাহ তায়ালাকে নিজ কলবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পার।

ইমাম গাযালী রহ. "এহ্ইয়াউল উলূমে" বর্ণনা করেন, "মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও ভারসাম্য রক্ষা করা সব সময়ই উত্তম বিধায় সব কাজে মধ্যম পন্থা কাম্য। বাড়াবাড়ি সর্বক্ষেত্রেই নিন্দনীয়।"

ওপরে ক্ষুধার্ত থাকার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কেউ ভ্রান্তির শিকার হতে পারে যে, বোধ হয় তীব্র ও মারাত্মক পর্যায়ের ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করতে বলা হয়েছে। এটা ঠিন নয়; বরং এরূপ বলার কারণ, যে সব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত অনুরাগ ও আকর্ষণ বেশী, অথচ মানুষের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলো নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে শরীয়ত এ জাতীয় কঠোরতা অবলম্বন করে থাকে। এতে জনসাধারণ মনে করে, মানব প্রকৃতির বিরোধিতাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। কিন্তু যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী তারা অবশ্যই বুঝে নেয় যে, কেবলমাত্র প্রকৃতির অত্যধিক অনুরাগ ও লোভের কারণেই ইসলামী শরীয়ত এত কঠোর বাচনভঙ্গী অবলম্বন করেছে।

কারণ, মানুষ স্বভাব-প্রকৃতির মূলোৎপাটন বা আমূল পরিবর্তন সাধন কোন সহজ ব্যাপার নয়। পরন্তু শরীয়ত তার অনুমোদনও করে না। উল্টা কেউ যদি স্বভাবের বিরোধিতা করে অথবা তার বিলুপ্তি সাধন করতে চায়, তবে শরীয়ত তাকে রীতিমত বারণ করে।

অতএব, মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই মূল উদ্দেশ্য। এটি প্রকৃতির তীব্র আকর্ষণ ও শরীয়তের শক্ত বারণ এতদুভয়ের মাঝেই নিহিত। এখানে খাদ্য সংকোচনের নির্দেশের তাৎপর্য তা-ই। কাজেই ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাবের জন্য উত্তম হচ্ছে, এ পরিমাণ পানাহার করা, যাতে পেট খারাপ হয়ে ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটতে পারে। সাথে সাথে একটানা দীর্ঘ সময় অনাহারীও না থাকতে হয়। এতে শরীর দুর্বল হয়ে কর্মস্পৃহা হ্রাস পেতে পারে। এতটুকু পরিমাণ পানাহার করা উচিত, যাতে শরীরের ওপর খাবারের কোন প্রভাব না পড়ে; বরং তা অতি দ্রুত হজম হয়ে যায়।

ফলশ্রুতিতে ফেরেশ্তা সম্প্রদায়ের সাথে একপ্রকার সাদৃশ্য সৃষ্টি হবে। ফেরেশ্তাগণ উদরপূর্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

শর্ত-৩ : নীরবতা অবলম্বন করা

তৃতীয় শর্ত নীরবতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ, যিকির-ইবাদত ও কল্যাণের কথা ছাড়া মুখ খুলবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"(তিরমিযী : ৪/১৮৪ ও ৩৬১, জামে সগীর : ৪/৩৬১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, "মানুষকে অধঃমুখ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বস্তুত জিহ্বার কর্তিত ফসল (অবাঞ্ছিত বুলি ও বচন)ই এর একমাত্র কারণ।" (তিরমিযী : ২/১০৩)

হযরত আলী রা. বলেন, "সমস্ত নেক কাজ চার বস্তুত মধ্যে সীমাবদ্ধ; যথা -১. কথা, ২. নীরবতা, ৩. দৃষ্টি ও ৪. অঙ্গ সঞ্চালন।

মূলত মহান আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বলাই অনর্থক। সুচিন্তাশূন্য নীরবতা এক প্রকার গাফেলতি বা বিস্মৃতি। শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত দৃষ্টিপাত উদাসিনতার শামিল। ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অঙ্গ সঞ্চালন উন্মাদনার শামিল। আল্লাহ্ তায়ালা সে বান্দার প্রতি দয়া করুন, যার কালাম যিকির, সামান্য নড়াচড়া ইবাদত এবং সমাজের মানুষ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত। সর্বোপরি মিথ্যা ও মুনাফেকি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার বিরুদ্ধে অনুযোগের সুরে বলেন,

يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

"তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।" (সূরা ফাত্হ : আয়াত-১১)

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তায়ালা যখন শৈশবে হযরত ঈসা আ. এর মুখে কথা ফোটানোর ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত মারইয়াম আ. কে হুকুম করলেন, তোমাকে কেউ সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে যে, কোথায় পেলে? বলবে, আমি আজ কারো সাথে কথা না বলার রোযা মানত করেছি। সেকালে শরীয়তে রোযার নিয়ম এমনই ছিল।

এরপর হযরত মারইয়াম আ. যখন আল্লাহ্র হুকুমে মুখ বন্ধ করলেন, তখন হযরত ঈসা আ. আশৈশব দোলনায় কথা বলা শুরু করলেন। অনুরূপভাবে যখন সালেক আপন মুখকে বেহুদা কথা থেকে সংযত রাখবে তখন তার অন্তর থেকে (আল্লাহর পথের শিশুতুল্য) অনুরূপ কথা শুনতে শুরু করবে। নিয়ম হচ্ছে যখন মুখ কথা বলে, তখন অন্তর নীরবে শুনতে থাকে আর যখন মুখ নির্বাক থাকে তখন অন্তর কথা বলতে শুরু করে। এজন্য মুখ বন্ধ রাখবে, যাতে অন্তরকে অহেতুক কথা শুনতে না হয়; বরং মুখ সবসময় যিকির দ্বারা সতেজ রাখবে, যেন অন্তরও যিকির শুনে শুনে যিকিরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শর্ত-৪ : খিলওয়াত বা নির্জনবাস অবলম্বন করা

চতুর্থ শর্ত সর্বদা খিলওয়াত তথা নির্জনতা অবলম্বন করা। খিলওয়াতের মর্ম হচ্ছে, কলবের অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলো সক্রিয় করে তোলার জন্য দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিষ্ক্রীয় রাখা। যাতে জাগ্রত অবস্থায় ওই সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, যেগুলো মানুষ সাধারণত স্বপযোগে দেখতে পায়। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো বন্ধ করা ব্যতীত হৃদয়ের ইন্দ্রিয়গুলো উন্মোচিত হয় না। এ কারণেই নিদ্রামগ্ন অবস্থায় এমন বহু বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, সজাগ থাকতে যা দেখা যায় না। কারণ, ঘুমন্ত অবস্থায় বাহ্যিক উপলব্ধিগুলো নিষ্ক্রীয় থাকে। কাজেই, কেউ জাগ্রত অবস্থায়ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো নিস্ক্রীয় রাখতে পারে তবে অবশ্যই তার অন্তরের ইন্দ্রিয়গুলো সক্রিয় হবে। ফলশ্রুততে যে সকল বস্তু স্বপ্নযোগে দৃশ্যমান হয় সেগুলো জাগ্রত অবস্থায়ই সে দেখতে আরম্ভ করবে।

এ কারণেই নবুয়তপূর্ব পনের বছর পর্যন্ত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় খিলওয়াতপ্রিয় হয়েছিলেন। লোকালয় ছেড়ে তিনি হেরাগুহায় নিবিড় নির্জনতায় কখনো একটানা এক সপ্তাহ, কখনো দু' সপ্তাহ ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতেন। অদৃশ্য জগতের বিচিত্র নূর জ্যোতি মোশাহাদা করতেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিরি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরাগুহায় কোন সময় দীর্ঘ একমাস অবধি অবস্থান করতেন।

সালেকের খিলওয়াত বা নির্জনবাসের স্থানটি এতটুকু সংকীর্ণ হওয়া উচিত, যাতে যিকিরের সময় সেখানে কেবল একটু আসন গেড়ে বসতে পারে ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে, এতটা অন্ধকার হবে, যেন তার মধ্যে সূর্যের কিরণ ও দিনের আলো প্রবেশ করতে না পারে।

নির্জনবাসী সালেক কোনো দীনি প্রয়োজন যেমন অযূ, নামায, জামায়াত, জুমুয়া প্রভৃতি ছাড়া স্বভাবপ্রকৃতির চাপ, একাকীত্বের কষ্ট দূরীকরণ বা নফ্সের কামনা-বাসনায় পরাভূত হয়ে নির্জনগৃহ থেকে বের হবে না; বরং বীর-পুরুষের মত উচ্চ মনোবল রাখবে। স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অনড় অবিচল থাকবে। সর্বোপরি এর জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। আলস্য ও কাপুরুষতাকে কাছে ঘেঁষতে দিবে না। আল্লাহর খাঁটি ও অকৃত্রিম আশেক হওয়ার চেষ্টা করবে। নিজের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অন্য সবকিছুকে পিছনে ছুঁড়ে মারবে। অন্তরের সুখ, নফ্সের স্থিরতা ও রূহের প্রশান্তি নিয়ে অটল ও দৃঢ়পদ থাকবে। স্বভাবকে যাবতীয় প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র রাখবে। অন্তরকে তাকওয়ার দ্বারা সমৃদ্ধ করবে। আকলকে ঈমান দ্বারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আনুগত্য দ্বারা আবাদ করবে। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে সততা ও একনিষ্ঠতা

দ্বারা নূরান্বিত ও জ্যোতির্ময় করবে, বক্ষকে আমলের আলোকরশ্মি দ্বারা প্রশস্ত করবে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় খাস বান্দাদেরকে এরই নির্দেশ দিয়েছেন। অনন্তর এদেরকেই বুদ্ধিমান ও সত্যিকারের জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

খিলওয়াতনাশী'র আদব

খিলওয়াতনাশী'র আদব নিম্নরূপ যথা- বিনয়, নম্রতা, তাচ্ছিল্যবোধ, অহংকারশূন্যতা, নম্র স্বভাব প্রভৃতি নান্দনিক চরিত্রে চরিত্রবান হবে। এজন্য প্রয়োজনে নফ্সকে কঠোর শাস্তি ও কানমর্দণ করতে থাকবে। দুনিয়া ও তথাকার পদ ও রূপের পাগল হবে না। কম খাওয়া, বেশিরভাগ সময় চুপ থাকা, অত্যধিক পরিমাণ নামায, রোযা, সবর, শোকর, একীন, বদান্যতা, অল্পেতুষ্টি, আমানতদারি, শান্ত-মেজাজ ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। হালাল খাবার ও হালাল পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করবে, যাতে শয়তান প্রতারিত করতে না পারে। উত্তম হচ্ছে, খিলওয়াত অবলম্বনের পূর্বেও রিয়াযাত ও নির্জনবাসের অভ্যাস গড়বে। কম খাওয়া, কম ঘুমানো, জনসাধারণের সাথে মেলামেশা হ্রাস করা ও পানি কম পান করা নিজের অভ্যাসে পরিণত করবে। অতি মাত্রায় গোশ্ত আহার করবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "গোশত আহার করলে নফ্সের মধ্যে কামস্পৃহা জাগ্রত হয়।"

সপ্তাহে দু'একবার গোশত খেলে ২৫০ গ্রামের বেশি খাবে না। মাশায়েখে কেরামের পক্ষ থেকে সপ্তাহে এ পরিমাণ গোশত ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে, যাতে সালেক দূর্বল হয়ে না পড়ে। খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হলো, রুচিমতো সহজপাচ্য হালকা খাবার গ্রহণ করা। হজমে দেরী হয় এমন খাবার খাবে না, তাছাড়া পেট ভরেও খাদ্যগ্রহণ করবে না। পানাহারের আদব হচ্ছে, বিসমিল্লাহ বলে খাবার আরম্ভ করবে, ছোট লোকমা খাবে।

যিকিরের সময় অন্তর হাজির রাখার চেষ্টা করবে, যাতে করে খাদ্যস্পৃহার আবিলতা যিকিরের নূরে রূপান্তরিত হয়। গলধঃকরণকালে আল্লাহর শোকর আদায় করবে যে, তিনি অনায়াসে লোকমা গলধঃকরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। পূর্বের লোকমা পেটে যাওয়ার পর পরবর্তী লোকমা হাতে নিবে। এ প্রক্রিয়ায় পানাহারের শেষ পর্যন্ত প্রতি লোকমায় আল্লাহর ধ্যান ও শোকরের আমল অব্যাহত রাখবে।

অনুরূপ পানিও এক ঢোক এক ঢোক করে পান করবে। প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে ও শেষ করে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

কোন কোন সূফী নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন এভাবে যে, পিপাসাও এক ধরণের মিথ্যা খাহেশ বা প্রবৃত্তির চাহিদা। কেউ যদি পিপাসার মুহূর্তে পানি কম পান করার অভ্যাস করে, তাহলে আল্লাহ তার তৃষ্ণা দূর করে দিবেন। একপর্যায়ে এমন হবে যে, সে মাসের পর মাস চলে যাবে কিন্তু পানির পিপাসা লাগবে না। এমনকি তার শরীর ও মেজাজে কোন প্রতিক্রিয়া পড়বে না। খাদ্যের মধ্যে যতটুকু আদ্রতা ও পানি থাকে, তা–ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

শায়খ মুহিউদ্দীন নববী রহ."রিয়াযুস্ সালেহীন" এ লিখেছেন, ফিতনা-ফাসাদের যুগে যদি অনন্যোপায় হয়ে কখনো হারাম বা সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হয় তবে এক্ষেত্রে নির্জনতা অবলম্বন করা মোস্তাহাব।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে ঘোষণা করেছেন,

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللهِ اِنِّىْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

"তোমরা মহান আল্লাহর দিকে ছুটে চল। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে স্পষ্টরূপে সতর্ক করছি।" (সূরা যারিয়াত : আয়াত-৫০)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত সায়াদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ তায়ালা তাঁর সে বান্দাকে ভালোবাসেন যে মুত্তাকী, আল্লাহভীরু, পূত-পবিত্র, অন্তরের ধনী, (অর্থ ও সম্পদের মোহমুক্ত) ও গোপন (নির্জনবাসী ও অখ্যাত)।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ আছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন,"জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হুযূর! সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, যে মুমিন নিজের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, এর পরের স্তরের উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "যে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করার জন্য পাহাড়ের ঘাঁটিতে বসে গেছে।"

অপর রেওয়ায়েতে এসেছে, দ্বিতীয় স্তরের উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে, যে আল্লাহর ভয়ে নিজের অনিষ্ট থেকে অন্যদের নাজাত দেয়। এমনভাবে আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে সহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত আছে, "অবিলম্বে এমন সময় আসছে, যখন দীনের ওপর ফিতনা আসবে তখন মুসলমানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে বকরি। মানুষ দীন-ঈমান রক্ষার খাতিরে বসতি ছেড়ে পালিয়ে যাবে আর সে বকরী নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেন, "রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী আগমনের সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন। তার ব্যাখ্যা সুবহে সাদেকের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যেত অতঃপর তা বাস্তবে প্রতিফলিত হতো। অতঃপর তিনি হেরাগুহায় নির্জনবাস অবলম্বন করেন। একত্রে কয়েক দিনের খাবার নিয়ে তথায় একাগ্র মনে ইবাদত করতেন। এর মধ্যে বাড়ি ফিরতেন না। খাবার ফুরালে পুনরায় হযরত খাদীজা রা. এর নিকট গিয়ে খাবার নিয়ে আসতেন ও পূর্ববৎ ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতেন।

এ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিলো। ইত্যবসরে একদিন হেরাগুহায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হলো। ওহীর সূচনা এভাবে হল যে, একদা হযরত জিবরাঈল আ. আগমন করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন,"পড়ুন।" তিনি জবাব দিলেন,"আমি পড়তে জানি না।"

অতঃপর তিনি রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুকের সাথে সজোরে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "এবার পড়ুন।" তিনি এবারও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। হযরত জিবরাঈল আ. দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

"পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাধা রক্ত হতে। পাঠ করুন, আপনার মহিমান্বিত পালনকর্তার নামে, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" (সূরা আলাক : আয়াত-১-৫)

অবশেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে হযরত খাদীজা রা. এর নিকট এসে বললেন, "আমার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দাও, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।" কিছুক্ষণ কাপড় জড়ানো অবস্থায় থাকার পর আশংকা দূর হল। তখন হযরত খাদীজা রা.কে বললেন, "আমার জীবন নিয়ে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

হযরত খাদীজা রা. বললেন, " সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। কসম আল্লাহর, কোন অবস্থায়ই তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তা রক্ষা করেন, সদা সত্য কথা বলেন, দূর্বলদের বোঝা বহন করেন, দুস্থ ও নিঃস্ব মানবতার জন্য উপার্জন করেন, অতিথিদের প্রাণ খুলে আপ্যায়ন করেন, সত্যের পক্ষে সহায়তা করেন। (এ ধরণের সদাচারী মানুষ কখনো ধ্বংস হয় না, হতে পারে না।)"

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন, "রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বড় উন্নত চরিত্রের অধিকারী, নিষ্পাপ ও সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজতে। তদুপরি তিনি নিজের ব্যাপারে এতটা শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাহলে অন্যদের ব্যাপারে আর কী বা বলা যেতে পারে? সারকথা, পঙ্কিল হৃদয় ও বিকৃত স্বভাব নিয়ে সুলূক ইলাল্লাহ্ বা খিলওয়াতের আমল ও চিল্লাকাশি কীকরে শুদ্ধ হতে পারে? কেউ যদি আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা ও শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে তার জন্য উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা. কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলি অর্জনের বিকল্প নেই।"

ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিমে লিখেছেন, "নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করা আউলিয়া ও আরেফীনের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবূ সোলায়মান খাত্তাবী রহ. বলেন, নির্জনতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয় ছিল। এর দ্বারা কলব নানা ব্যস্ততা ও ঝামেলা হতে নিস্কৃতি ও অবসর পায়। সুষ্ঠু, সৎ ও ভালো চিন্তার সুযোগ হয়। সকল পার্থিব বাঁধন ছিন্ন ও সহজে খুশূ হাসিল হয়। হযরত জিবরাঈল আ. হেরাগুহায় প্রথম সাক্ষাতেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিরায়াত (পঠন) ও দাওয়াতে দীনের হুকুম করেন। কারণ, রাসূলে

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতোমধ্যেই বহু রিয়াযত, মোজাহাদা ও সাধনা করে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে নিজের কলব ও বাতেনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।

দীর্ঘ দিনের নির্জনবাসে তাঁর আত্মিক অগ্রগতি ও উড্ডয়ন আরো দ্রুত হয়েছিল। আপন শহর ও বাড়ি-ঘরকে আল-বিদা' জানিয়েছিলেন। জীবন রক্ষার জন্য যৎসামান্য খাবার গ্রহণ করে নিজ কর্তব্য আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। কখনো যাহেরী দুনিয়ার এ দু'লোকমাও মুখে দিতেন না। বলতেন, আমি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে আপ্যায়িত হয়ে থাকি।

মোটকথা, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জগতের সবকিছু হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দীন প্রচারের জন্য আগ্রিম নিজেকে উপযোগী করে নিয়েছিলেন, তখনই আল্লাহ্ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নিলেন ও রিসালাতের বিরল সম্মানে ভূষিত করলেন।

লক্ষ্য করুন, আখাস্সুল খাওয়াস বান্দা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অপরাপর নবী-রাসূলগণের সাথে এটিই যদি হয় মহান আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস ও অমোঘ নীতি তাহলে আল্লাহ অন্বেষীদের জন্য এঁদের অনুকরণের বিকল্প আছে কী?

সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহর বিশেষ কৃপা, নৈকট্য কেবল রিয়াযত, খিলওয়াত, সংশ্রব ত্যাগ ও অল্প আহারের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

'আওয়ারিফুল মায়ারিফ' গ্রন্থে ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, সরওয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "অচিরেই লোকদের ওপর এমন একটি সময় আসছে, যখন কেবল সে ব্যক্তি ব্যতীত কারো দীন নিরাপদ থাকবে না, যে শিকারী তাড়িত শেয়ালের মত নিজের দীন-ধর্ম নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ও এক গর্ত থেকে অন্য গর্তে পালিয়ে বেড়াবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন পরিস্থিতি কখন হবে?" উত্তরে তিনি বললেন, "যখন পাপাচার ও অবৈধ কামাই ছাড়া উপার্জন অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরন্তু তখন বিবাহ না করাও বৈধ হবে।

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হুযূর! বিবাহ করা তো শরীয়তের নির্দেশ। তাহলে বিবাহ বর্জন করা বৈধ হয় কীকরে? প্রত্যুত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,

"এজন্য বৈধ হবে যে, তখন পিতা-মাতা নিজ হাতেই সন্তানদের ধ্বংস করবে। পিতা-মাতা না থাকলে স্ত্রী, স্ত্রী না থাকলে নিকট আত্মীয়দের হাতে এ ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হবে।"

সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কথার ব্যাখ্যা কী? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন, "চরম অভাব ও দৈন্যতা দেখে আত্মীয়-স্বজনরা তিরস্কার করবে, ধিক্কার দিবে। এতে সে অপমান বোধ করবে, এরপর সম্পদশালী হওয়ার আশায় হালাল-হারাম পার্থক্য ছাড়াই অর্থ উপার্জনে লিপ্ত হবে। এর অনিবার্য পরিণতিতে দীন-ধর্ম বরবাদ করে পতন ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে।"

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হালকা বোঝাধারী মানুষ সর্বোত্তম বিবেচিত হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হালকা বোঝার অর্থ কী? প্রত্যুত্তরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যার স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না সে হালকা বোঝাধারী। কারণ, কিয়ামতের দিন এমন লোকের হিসাব-নিকাশ হবে খুবই সহজ ও হালকা।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি দীনের নিরাপত্তা ও দেহমনের প্রশান্তি কামনা করে, সে যেন মানুষের সঙ্গ ছেড়ে একাকী থাকে। কারণ, এটা আশংকা যাপনের সময়। বস্তুত বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে এ সময় একাকী ও নিঃসঙ্গ থাকে।

খিলওয়াত সম্পর্কে একটি সংশয় ও তার নিরসণ

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বলেছেন, যে মুমিন সমাজে বসবাস করে, তাদের দেয়া নানা কষ্ট-উৎপীড়ন সহ্য করে, সে ওই মুমিনের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না ফলে তাকে জনসাধরণের প্রদত্ত কষ্ট-উৎপীড়নও সহ্য করতে হয় না।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বাহ্যত লোকালয়ে বসবাস তথা সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, অথচ পূর্ববর্তী বর্ণনা দ্বারা নির্জনতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাণিত হয়েছে। এর সমাধান কী? এর সমাধান হচ্ছে, বস্তুত হাদীসের মর্ম এরূপ নয়; বরং হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

যে মুসলমান রিয়াযত, মোজাহাদার মাধ্যমে নফ্স ও আত্মাকে সুস্থ ও পরিশীলিত করতে সক্ষম হয়েছে, তকদীর ও ভাগ্যলিপির ওপর সে সম্পূর্ণ তুষ্ট ও তার হৃদয় প্রশান্ত। একদিকে সে সহনশীলতা, স্থিরতা, ক্রোধদমন, অত্যাচারসহন, গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলন, সর্বকাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন, বদান্যতা, অল্পেতুষ্টি, গুনাহ্ বর্জন প্রভৃতি নান্দনিক গুণাবলি অর্জন করেছে; অপরদিকে লোভ-লালসা, ক্রোধ, বড়ত্ব, আত্মপ্রশংসা, অহংবোধ প্রভৃতি চারিত্রিক ত্রুটি ও ঘৃণ্য অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পেরেছে। এমন সুজনের জন্য সাথীহীন থাকার চেয়ে সমাজের ভিতর থাকা ও সমাজস্থ লোকদের দেয়া কষ্ট ও ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করা উত্তম। কেননা, তার দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে, সাথে সাথে জনসাধারণের সাথে মেলামেশার কারণে তার দীনের কোন ক্ষতি হবে না। পরন্তু এতে মাওলা পাকের সাথে তার নিবিড় সম্পর্কে কোনো ঘাটতি হবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি; বরং তার মধ্যে হিংস্রতা ও পশুর স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে, তার ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী অবশ্যই প্রযোজ্য নয়; বরং তার জন্য নির্জনতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। যাতে তার কু-অভ্যাসের কারণে লোকদের কষ্ট না হয়, আল্লাহর বান্দারা তার কুৎসা রটনা, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি হাজারো অনিষ্ট থেকে হেফাযত থাকে। কেননা, প্রবৃত্তির পূজারী বল্গাহীন জীবনের মানুষ থেকে এসব ছাড়া আর কী আশা করা যায়।

ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, এ হাদীসে নির্জনতার প্রতি সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, হাদীসে "মুমিন" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা কামিল ও পূর্ণাঙ্গ মুমিন উদ্দেশ্য। আর কামেল মুমিন বলা হয় পরিমার্জিত ও পুণ্যময় আত্মার মানুষকে।

উপরন্তু "মুমিন" শব্দের পাশাপাশি এ কথা উল্লেখ থাকা,"সে মাখলুকের দেয়া কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করে।" আমাদের উক্ত দাবীকে আরো শক্তি যোগায় ও তৎসঙ্গে এও ইঙ্গিত বহন করে যে, যার ভিতর এ ধরণের গুণক্ষমতা অনুপস্থিত, তার জন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকাই উত্তম। কিন্তু কিছু সংখ্যক স্থূলবুদ্ধির লোক হাদীসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য না বুঝে শর্তহীনভাবে মানুষের সাথে মেলামেশাকে নির্জনতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। এটি হাদীসের অপব্যাখ্যা ও জঘন্য অন্যায়।

সুতরাং হে নফ্সের সংশোধন প্রত্যাশী সালেক! নফ্সের কু-প্রবৃত্তি দমনের জন্য জোড়ালো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। যাতে যাহেরী ও বাতেনী একাগ্রতা অর্জন করে কামেল মুমিনে পরিণত হতে পারো।

আল্লামা সিররী সাক্তী রহ. বলেন, "কামেল সে ব্যক্তি জনসাধারণের সাথে মেলামেশার দরুণ যার নূরে তাকওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রভাবিত হয় না।

জেনে রাখা উচিত, সালেকীন অর্থাৎ, তাসাউফ ও সুলূকের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ তথা দিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মাশায়েখে তরীকত নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছেন। তবে সাহাবায়ে কেরামের যুগের পরের বেশিরভাগ মাশায়েখে এযাম খিলওয়াত ও নির্জনতার মাধ্যমে সালেকদের তাসাউফ ও সুলূকের পথ অতিক্রম করে এসেছেন। সাহাবায়ে কেরামের তো নির্জনতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল না। কেননা তাঁরা রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোনালী পরশে নিমেষের মধ্যে রূহানি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করতেন। প্রতিটি মজলিসে তাঁরা এত মায়া'রিফ ও অভিজ্ঞান হাসিল করতেন যা অন্যদের পক্ষে বছরের পর বছর নিরন্তর সাধনা ও নির্জনবাসের পরেও অর্জন করা সম্ভব হয় না। সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত অগ্রগতির কারণ ছিল তাঁদের ইরাদাত।

ইরাদাত অর্থ পুরাতন আদত ও অভ্যাস পরিত্যাগ করা। এ সিফাতে তাঁরা ছিলেন অতুলনীয় ও সকলের চেয়ে অগ্রগামী। কেননা, তাঁরা ছিলেন জাহেলী রসম-রেওয়াজ ও সংস্কারে বিশ্বাসী। মুসলমান হওয়ার পর নবুয়তের ফায়েয ও বরকতে তাঁরা পূর্বের রীতিনীতি একেবারে ঝেড়ে মুছে মনেপ্রাণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়ে গেলেন। তাঁদের ইবাদাত ছিল নিঃছিদ্র ও ফাটল মুক্ত। ফলে সংস্কার ত্যাগের পরীক্ষায় তাঁরা সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের অন্তরকে আপন মহব্বতের অমীয় সুধা পান করালেন

ও সুদৃঢ় ঈমান নসীব করলেন। ফলশ্রুতিতে তাঁরা নিজ পরিবার-পরিজন, অর্থ-সম্পদের সাথে জড়িত থেকে ও চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা কারিগরি পণ্য ও হস্ত শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা সত্ত্বেও সালেহীন, সিদ্দীকীনসহ মুনাফিক ও কাফিরদের বিশাল মিশ্র জনগোষ্ঠীর সাহচর্যে সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পরও তাঁদের কাইফিয়ত ও উচ্চ হালতে কোনরূপ পার্থক্য কিংবা বিঘ্ন ঘটেনি, ঈমানের স্তর কিঞ্চিৎ নীচে নামেনি।

পরন্ত সদা তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রতি। এমনকি তাঁর একটি ইশারায় প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা নিমগ্ন ছিলেন সে মাহবূবে কিবরিয়া রহমত দোজাহাঁ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূপমাধুরী অবলোকন ও সুষমতা নিহারণে অকুণ্ঠ নিমজ্জিত।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসন্দেহে যাবতীয় মহৎ গুণ ও পূর্ণতার উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু। সাহাবায়ে কেরামের অদম্য সদিচ্ছা ও নিরন্তর অন্বেষণ স্পৃহা দেখে স্বীয় নবুয়ত সূর্যের আলোকরশ্মি তাদের ওপর ফেললেন। নববী চোখের একটি চাহনীতে আনওয়ারে নবুয়ত ও তার জ্যোতিরাশি তথা রিসালাতের খনিজাত মনিমুক্তা দ্বারা তাদের ধনবান করে দিলেন। যেমন- শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তায়ালা আমার সিনায় যাকিছু দান করেছিলেন আমি তা আবূ বকরের সীনায় ঢেলে দিয়েছি।"

সারকথা, সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়জগত ছিল নূরে নবুয়তে আলোকিত, উজ্জ্বল। তাঁদের অস্তিত্বের দীপশিখা ছিল সে আলোয় রওশন ও ঝলমলে। ফলে তাঁদের মানবীয় দূর্বলতা একেবারেই শীর্ন ও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ছিলেন উচ্চ স্তরের ইবাদতগুজার, দুনিয়াত্যাগী; পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ, শরীয়ত ও মা'রেফতের সমন্বিত ইল্‌মের অধিকারী। পরবর্তীতে তাঁদের মা'রেফতের আলোকরশ্মি প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তাবেয়ীদের কলব ও জানের ওপর। এতে তাঁদের কলব ও জান খাঁটি নূরে পরিণত হয়েছিল। নূর বিকিরণের এ বর্ণাঢ্য সোনালী ধারাবাহিকতা পরবর্তীতেও অব্যাহত ছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার সকল সাহাবী আকাশের তারকাতুল্য; তোমরা তাদের মধ্য হতে যাঁরই অনুকরণ করবে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।" এখানে মূলতঃ সে নূরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা আকাশের নক্ষত্রের মত নিজ নিজ যোগ্যতা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী স্বল্প বিস্তর প্রত্যেক সাহাবীই লাভ করেছিলেন। যার প্রভা যুগ যুগান্তরে অন্যদের কলবকে প্রদীপ্ত ও উদ্ভাসিত করে তাদের বানিয়েছিল মহান আরেফ ও ওয়াসেল তথা আল্লাহর মিলনপ্রাপ্ত।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের কেবল একটি পলক মাটির মানুষকে এপর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে, পারে তার ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। তখন সে বরকতময় মজলিস ও অমূল্য সাহচর্যের চেয়ে কোনো নির্জনতা শ্রেষ্ঠ হতে পারে কী? এমন কে আছে যে এমন মহৎ বিদুৎ তাছীর সোহবত ছেড়ে সাহাবায়ে কেরামকে নির্জনতা অবলম্বন ও বনবাসী হওয়ার পরামর্শ দিবে? খিলওয়াত বা নিঃসঙ্গতার সাধনা তো এ অমূল্য সম্পদ হাসিল করার জন্যই প্রচলন করা হয়েছে। বস্তুত সাহাবায়ে কেরাম এ অমূল্য সম্পদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে তাঁর সোহ্বতে অবস্থান করে হাসিল করতেন।

পক্ষান্তরে যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ ফায়েয লাভ করতে সক্ষম হননি তাদের জন্যই খিলওয়াতের বিধান করা হয়েছে। তাছাড়া এটি খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও আমল ছিলো। পরন্তু এ খিলওয়াত আল্লাহর রহমতের সুগন্ধি প্রাপ্তির জন্য খুবই জরুরি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "দেখ, কালের আবর্তন ও ঘুর্ণিপাকে তোমাদের জন্য রয়েছে সুরভীর অগণন ঝাপটা। কাজেই, তোমরা সে ঝাপটার মুখে গিয়ে দাঁড়াও।"(তাহলে তোমরাও সুরভীত হতে পারবে।) তবে এ সুরভী পেতে হলে আল্লাহ্ তায়ালার যাবতীয় হুকুম-আহকাম, আদেশ-বারণ যথারীতি পালন পূর্বশর্ত। অমনোযোগী ও অস্থির মনের মানুষের পক্ষে শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পালন করা বড়ই কঠিন। এমন অস্থির মানুষের জন্য খিলওয়াত মহৌষধ। এর মাধ্যমেই সে ফিরে পেতে পারে হৃদয়ের প্রশান্তি ও মনের স্থিরতা। খিলওয়াতনাশীঁকে খিলওয়াতের আমল শুরুর পর তা অব্যাহত রাখতে হবে। কয়েকদিন করার পর বাদ দিলে ফল পাওয়া যাবে না।

খিলওয়াত বা নির্জবাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

খিলওয়াত মহান আল্লাহর এক অনন্য নিয়ামত, যা দিলকে মাখলুক থেকে ফারেগ ও মুক্ত করে দেয়। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের জন্য চিন্তা ও মনকে একাত্ম করে দেয়। ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল ও শক্তিশালী করে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও কাম স্পৃহা নিস্তেজ করে দেয়। কারণ, খিলওয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহকে স্থগিত ও নিষ্ক্রীয় করে রাখা। চোখ হচ্ছে দিলের সদর দরজা। কেননা, কু-চিন্তা, কামভাব, গোনাহের স্পৃহা প্রভৃতি কলবের ব্যাধি। যাবতীয় অনিষ্টের উৎস ও মূল হচ্ছে দর্শনেন্দ্রীয় বা চোখ।

বলাইবাহুল্য, খিলওয়াতে থাকলে চোখ এমনিতেই রুদ্ধ, বন্ধ ও নিষ্ক্রীয় থাকে। এতে অন্তরের বহু ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চোখের সামনে আপত্তিকর কিছু পড়বে না। পড়লেও সেদিকে মন ধাবিত হবে না। অর্থ অথবা নারীর লিপ্সা কোনটাই জন্ম নেবে না। প্রবাদ আছে, চোখ গেল তো আপদ গেল।

অতএব, দীনদার জ্ঞানী কখনো খিলওয়াতের মাহাত্ম্য, নির্জনতার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষত খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেরাগুহায় গিয়ে বার বার নির্জনবাস অবলম্বনের ঘটনা সুবিদিত। অনন্তর এটি খিলওয়াতের শেষ্ঠত্বে ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ। ইতিহাস অস্বীকার করার সাধ্য কারো আছে কী?

কোন কোন শায়খ খিলওয়াতের সময়কাল চল্লিশ দিন ধার্য করেছেন। দলিল হিসেবে তারা হযরত ইবনে আব্বাস রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর সাথে ইখলাস রক্ষা করে চলবে, তার অন্তর ও রসনা থেকে হিকমত ও অভিজ্ঞানের ফোয়ারা প্রবাহিত হবে।"

কিছুসংখ্যক শায়খ হযরত জাবের রহ. এর রেওয়ায়েতের ওপর ভিত্তি করে খিলওয়াতের মেয়াদ একমাস নির্ধারণ করেছেন। উল্লেখ্য, হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী আগমনের সূচনা হয়েছিল ভালো, সত্য ও বাস্তবমুখী স্বপ্নের মাধ্যমে। এতে তিনি নির্জনতার প্রতি আরো বেশি অনুরাগী হন। এরপর শুরু হলো ওহী অবতরণের সোনালী ধারা।

অতএব, প্রতীয়মান হলো যে, খিলওয়াত ও নির্জনবাস অন্যতম দলিল ভিত্তিক দীনি আমল। ভিত্তিহীন বা শরীয়ত বহির্ভূত কোনো প্রথা নয়।

অবশ্য এটা ভিন্ন কথা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিলওয়াত কোন ঘৃণ্য অভ্যাস ও চরিত্র হননকারী অনুশীলন নয়। কারণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত লাভের পূর্বেও ছিলেন মা'সূম ও নিষ্পাপ। সর্ব প্রকার অসমীচীন কার্যকলাপ ও অসুন্দর আচরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কোন অশালীন কাজ ও অপ্রীতিকর গতি-প্রকৃতি তাঁর থেকে কখনই দৃষ্টিগোচর হয়নি। অনন্তর বড় নিষ্কলুষ ও লাজুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। শৈশবে যখন পবিত্র কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণের কাজ চলছিল, বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পূন্যময় কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কাঁধে করে পাথর বহন করতে হবে। পাথরের ঘষায় কাঁধ জখম হতে পারে। অপর দিকে কাপড় পরে দ্রুত হাঁটতে কষ্ট হবে এসব ভেবেচিন্তে বালক নবী পরণের কাপড় খুলে কাঁধের ওপর রাখলেন। সতর খোলা মাত্র তিনি বে-হুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সম্বিত ফেরার পর আকাশের দিকে এক নজর তাকালেন ও তাৎক্ষণাত সতর ঢেকে নিলেন।

এ ঘটনার পরে কেউ কোন দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর দেখতে পায়নি। এমন মহান ও নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের নির্জনবাস আর সাধারণ উম্মতের নির্জনবাস কখনো এক সমান হতে পারে না। যাহোক, যখন একটানা খিলওয়াত ও নির্জনবাস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। অনন্তর মহান আল্লাহও তাঁকে বারণ করেননি; বরং বলা যায়, বাহ্যত খিলওয়াতই হচ্ছে ফেরেশ্‌তার আগমন এবং কুরআন মাজীদ ও ওহী নাযিলের কারণ।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা কেবল খিলওয়াত ও নির্জনবাসের বৈধতাই নয়; বরং তার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হল। কাজেই, এটি নাজায়েয ও শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ার কোন কারণ নেই। যদি না-জায়েযই হত তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাবীবকে অবশ্যই বারণ করতেন। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোনাহের কাজ করবেন, আর

আল্লাহ্ তায়ালা নিরব থাকবেন, তাঁকে ওহী মারফত বারণ করবেন না তা হতেই পারে না। পরন্তু বিষয়টা আকীদার খেলাফও বটে।

সারকথা, খিলওয়াত যেরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কল্যাণময় প্রমাণিত হয়েছিল আমাদের জন্যও তা নিঃসন্দেহে বরকতের কারণ হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"(হে মুহাম্মদের উম্মতগণ!) তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব : আয়াত-২১)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

"(হে মুহাম্মদ!) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুকরণ কর। এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের খিলওয়াত অবলম্বন করার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস তাঁদের অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ করে দিয়েছিল। অনন্তর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পরে যুদ্ধাভিযানের ব্যস্ততা এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সাহাবায়ে কেরাম নির্জনতা অবলম্বনের অবকাশ পাননি। সত্যি বলতে কী, শরীয়তের বিধি-বিধানের শক্তিবৃদ্ধি, অনড় প্রতিষ্ঠা এবং সুদৃঢ় করণের পর তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের অবশ্যই খিলওয়াত বা নির্জনবাসের প্রতি গভীর মনোযোগ আরোপ করেছেন।

খিলওয়াত বা নির্জনবাসের সুফল ও উপকারিতা

খিলওয়াত ও নির্জনবাসের বহু উপকারিতা রয়েছে; যথা- খিলওয়াত বা নির্জনবাসের সময় পাক-পবিত্র থাকতে হয়। সারাক্ষণ অন্তর ও মুখের যিকির অব্যাহত থাকে। অত্যধিক পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ হয়। রিপুপূজা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে পরিত্রাণ মিলে, জুমুয়ার নামাযের যথাযথ যত্ন নেয়া যায়, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময় আদায় হয়। (কারণ, খিলওয়াতনাশী বা নির্জনবাসী সবসময় জামায়াতের জন্য অপেক্ষমান থাকে। পক্ষান্তরে পার্থিব নানা ঝক্কি-ঝামেলায় জড়িত মানুষের নানা কারণে জামায়াত ছুটে থাকে।) পরিপূর্ণ ক্ষুধা লাগার পর খাবার গ্রহণ, প্রচণ্ড ঘুম পেলেই তবে নিদ্রাগমন, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা যায়। সর্বোপরি মহান আল্লাহর শানে আদব রক্ষা করা যথা- ইখলাস, হকের অনুসন্ধিৎসা, খুশূ-খুযূ নম্রতা, মাওলা পাকের প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও ভরসা, মাখলুকের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা, অহংকার, রিয়া নিরাময়, মাখলুকের প্রতি নৈরাশ্য সৃষ্টি ইত্যাদি। বস্তুত এটিই খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের খিলওয়াত। এমন ফলপ্রসূ চমৎকার একটি আমল অস্বীকারকারী মূর্খ ও একগুয়েঁ ছাড়া আর কে হতে পারে?

যেহেতু খিলওয়াতের উদ্দেশ্য, মনেপ্রাণে শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও সীমারেখা হেফাযতের মশ্‌ক ও অনুশীলন করা। তাই তরীকতের মাশায়েখগণ খিলওয়াতনাশীঁকে শীতের মৌসুমে জুমুয়ার গোসলের জন্য তাকিদ করেছেন।

খিলওয়াতের মাঝে নিহিত রয়েছে বিরাট হিকমত

নবুয়তের রত্নভূষণ প্রথম থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে সুপ্ত ছিল। তিনি ইরশাদ করেন, আমি সে সময় থেকে নবী উপাধিতে বিভূষিত, যখন আদম আ. রূহ্ ও শরীরের মাঝে। এরপর নবুয়তের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য তাঁকে সঙ্গীহীন সময় কাটাতে হয়েছে। পরন্তু কিছুদিনের জন্য আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে তাঁকে পৃথক হতে হয়েছে। অনুরূপ বেলায়েত প্রত্যেক অলীর মাঝে লুকায়িত থাকে। এরপর তার বিকাশের জন্য চাই নির্জনবাসে নিরলস অনুশীলন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "মানুষ স্বর্ণ-রূপার খনির মত।"

কাজেই, স্বর্ণ-রূপা যেরূপ কঠিন সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে উত্তোলন করতে হয় অনুরূপ মানুষের আনওয়ারে কামালত ও পূর্ণতার জ্যোতি নিরলস পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার পরেই বিকশিত হয়। আর সেকারণই বেশি বেশি যিকির, কুরআন তেলাওয়াত, সর্বক্ষণ অযূ অবস্থায় থাকা, নামায-রোযার পাবন্দি করা, সর্বপ্রকার কু-প্রবৃত্তি পরিহার করা, সাথে সাথে মোরাকাবা, মোশাহাদা এবং দোয়া-মোনাজাতের এহ্তেমাম করাও অত্যন্ত জরুরি। সাধারণত খিলওয়াত ব্যতীত এসব মহৎ গুণবৈশিষ্ট্য অর্জন করা দুস্কর।

সতর্কবাণী

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ

"বস্তুতঃ চোখ অন্ধ নয়, বরং তাদের বক্ষস্থ হৃদয় হলে অন্ধ।" (সূরা হজ্জ : আয়াত-৪৬)

অনন্তর দিলের অন্ধ সে-ই যে আল্লাহর মাহাত্ম্যের নূর অবলোকনে ব্যর্থ। অন্ধত্বের মূল কারণ হচ্ছে নফ্স ও শয়তানের শক্তিশালী কুমন্ত্রণা ও যিক্রের প্রতি উদাসিনতা।

এ প্রসংগে মহান আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

"যে যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার ওপর আমি শয়তান চাপিয়ে দেই।" (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩৬)

এ দৃষ্টিহীনতার চিকিৎসা হচ্ছে, বেশি বেশি মাওলা পাককে ডাকতে থাকা, দেহমনকে পবিত্র ও নির্মল রাখা। যাতে আল্লাহর নির্দেশে মধ্যবর্তী অন্তরায়গুলো ছিন্ন করে অভীষ্ট লক্ষ্য পানে পৌঁছা যায় এবং সাথে মনের একাগ্রতা ও লোকালয় থেকেও নির্জনবাসের মর্যাদা সাধিত হয়।

নবীকুলের শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা ফিক্হ্ শিক্ষা কর ও একাগ্রতা অবলম্বন কর।" এখানে সে অন্যমনস্কতা ও ঔদাসীন্য পরিহারের কথাই বলা হয়েছে।

একপর্যায়ে যখন যিকরুল্লাহর দ্বারা তার অন্তর এ পরিমাণ শক্তিশালী হয় যে, নির্জনবাস অথবা লোকালয় কোথাও তার স্থিরতা, একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে না তখন মানুষের সাথে মেলামেশা করতে আপত্তি নেই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা জনসাধরণের সাথে শারীরিকভাবে মেলামেশা কর, তবে দিল যেন তাদের থেকে আলাদা থাকে।"

পরিশিষ্ট

প্রিয় পাঠক! আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাক যাতে তোমার অন্তরদৃষ্টি খুলে যায়, যার সাহায্যে তুমি আযমতে ইলাহী বা আল্লাহর মাহাত্ম্যের নূর অবলোকন করতে পার। যার কলবের পঙ্কিলতা ও বাতেনের কদার্যতা এ মাকামে উত্তীর্ণ করতে পারেনি যদিও তার বাহ্যিক চোখ উম্মুক্ত কিন্তু সে প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্ধ।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

"যে দুনিয়াতে (হকের মোশাহাদার ব্যাপারে) অন্ধ সে আখেরাতে মাওলা পাকের দীদারের ক্ষেত্রেও অন্ধ থাকবে; বরং তার চেয়েও অধিক পথহারা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭২)

অতএব, কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন হতে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, খিলওয়াত ও নির্জনবাসের আমল স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এরপরও যদি এর গুঢ় রহস্য তোমার বোধগম্য না হয় তবে মনে করবে, তোমাকে এর জন্য সৃষ্ট করা হয়নি। এ অমূল্য নেয়ামত লাভে যাঁরা ধন্য হয়েছেন তাঁদের নিন্দাবাদ, ভর্ৎসনা করা ও কুৎসা রটনা থেকে রসনা সংযত রেখ। সর্বোপরি মনে তাদের প্রতি কোনরূপ হিংসাদ্বেষ রাখবে না।

হতে পারে এক ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভয়ে নিজের যাহেরী ও বাতেনী সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে সুরক্ষার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ তুমি তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে ইন্কার করছ। তার এ মহৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করে চলেছ। বস্তুত আপন দীন সুরক্ষায় সচেষ্ট ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করা মুমিনের পরিচয় হতে পারে না।

অতএব, নিজের প্রতি, নিজের দীনের প্রতি একটু রহম কর। আর অবিচার করো না। কারো দীন সুরক্ষার তৎপরতায় বাধাঁ হয়ো না। তোমার এ আচরণ নিঃসন্দেহে ধর্মহীনতা, আত্মপ্রবঞ্চনা। কুরআন মাজীদে এজাতীয় আচরণকে مَنَّاعٌ لِّلْخَيْرِ (কল্যাণের প্রতিবন্ধক) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এক শ্রেণির মুরীদ রয়েছে খিলওয়াত বা নির্জনবাস ছাড়া যাদের দীন হেফাযত করা সম্ভব নয়। এদেরকে মানুষের ভীড়ে অবস্থান করে দীনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাধ্য করা বড় অবিচার।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৬)

খিলওয়াত ও নির্জনবাস অন্যতম জায়েয ও বৈধ আমল, এ কথা সকলেরই জানা। তাই এ ব্যাপারে আপত্তি তোলার সুযোগ নেই।

কুরআন মাজীদে খিলওয়াত বা নির্জনবাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম আ. এর বাণী এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ

"আমি আমার পালনকর্তার অভিমূখে যাত্রা করলাম।" (সূরা সাফ্ফাত : আয়াত-৯৯)

আলোচ্য আয়াতে এ খিলওয়াত বা নিঃসঙ্গ সময় যাপন উদ্দেশ্য। এ সংকল্প প্রকাশের পরই হযরত ইব্রাহীম আ. স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় নিয়েছেন, সমকালীন লোকজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে,

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ

"ইব্রাহীম যখন নির্জনতা অবলম্বন করল তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (নামে দু'টি সন্তান) দান করলাম।" (সূরা আনয়াম : আয়াত-৪৪)

হযরত মারইয়াম আ. এর ঘটনায় বলা হয়েছে,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

"যখন যাকারিয়া আ. মসজিদের মেহরাবে মারইয়ামের নিকট যেতেন তখন তাঁর নিকট অসময়ে মৌসুমী ফলফ্রুট দেখতে পেতেন।"

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩৭)

এ মেহরাবটিই ছিল হযরত মারইয়াম আ. এর খিলওয়াত যাপন বা নির্জনবাসের স্থান।

হযরত মূসা আ. সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ

"আমি মূসাকে ত্রিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ও সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা।"

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৪২)

এভাবেই চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। মূলত এ হচ্ছে তার স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ সংক্রান্ত আমলের বিবরণ। অনুরূপ হযরত দাউদ আ. ও হযরত সোলায়মান আ.ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান আ. একদিন আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, একদিন ইবাদত-বন্দেগী ও একদিন ওয়ায-নসীহতে মনোনিবেশ করতেন।

এরপরও হযরত সোলায়মান আ. কত দীর্ঘ খিলওয়াত বা নির্জনবাসে অভ্যস্ত ছিলেন তা নিম্নের ঘটনা থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

ঘটনার বিররণ : ঐতিহাসিক বাইতু মোকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে হযরত সোলায়মান আ. এর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসিয়ত করেছিলেন, তোমরা আমার ইন্তেকালের খবর প্রকাশ করবে না, লাঠিতে হেলান দিয়ে আমার লাশটি দাঁড় করিয়ে রাখবে। অনুচরগণ তাই করল। জ্বিন সম্প্রদায় ভাবল, সোলায়মান আ. জীবিত দাঁড়িয়ে যথারীতি নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন। তাই তারা কোনোরূপ গাফেলতি ছাড়াই পূর্ণ উদ্যমে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছিল।

প্রশ্ন হতে পারে, হযরত সোলায়মান আ. এর যদি পূর্ব থেকে দীর্ঘ সময়ব্যাপি ধ্যানমগ্ন থাকার অভ্যাস না থাকত, তাহলে মৃত্যুর পরও জ্বিন সম্প্রদায় তাকে ডাকার সাহস পেল না কেন? বুঝা গেল, তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তার চিরাচরিত আমল নির্জনবাসেই তিনি মগ্ন আছেন।

অবশেষে লাঠি ঘুণ পোকায় খেয়ে ফেলার কারণে তার মৃতদেহ মাটিতে পড়ে গেল। সাথে সাথে দিগ্বিজয়ী সম্রাট হযরত সোলায়মান আ. এর মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

উপরোক্ত ঘটণাপ্রবাহ থেকে প্রমাণিত হলো যে, খিলওয়াত নবী-রাসূলগণের এক মহান সুন্নত ও মোবারক আমল ছিল। কাজেই, যে ব্যক্তি খিলওয়াতের ব্যাপারে অভিযোগ করল সে প্রকারান্তরে নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করল। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ

প্রকাশ থাকে যে, খিলওয়াতের ব্যাপারে আউলিয়ায়ে কেরামের তরীকা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। কেউ খিলওয়াত শুরু করে একটানা এ আমল করতে থাকেন। এমনকি কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত আমল থেকে ফারেগ হন না। একপর্যায়ে কামালিয়ত ও পূর্ণতা সাধিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ তাকে জনসাধারণের হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আদেশ করেন।

কেউ দু'টি খিলওয়াতের মাঝে এক সপ্তাহ বিরতি নেন। খিলওয়াতের শেষোক্ত নিয়মটি শ্রেয় মনে হয়। কারণ, এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোজাহাদার সাথে অত্যধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হযরত জাবের রা. ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত পূর্বোক্ত রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এক সপ্তাহ, দু' সপ্তাহ অথবা এক মাস পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরাগুহায় নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এরপর শহরে প্রত্যাবর্তন করতেন।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার ওপর তোমার নিজেরও হক রয়েছে। রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী কর ঠিক আছে কিন্তু সাথে সাথে কিছু সময় নিদ্রাগমন করে দেহমনকে বিশ্রাম দিও। কারণ, সকল ইবাদত এ দেহের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

অতএব, নফ্স হচ্ছে ঘোড়ার মত, ঘোড়ায় আরোহন করেই তবে গন্তব্যে পৌঁছতে হয়। কাজেই, যদি সর্বদা খিলওয়াত বা নির্জনবাসেই থাকে ও নফ্সের সাথে বেশ কড়াকড়ি করে, তাহলে নফ্স ঘাবড়ে যাবে ও ধৈর্যহারা হয়ে একসময় অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। মাঝখানে শয়তান সুযোগ পেয়ে নানা ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে সালেকের মন একেবারে বিগড়ে দেবে। মহান আল্লাহর খাস রহমত না হলে দ্বিতীয়বার খিলওয়াত বা নির্জনবাস তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

যদি মাঝে মধ্যে একে আরাম ও অবকাশ দেয়া হয় তবে খিলওয়াতের প্রতি তার আগ্রহ ও মনোযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে ফলে রিয়াযতের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিবে। এমনকি বিগত দিনে অযথা যে সময় নষ্ট হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। পরন্তু দিলের ভিতরে অনুভব করবে স্বস্তি ও অনাবিল শান্তি। ফলে মনের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ পরিচলনা করতে হবে না। অন্তরে কু-চিন্তা বাসা বাঁধতে পারবে না। পরিণামে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এত অধিক সফলতা লাভ করবে, যা অন্যরা দীর্ঘ সাধনার পরও অর্জন করতে সক্ষম হয় না।

শর্ত-৫ : মতলব কলবে হাজির রেখে যিতির করা

পঞ্চম শর্ত, পুরোপুরি অর্থ ও মতলব কলবে হাজির রেখে ধ্যান-খেয়াল সহকারে পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগে জলী বা খফী (সরব বা নিরবে) যেভাবে শায়খ শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে যিকির করতে থাকবে। এত অধিক পরিমাণ যিকির করবে, যাতে যিকিরের তাছীর দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় পৌঁছে যায়।

হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুসারে সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা কালিমার যথার্থ মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে,

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"হে মুহাম্মদ! যথার্থরূপে অনুধাবন করুন, আল্লাহ বাদে কেউ মা'বূদ নাই। ইবাদতের উপযুক্ত কেবল তিনিই।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৯)

যিকিরকারী যদি একটানা এক যুগ পর্যন্ত পরিপূর্ণ আযমত ও হুযূরি কলব সহকারে নিয়মিত যিকরে যবানি বা মৌখিক যিকির করতে থাকে তাহলে কলবী যিকির ও আত্মিক প্রশান্তি হাসিল হবে। এ কথাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"জেনে রেখ, আল্লাহর যিকিরের কল্যাণে অন্তরের পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়।" (সূরা রা'দ : আয়াত-২৮)

অনন্তর তিনি মহান আল্লাহ্ ও যিকরুল্লাহর ভিতরে মহাসুখ ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে বিনা প্রয়োজনে জনসাধারণের সাথে খিলওয়াতনাশক মেলামেশায় বিরক্তি ও শঙ্কা বোধ করে। সালেক যখন কলবী যিকিরের ক্ষেত্রে আত্মহারা ও আত্মবিস্মৃতির স্তরে পৌঁছে তখন শায়খ যবানি যিকির বাদ দিয়ে তাকে কলবী যিকিরে তথা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল করে দেন।

একপর্যায়ে সে নিজ সত্তার ব্যাপারেও বোধশূন্য হয়ে মুনকাতিয়ীন তথা সর্ববিচ্ছিন্নদের স্তরে উপনীত হয় ও রাব্বুল আলামীনের মহা সত্তার মাঝে অবস্থান করে। এ স্তরের নাম হচ্ছে, "মাকামে উকূফ দর সিফাত।"

বায়হাকী রহ. বর্ণনা করেন, একদা হযরত বায়েযীদ রহ. এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, মা'রেফতের তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, স্বয়ং আল্লাহর যাতের ধ্যান ও উপস্থিতির জ্ঞান এত কামিল ও পূর্ণাঙ্গ হবে যে, তখন মৌখিক যিকির করতেও নিজের কাছে অস্বস্তিকর লাগবে।

এরপর জাহালত বা মূর্খতার হাকীকত জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহর ইয়াদ থেকে গাফেল ও উদাসীন থাকার নাম জাহালত বা মূর্খতা।

হযরত নাজিমুদ্দীন কুবরা রহ, বলেন, সালেক দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিরতিহীন আল্লাহর যিকির করতে থাকলে এমন এক সময় আসবে যখন মৌখিক যিকির করতে তার কাছে কষ্টকর ও ক্লান্তিদায়ক মনে হয়।

মোটকথা, কারো হুযূরি কলব হাসিল হয়ে গেলে তার যবান থেমে যায় ফলে যিকিরের শব্দ উচ্চারিত হয় না। এ অবস্থায় তার দ্বারা কেবল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত নামায আদায় হয়। বছরের পর বছর পার হতে থাকে কিন্তু তার মুখে অন্য কোন যিকির জারী হয় না।

তবে হ্যাঁ, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাযের মধ্যে যদিও মৌখিক যিকির বিদ্যমান তদুপরি কখনই তা ছাড়তে রাজি হয় না।

এ স্তরের কলব প্রসংগে হাদীসে বলা হয়েছে,

"অন্যদের ফতোয়া ও অভিমত পাপ্তির পরেও তুমি নিজ কলবের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস কর।" (মুসনাদে আহমদ : ৭/৪৬০, কানযুল উম্মাল : ৩/৭৮১)

লোকটি যদিও মৌখিক যিকির করতে অপারগ, তদুপরি সে উচ্চ স্তরের ঈমান ও একীনের অধিকারী।

এ মাকামে উপনীত হওয়ার পর মানবীয় যিকির পূন্যাত্মা ফেরেশ্‌তাগণের যিকিরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে সে যাহেরী যিকির পরিত্যাগ করে মাশুকে হাকীকী তথা চিরন্তন চিরঞ্জীব অবিনশ্বর পালনকর্তা মহান আল্লাহর পাক যাতের মাঝে লীন হয়ে যায়।

সূফিয়ায়ে কেরামের ভাষ্য, "মৌখিক যিকির হচ্ছে, লাকলাকা বা পাখির গুঞ্জরণ আর কলবের যিকির হচ্ছে ওয়াসওয়াসা বা সংশয় লালন।" এর মর্মার্থ এটিই। কারণ, প্রকৃত যিকির তো এ সবের উর্ধ্বে ওঠে মাশুকে হাকীকী ও মহামহিম আল্লাহর মাঝে ফানা ও নিঃশেষিত হওয়া।

স্মর্তব্য, আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় যিকিরের মাধ্যমে বান্দার কলব পবিত্র করেন। কারণ, কলবের প্রিয় ও কাম্য বস্তু হচ্ছে মাহবূবে হাকীকির যাত ও সিফাতের স্মরণ। মানব হৃদয় তার প্রেমাস্পদকে স্মরণ করে শক্তি ও খোরাক পায়। পরন্তু তা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় ও নৈকট্যশীল হয়ে যায়। বস্তুত যে দিলকে মহান আল্লাহ্ আপন নৈকট্য দান করেন, নবুয়ত ও রেসালতের সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, সর্বাগ্রে সে অন্তরে তাঁর পবিত্র যিকির প্রবল করে দেন; যাতে সে যিকিরের নূরে তা পবিত্র ও উজ্জ্বল হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে, সমস্ত যিকিরের মধ্যে কালিমায়ে তাইয়্যেবার যিকির সব চেয়ে উত্তম ও উপকারী। এটি হচ্ছে তাওহীদের মূল। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের দু' স্থানে স্পষ্টভাবে এর আলোচনা করেছেন।

১. সূরা সাফ্‌ফাতে বলেন,

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ

"যখন কাফেরদের বলা হয় যে, আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বূদ নাই, তখন তারা দম্ভ দেখায়।"

(সূরা সাফ্‌ফাত : আয়াত-৩৫)

২ . সূরা মুহম্মদে ইরশাদ হচ্ছে,

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"জেনে রেখ, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার মহান সত্তাই কেবল পালনকর্তা বা পরওয়ারদেগার ও উপাস্য হওয়ার যোগ্য। এ শান ও অবস্থান অন্য কারো নেই।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৯)

যেহেতু তাওহীদ ও একত্ববাদের বিশুদ্ধতাই এ কালিমার উদ্দেশ্য কাজেই সুফল ও উপকারিতার দিক থেকেও এটি সকল যিকিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। এটিই স্বাভাবিক। কারণ, তাওহীদ হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের উৎস।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ সকল যিকিরের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

হযরত সোহায়েল তস্তরী রহ. বলেন, সমস্ত আমলের বিনিময়ে জান্নাত মিলবে; কিন্তু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর প্রতিদান স্বয়ং মাওলা পাকের দীদার বা মহাদর্শন ভিন্ন অন্য কিছুই হতে পারে না।

এটি এমন এক কালিমা যা স্বীকার করে নেয়ার পর একজন কট্টর কাফেরও কুফরের অমানিশা থেকে পরিত্রাণ পায়, তার হৃদয়ে ঈমানের আলো জ্বলে ওঠে। মুসলমান দিনে হাজার বার এ কালিমা পাঠ করলে প্রতিবারে তার দিলের ময়লা কিছু না কিছু অবশ্যই দূরীভূত হবে, তার মর্তবা বুলন্দ হবে। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার ইল্‌ম ও মহাজ্ঞানের সীমা ও পরিসীমা বলতে কিছুই নেই।

যদি কেউ এ কালিমা অসংখ্য বার পড়তে থাকে, তাহলে তার মর্যাদা তদ্রূপ অগণন হাসিল হবে। একারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্দেশ হলো, "জেনে নিন, আল্লাহ্ বাদে অন্য কেহ হাকীকী মা'বূদ বা প্রকৃত উপাস্য নেই।" প্রত্যুত্তরে তিনি তখন বলেছিলেন, "আমি প্রত্যয়ন করলাম ও জেনে নিলাম।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নতুন করে জানার কথা বলার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর উপাস্যতা সম্পর্কে জানা ও বুঝার শেষ নেই। বস্তুত মহান আল্লাহর মা'বূদ হওয়ার ইল্‌ম পূর্ব হতেই তাঁর সাধিত ছিল; বরং পৃথিবীর অপরাপর মানুষের চেয়ে বেশীই ছিল। কারণ, তিনি রঈসুল মুওয়াহ্‌হিদীন তথা একত্ববাদীদের সরদার। যেহেতু এ ইল্‌ম অসীম ও অন্তহীন, তাই এক্ষেত্রে সমধিক উন্নতি অর্জনের জন্য আরো জানার নির্দেশ সম্পূর্ণ যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু সে হুকুম তামিল করতে গিয়ে এ কথা বলা যে, আমি জেনে নিলাম, একশ' ভাগ যুক্তিযুক্ত।

সুতরাং এ কথার অর্থ দাড়াঁচ্ছে, আমি আল্লাহর বিষয়ে ইল্‌মের ক্ষেত্রে অতীতের চেয়ে আরো এক ধাপ এগুলাম। এভাবে যদি অবিরত হুকুম প্রদান ও তার যথার্থ বাস্তবায়ন হতে থাকে, তারপরও এ অন্তহীন ইল্‌ম অফুরান থেকে যাবে।

পক্ষান্তরে হযরত ইব্‌রাহীম আ.কে যখন বলা হল, তুমি মুসলমান হও। তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি তো আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। এমনকি সমগ্র সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়েছি। এখানে এরূপ বাচনভঙ্গীই যথার্থ হয়েছে। যদি বলতেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। (অর্থাৎ, পূর্বাপেক্ষা উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানের) তবে সেটা হত বাস্তব বিরোধী। কারণ, ইসলাম অর্থ বাহ্যিক আনুগত্য আর বাহ্যিক আনুগত্য অসীম বিষয় নয়। তার পরিমণ্ডল ও পরিধি অত্যন্ত সীমিত ও ক্ষুদ্র। এতে ক্রমোন্নতির অবকাশ নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে ইল্‌মে তাওহীদের ব্যাপারে যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আমি অতীতেই এ বিষয় দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলাম তবে উত্তর সঠিক হত না। কারণ, ইল্‌মে তাওহীদের ময়দান অনেক বিস্তৃত, সুবিশাল। এখানে কেউ যতই তরক্কী, উন্নতি লাভ করুক না কেন, এরপরও সামনে থেকে যাবে তার জন্য আরো অসংখ্য মাকাম ও অগণিত স্তর।

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা কালিমায়ে তাইয়্যেবায় বিশ্বাসীদের অবশ্যই চার বস্তু হাসিল হওয়া উচিত। সে বস্তু চতুষ্টয় হচ্ছে-

১. কেবল মুখেই নয়; বরং হৃদয়ের গভীর থেকে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা ও গায়রুল্লাহ্ থেকে তা রহিত করা। অন্যথায় তার কালিমা পাঠ হবে বড় ধরণের মুনাফিকী ও দ্বিমুখিতা।

২. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকিরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিবে। অর্থাৎ, অন্য সব কিছুর অবস্থান ও মূল্য তার নিম্নে হতে হবে। নচেৎ সে হবে বিদয়াতী।

৩. এ যিকিরের স্বাদ উপলব্ধি করতে হবে নতুবা যিকির হবে রিয়া ও লৌকিকতার অনুশীলন।

৪. যিকিরের এহ্‌তেরাম করবে, অন্যথায় ফাসিক বলে পরিগণিত হবে।

কথিত আছে, সোহায়েল তস্তরী রহ. একদা জুমুয়ার দিন মসজিদ থেকে বেরিয়ে শুনতে পেলেন, লোকজন বলাবলি করছে, لَآ اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ পাঠ তো অনেকেই করে, কিন্তু এ কালিমার দাবি হচ্ছে ইখলাস, তা খুব নগণ্য সংখ্যক লোকেই পূরণ করতে পেরেছে।

যাহোক, ওপরে যে চারটি বিষয় আলোচনা করা হল, সেগুলা কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় অর্জন করতে পারেনি। নিঃসন্দেহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলব মোবারক এ কালিমার ইল্‌ম ও তার ভার বহনের উপযুক্ত পাত্র ছিল। এজন্যই তাকে এ কালিমার ইল্‌ম ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত কোনো কাজের হুকুম তাকেই প্রদান করা হয় যে হুকুমটি যথাযথ পালনে সক্ষম।

পক্ষান্তরে অন্যদের কেবল কালিমা পাঠ ও স্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছে; এ কালিমার অন্তর্নিহিত রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের হুকুম দেয়া হয়নি। অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজের হুকুম প্রদান অসাধ্য সাধনে বাধ্য করার নামান্তর। এটা নীতিগত অবৈধ।

বলাবাহুল্য, মহান আল্লাহর যিকির ও স্মরণ প্রত্যেক আল্লাহপ্রেমিকের ওপর সার্বক্ষণিক ফরয ও অবশ্য কর্তব্য। তাফসীরবিশারদগণের দিকপাল হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

এর তাফসীর এভাবে করেছেন, "তারা আল্লাহর যিকির করে দিনে-রাতে, জলে-স্থলে, ঘরে-বাইরে, অভাবে-স্বচ্ছলতায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়-অসুস্থতায়, প্রকাশ্যে-গোপনে সর্ব অবস্থায়।"

কোন কোন আহলে তাসাউফ বলেছেন, প্রতিটি ফরয ইবাদতের জন্য মহান আল্লাহ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবার ওযরের মুহূর্তে ছাড়ও দিয়েছেন। কিন্তু যিকিরের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর জন্য কোন পরিসীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এমনকি যিকির না করার কোন ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, একেবারে পাগল ও উন্মাদ ছাড়া এ আমলটি সকলের পক্ষেই করা সম্ভব।

অতএব, মনে রাখতে হবে, যিকির থেকে কারো অব্যহতি নেই। থাকলে সব চেয়ে বেশি এ সুবিধা ভোগের উপযুক্ত ছিলেন হযরত যাকারিয়া আ.। কারণ, তিনি ছিলেন দুর্বল ও বার্ধক্যজনিত পীড়ায় আক্রান্ত। কথা বলার শক্তিও

তাঁর ছিল না। এতদসত্ত্বেও হুকুম হলো, "আপনার পুত্র সন্তান হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে, আপনি একটানা তিনদিন মানুষের সাথে কেবল ইশারায় কথা বলবেন এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবেন।

যিকিরের ক্ষেত্রে ছাড় প্রাপ্তির দ্বিতীয় হকদার ছিল মুজাহিদ ও ইসলামী যোদ্ধা। অথচ দেখা যাচ্ছে, জিহাদের ময়দানে হাজারও কষ্ট ও পরিশ্রমের পরও ইরশাদ হচ্ছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রণাঙ্গনে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন দৃঢ়পদ থাক এবং অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর। নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আনফাল : আয়াত-৪৫)

এ তো গেল দুনিয়াবী যিন্দেগীর কথা। আখেরাতেও নামায-রোযা সহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী, হুকুম আহ্কাম যা দুনিয়াতে বান্দার জন্য অবশ্য পালনীয়, সবই মা'ফ; কিন্তু যিকির সেখানেও বন্ধ হবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, "জান্নাতবাসী জান্নাতে গিয়ে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ আলহাম্দুলিল্লাহ্, (সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর) যিনি আমাদের সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূরীভূত করে দিয়েছেন।" (সূরা ফাতির : আয়াত-৩৪)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ

"সকল তা'রীফ সে মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের সাথে কৃত সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।"

(সূরা যুমার : আয়াত-৭৪)

তিনি আরো বলেন, "জান্নাতবাসীদের একমাত্র শ্লোগান হবে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ (হে আল্লাহ্! আপনি পূতপবিত্র।) পারস্পরিক সাক্ষাতে তাদের শুভেচ্ছা বিনিময় হবে " سَلَامٌ عَلَيْكَ " বলে। তাদের আরেকটি শ্লোগান হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সকল স্তুতি ও প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য)।

অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা বলবে, "মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। দুনিয়া ও আখেরাতে তিনিই কেবল প্রশংসার যোগ্য।" বুঝা গেল, ইহকাল ও পরকালে বান্দার তাসবীহ্ ও তাহমীদ সমভাবে অব্যাহত থাকবে। তাসবীহ্ ও তাহমীদ মানে যিকির করা। سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর ভিতরে তাওহীদ নিহিত আছে আর তাওহীদের যিকির হচ্ছে সর্বোচ্চ যিকির।

শুন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইবাদতের রিয়া থাকা অসম্ভব নয়। দান-সদকার মধ্যে সন্দেহযুক্ত সংমিশ্রণও বিচিত্র নয়। ঈমানদার খাঁটি ইখলাস ব্যতীত কালিমা তাইয়্যেবা পাঠকারী পারে না। সিদ্ক ও ইখলাস ছাড়া কালিমা পাঠ করে সে মুমিন নয়; বরং সে মোনাফেক। কাফিরদের মত আখেরাতের শাস্তি থেকে কষ্মিনকালেও সে পরিত্রাণ পাবে না।

মোটকথা, কেবল মুমিনের কালিমায়ে তাওহীদই রিয়ামুক্ত। এছাড়া অন্য কোন আমলই রিয়ার আশঙ্কা হতে মুক্ত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দিবেন। এরপর আরশের নিম্নদেশ থেকে জনৈক অদৃশ্য ঘোষক ঘোষণা দিবে, "হে জান্নাত, হে জান্নাতস্থ নেয়ামতরাজি! বল, তোমরা কার জন্য সৃষ্ট?" উত্তরে সকলেই বলবে, "আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠকারীদের প্রতি উদ্গ্রীব। এদের ছাড়া অন্য কাউকে আমরা চাই না। এমনকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী ছাড়া কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দেয়নি, তার প্রতি বিশ্বাসও স্থাপন করেনি আমরা তাদের জন্য হারাম। বস্তুত আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু বিশ্বাস করি না।

সে মুহূর্তে জাহান্নাম ও তদস্থিত সর্ব প্রকারের আযাবের মুখ খুলে যাবে। তারা বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অস্বীকারকারী ব্যতিরেকে আমাদের ভিতরে কেউ দাখিল হতে পারবে না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী ব্যতীত আমরা অন্য কারো প্রতি অনুরাগী নই। অনন্তর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি যারা বিশ্বাস করে না আমরা তাদের

ওপর হারাম ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মিথ্যারোপকারীদের দ্বারাই আমাদের উদরপূর্তি হবে। পরন্তু আমাদের রুদ্র রোষ, ক্ষোভ ও ক্রোধ কেবল তাদের প্রতিই।"

অতঃপর আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও মাগফিরত এ কথা বলতে বলতে উপস্থিত হবে যে, "আমি কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারীদের জন্য, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারীগণের সাহায্যকারী এবং আমার করুণা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহধারীদের জন্য বিশেষিত।

বস্তুত আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ওয়ালাদের প্রেমিক। জান্নাত এদের জন্য হালাল (তারা নির্দ্বিধায় তা উপভোগ করুক)। জান্নাতের যাবতীয় বিনোদন-প্রমোদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অস্বীকারকারীদের ওপর হারাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ওয়ালাদের যাবতীয় গোনাহ মা'ফ। আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের মাঝে কোন আড়াল নেই।"

হযরত ইবনে ওমর রা. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ওয়ালাদের ওপর মৃত্যুর সময় কোন ভয়-ভীতি নেই আর না কবর থেকে পুনরুত্থানের সময় কোন ভয় আছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ওয়ালাগণ ইসরাফীলের শিংগায় ফুঁৎকারের পরে আপন চুলগুচ্ছ হতে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠছে আর বলছে, আল্লাহর শোকর, তিনি আমাদের থেকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূরীভূত করেছেন।

কোন কোন সূফীর অভিমত হচ্ছে, সূরা তাকবীরে কিয়ামত দিবসে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি আলোকশূন্য হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার কারণ তখন কালিমায়ে তাইয়্যেবার নূর উদ্ভাসিত হবে। তারকাসমূহের রূপক জ্যোতিসমূহ যিকিরের প্রকৃত জ্যোতির সামনে ম্লান হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে যিকিরের নূর সরাসরি আল্লাহর নূর তথা রাব্বুল আলামীনের সিফাত ও গুণবৈশিষ্ট্য । চাঁদ-সূরুজের আলো হচ্ছে সৃষ্ট। তাছাড়া এ আলো হচ্ছে রূপক। রূপক জিনিস হাকীকতের মোকাবেলায় বিলীন। এ জন্য সমগ্র বস্তুজগত মহান আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের সামনে অস্তিত্বহীন হওয়াই স্বাভাবিক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

"আল্লাহ্ তায়ালার মহান সত্তা ছাড়া সমগ্র বস্তুজগতই ধ্বংসশীল।" (সূরা কাসাস : আয়াত-৮৮)

বর্ণিত আছে, বান্দা যখন কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে, তখন সে সকল কাফের নারী ও পুরুষের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। কেননা, তাওহীদবাদী কালিমায়ে তাওহীদ পাঠের মাধ্যমে যেন সমস্ত কাফেরের ওপর হামলা চালায়। সে আক্রান্ত শত্রুর সংখ্যানুসারে সওয়াব পায়।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন," আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বূদ নাই। সম্মান করা, অসম্মান করা অথবা পুরস্কৃত বা বঞ্চিত করা, উপকার বা ক্ষতি সাধন করা প্রভৃতি সবই সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

জনৈক আলেমের নিকট লোকজন প্রশ্ন করল, আল্লাহ্ তায়ালা সূরা হজ্জে যে পরিত্যক্ত কূপ ও সুরম্য অট্টালিকার কথা উল্লেখ করেছেন তার মর্মার্থ কী? তদুত্তরে তিনি বললেন, পরিত্যক্ত কূপ দ্বারা তো কাফেরের দিল উদ্দেশ্য। কারণ, এটা কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহশূন্য। এখানে সুরম্য অট্টালিকা বলে মুমিনের দিল বোঝানো হয়েছে। কারণ, তা এ কালিমা দ্বারা সমৃদ্ধ।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমার যিকির কর, আমিও তোমাদের যিকির করব।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫২)

এ কথার ওপর ভিত্তি করেই হযরত সাবেত বুনানী রহ. বলেছেন, "মহান আল্লাহ যখন আমার যিকির করেন বা আমাকে স্মরণ করেন, আমি তখন অনুভব করতে পারি।" লোকেরা প্রশ্ন করল আপনি কীকরে তা অনুভব করেন? তিনি বললেন, আমি যখন আল্লাহ্ তায়ালার যিকির করি তখনই তিনিও আমার যিকির করছেন। কারণ, এটি আল্লাহর ওয়াদা, বান্দা আল্লাহ্র যিকির করলে তিনি বান্দার যিকির করবেন।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

"তোমার রবের নাম লও এবং তার জন্য সর্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়।" (সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-৮)

হযরত আবূ সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কিয়ামত দিবসে কোন্ ইবাদতকারী সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "অত্যধিক যিকিরকারী।"

হযরত আবূ সাঈদ রা. বলেন, "আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী মুজাহিদের চেয়েও কী তার মর্যাদা বেশি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যদি গাজী তরবারি হাতে কাফেরদের মোকাবেলা করে তরবারি ভেঙ্গে ফেলে এবং সে নিজেও গুরুতর আহত হয় তবুও যিকিরকারী উত্তম।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "নিঃসন্দেহে সকাল-সন্ধ্যা যিকির করা আল্লাহর পথে অত্যধিক যুদ্ধ করে তরবারি ভেঙ্গে ফেলা এবং সে সদকা থেকে উত্তম যা কৃপণতার সময় (সুস্থ অবস্থায়) দান করা হয়।" অর্থাৎ, মানুষ সুস্থ অবস্থায় দীর্ঘ জীবনের আশায় সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করে বিধায় এ সময় দানের ফযীলত অনেক বেশি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা দৌড়ে চলো। কারণ, মুফার্‌রিদগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফার্‌রিদ কারা? তদুত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যারা যিকিরের প্রতি অত্যধিক আগ্রহী। কারণ, আল্লাহর যিকির তাদের গোনাহের বোঝা হালকা করে দিয়েছে। তাই কিয়ামত দিবসে তারা হালকা হয়ে আসবে।"

হে প্রিয় পাঠক! শুনে নাও, মহান আল্লাহ যাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, তাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর যিকির সমস্ত আমলের সেরা। অধিকন্তু তার শান ও মর্যাদা সব চেয়ে উঁচু।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড়।" (সূরা আনকাবূত : আয়াত-৪৫)

তাফসীর বিশারদগণের দিকপাল হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে,

এক. তোমরা আল্লাহর যিকির কর, এর চেয়ে আল্লাহ যে তোমাদের যিকির করেন সেটিই বেশি শ্রেয়।

দুই. মহান আল্লাহকে স্মরণ করা সবচেয়ে বড় ইবাদত।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "বান্দা যতক্ষণ আমার যিকির করে, আমার যিকিরে ঠোঁট নাড়তে থাকে, ততক্ষণ আমি তার সঙ্গে থাকি।"

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোৎকৃষ্ট আমল কী? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, "আল্লাহর যিকিরে জিহ্বা তরুতাজা রাখা ও এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ সর্বোত্তম আমল।"

সমস্ত সালেকের মধ্যে যিকিরকারী হচ্ছে তালেব ও প্রকৃত আল্লাহ অন্বেষী। যিকির ছাড়া কেউ কোন দিন আল্লাহ তায়ালার মিলন লাভ করতে পারে না। কারণ, যিকিরের সূচনা যেমন- আল্লাহর পক্ষ থেকে, তদ্রূপ তার পরিসমাপ্তিও আল্লাহর ওপর।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

"তাঁর দিকেই আরোহণ করে পবিত্র কালিমা। অনন্তর নেকআমলকে কালিমায়ে তাইয়্যেবাই উর্ধ্বে নিয়ে যায়।" (সূরা ফাতির : আয়াত-১০)

এছাড়া যিকির, যাকির (যিকিরকারী) কে মাশুক (আল্লাহ্ তায়ালা) এর সাথে মিলিয়ে দেয়; বরং যাকিরকে মাযকূরে হক বানিয়ে দেয়। (অর্থাৎ, তখন আল্লাহ্ তায়ালা খোদ তার যিকির করতে থাকেন।) আল্লাহর ঘোষণা, যদি তোমরা আমার যিকির কর, তাহলে আমিও তোমাদের যিকির করবো। জেনে রেখ, সকল ইবাদত দ্বারা ইল্লাল্লাহ্র যিকিরই একমাত্র কাম্য। কুরআন মাজীদের দিকে খেয়াল করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"আমার স্মরণে তোমরা নামায কায়েম কর।" (সূরা তাহা : আয়াত-১৪)

যিকিরের লক্ষ্য হচ্ছে, মহান আল্লাহর প্রেম ও পরিচয় লাভ করে ফানা এবং বাকার মাধ্যমে মাযকূর (আল্লাহ্) পর্যন্ত পৌঁছা। এরপর ঈমান ও একত্ববাদের বিশ্বাসে পূর্ণতা অর্জন করা।

মহান আল্লাহ সকলকে এ নেয়ামত নসীব করুন।

যিকিরের পদ্ধতি

যিকিরের তরীকা কী ও তার বৈশিষ্ট্যই বা কী হওয়া উচিত সে প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন,

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

"তোমরা যেভাবে ভালোবাসা ও গর্ব সহকারে আপন বাপ-দাদাদের স্মরণ কর, তেমনি বরং তার চেয়েও বেশি আল্লাহর যিকির কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২০০)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ

"এবং তমি যিকির কর তোমার পালনকর্তার ভয় ও মিনতি সহকারে, চুপিসারে অনুচ্চ স্বরে, মধ্যম আওয়াজে, সকালে-সন্ধ্যায়। কখনো গাফেল বা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সকাল-বিকাল আল্লাহর যিকির দ্বারা জিহ্বা সতেজ রাখ। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তুমি এভাবে কাটাও, যেন তোমার কোন গোনাহ্ই অবশিষ্ট না থাকে।" বস্তুত সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এ যিকির নিয়মিত করতে থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"হে ঈমানদারগণ তাকওয়ার পথ ধর, আল্লাহকে ভয় কর। কওলে সাদীদ অবলম্বন কর।"

(সূরা আহযাব : আয়াত-৭০)

কওলে সাদীদ হচ্ছে কালিমায়ে তাইয়্যেবা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বল সফল হবে।

অতএব, মনোযোগ সহকারে শুন, যিকিরের বহু শর্ত ও আদব রয়েছে যিকিরের বরকত ও তা'ছীর দ্রুত পেতে হলে সেসব শর্তের প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরি।

যিকিরের শর্তাবলি

যিকিরকারীর শরীর ও কাপড় পাক হওয়া, জায়গা পাক হওয়া, অযূ করা, কিবলামুখী হওয়া, হাঁটু গেড়ে বসা। উভয় হাত হাঁটুর কাছাকাছি উরুর ওপর রাখা। বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে ডান হাতের পিঠ ধরবে ও বাঁ হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পিঠ ধরবে। স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ আমল বর্ণিত আছে।

এরপর চোখ বন্ধ করে আস্তে বা মধ্যম আওয়াজে যেভাবে শায়খ তালকীন করেছেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর যিকির করবে। এ সময় আল্লাহর দিকে পুরোপুরি মনোযোগী থাকবে। সম্পূর্ণ খেয়াল দিলের প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। পূর্ণ শক্তি দিয়ে দিলের যাবতীয় সংশয়, উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা দূরীভূত করবে। لَآ اِلٰهَ কে দিল থেকে বের করে দিয়ে তথায় اِلَّا اللهُ কে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে স্থাপন করবে। সর্বোপরি আল্লাহর পবিত্র যাতের ইছবাত করবে। কলবের আকর্ষণ সর্বতোভাবে আল্লাহর দিকে রাখবে।

ফলশ্রুতিতে কালিমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। হুযূরি কলব, মোরাকাবা ও পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ্ সহ মুখে সবসময় এ যিকির করতে থাকবে। সর্বোপরি যিকিরের আদব হচ্ছে, সর্ব অবস্থায় যিকিরের মধ্যে অকুণ্ঠ নিমজ্জিত থাকা, একটি মুহূর্তও যিকিরের শব্দ থেকে মুখ এবং যিকিরের মর্মবোধ থেকে অন্তর শূন্য না থাকা। এতে একমাত্র যিকিরই কলবের মূল উপাদানে পরিণত হয়, মোশাহাদার পথের সকল পর্দা বিদূরীত হয়। অনন্তর যিকিরকারী ও তার যিকির একত্রে মাযকূরে হাকীকির মাঝে ফানা ও বিলীন হতে পারে। কারণ, যিকির হচ্ছে, মুসলমানের অন্যতম দায়েমী ফরয ও সার্বক্ষণিক অবশ্য পালনীয় আমল।

যিকিরের উপকারিতা ও সুফল

মহান আল্লাহ বলেন,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"মহান আল্লাহ যার অন্তকরণ ইসলামের আনুগত্যের জন্য উদ্ভাসিত করে দেন সে কখনই পঙ্কিল হৃদয় ভাগ্যহতদের মত হতে পারে না; বরং সে আপন পালনকর্তার পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই এক নূর ও জ্যোতি লাভ করেছে। ধ্বংস সে সকল লোকদের জন্য যাদের অন্তকরণ যিকরুল্লাহ্ বিরাজিত না থাকার দরুণ কঠোর ও পঙ্কিল হয়ে গেছে।" (সূরা যুমার : আয়াত-২২)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ কঠোরতা ও রূঢ়তাকে অন্তরের গুণবৈশিষ্ট্য বা বিশেষন বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ কঠোরতা হচ্ছে পাথরের স্বভাব।

আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً

"মৃতকে পুনর্জীবন প্রদান প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করার পরে পুনরায় তোমাদের অন্তর পাথরের মত; বরং তদাপেক্ষা অধিক কঠোর হয়ে গেছে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৬৪)

বলাবাহুল্য, যেভাবে কোন শক্ত পাথরকে কঠিন আঘাত ছাড়া ভাঙ্গা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে ও সজোরে যিকির ছাড়াও গাফেলতির কঠোর কদার্যতা অন্তর থেকে অপসারিত হয় না। এমনকি শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ বা যিকরুল্লাহ্ থেকে বিমুখ হয় তার ওপর আমি শয়তান নিযুক্ত করে দেই। ফলে সে তার সঙ্গী হয়ে যায়।" (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩৬)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। এরপর আল্লাহর যিকির করা হলে শয়তান পলায়ন করে। পক্ষান্তরে কখনো যিকির থেকে উদাসীন ও গাফেল হলে শয়তান তার অন্তর মুখের মধ্য দিয়ে চেপে ধরে। এরপর নানা ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণায় দিতে থাকে।"

যিকিরের আরেকটি শর্ত হচ্ছে, এ অমূল্য সম্পদ কোনো সাহেবে তালকীন আহলে যিকির শায়খ থেকে হাসিল করতে হবে। যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাসিল করেছিলেন।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. বর্ণনা করেন, যা হযরত ওবাদা ইবনে সামেত রা. সত্যায়ন করেছেন, "একদা আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের এখানে বাইরের কেউ (ইহুদী বা খিস্টান) নেই তো? আমরা নাবাচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, দরজা বন্ধ কর। এরপর দরজা বন্ধ করা হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা সকলে হাত উত্তোলন করে বল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। আমরা তাই করলাম।

কিছুক্ষণ পর তিনি নিজ হস্ত মোবারক রেখে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার শোকর, আপনি এ কালিমা সহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, এ কালিমা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন সর্বোপরি এ কালিমার স্বীকৃতির ওপর জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনন্তর আপনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, মহান আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (হাকেম : ২/১৫৫, নিসাপুরী : ২/৩১৫)

এভাবেই পর্যায়ক্রমে সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীনকে, তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীনকে এবং এক শায়খ অপর শায়খকে এ কালিমার তালকীন দিয়ে এসেছেন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا

"আমি তাদের (সাহাবায়ে কেরামের) ওপর কালিমায়ে তাকওয়া অর্থাৎ, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে অপরিহার্য করেছি। বস্তুত তারাই এ কালিমার সমধিক যোগ্য ছিলেন।" (সূরা ফাত্হ : আয়াত-২৬)

একারণেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর তালকীন পেয়েছিলেন। বস্তুত "তাঁরাই এ কালিমার অধিক যোগ্য ছিলেন" এর অর্থ তাদের অভ্যন্তরে এ কালিমার সমূহ নূর ও জ্যোতি কার্যকর প্রভাব ফেলেছিল।

কাজেই, যখন মাওলা পাকের পথ অন্বেষী তরীকতের অভিজ্ঞ, সুদক্ষ প্রশিক্ষক শায়খের হাতে বাইয়াত ও তালকীনের নিমিত্ত হাজির হয়, তখন শায়খের কাজ হচ্ছে তাকে যিকিরের তালকীন প্রদান করবেন। খিলওয়াতনাশীঁ ও নির্জনবাসে অভ্যস্ত করবেন, নিয়মিত যিকির করাবেন, যাতে তার অন্তরে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়, খিলওয়াত বা নির্জনবাসের স্বাদ উপভোগ করতে শুরু করে সর্বোপরি মাখলুক বিমুখতা সৃষ্টি হয়। বস্তুত এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট শায়খ তার দ্বারা চিল্লাকাশি করাবেন।

সূফিয়ায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, একদা হযরত আলী রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সহজতর পথটি বাতলে দিন। এতদুত্তরে তিনি বললেন, সব সময় নির্জনে আল্লাহর যিকির করাকে নিজের ওপর অবধারিত করে নাও।"

হযরত আলী রা. যিকিরের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, চোখ বন্ধ কর এবং আমি যা বলি শুন। এরপর তিনি তিনবার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করছিলেন ও হযরত আলী রা. শুনছিলেন। অতঃপর হযরত আলী রা. তিনবার এ কালিমা পাঠ করলেন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনছিলেন।

এভাবে পর্যায়ক্রমে হযরত আলী রা. হাসান বসরী রহ.কে, হযরত হাসান বসরী রহ. হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ রহ. ও হযরত হাবীবে আজমী রহ.কে এ কালিমার তালকীন করেন।

কালিমা তালকীনের ধারাবাহিকতা এখান থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সিলসিলা, তরীকা ও তার শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য, সকল সিলসিলার ক্রমধারার তালিকা সুরক্ষিত ও প্রসিদ্ধ আছে। এখানে স্বতন্ত্রভাবে তার উল্লেখ প্রয়োজন নেই।

রেসালায়ে মক্কিয়ার গ্রন্থকার ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী রহ. এর

শাজরানামা

রেসালায়ে মক্কিয়ার লেখক এপর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে নিজের শাজারানামা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

"সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নিয়মে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যেবার তালকীন করেছেন হযরত আলী রা.কে, হযরত আলী রা. তালকীন করেছেন হাসান বসরী রহ. কে। হযরত হাসান বসরী রহ. হাবীবে আজমী রহ.কে। তিনি হযরত দাউদ তায়ী রহ.কে, তিনি হযরত মারূফ কারখী রহ.কে, তিনি হযরত সিররী সাক্তীকে, তিনি হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. কে, তিনি আবূ আলী রূদবারী রহ. কে, তিনি হযরত আবূ আলী কাতেব রহ. কে, তিনি আবূ ওসমান মাগরিবী রহ. কে, তিনি আবূ কাসেম গাবগানী রহ.কে, তিনি আবূ বকর নাস্সাজ রহ.কে, তিনি হযরত আহমাদ গাযালী রহ. কে, তিনি আবূ নজীব সুহরাওয়ার্দী রহ.কে, তিনি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছার রহ.কে, তিনি নাজিমুদ্দীন কুবরা রহ. কে, তিনি মাজদুদ্দীন বাগদাদী রহ.কে, তিনি আলী লালাহ্কু রহ.কে, তিনি আহমাদ রব্বানীকে, তিনি আবদুর রহমান কারখী রহ.কে, তিনি বোরহানুদ্দীন সমরকন্দী রহ.কে, তিনি অধম (সংকলক)কে।"

বক্ষমান গ্রন্থের অনূবাদক মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী রহ. আপন শাজরানামা এর চেয়ে সংক্ষিপ্তকারে কাব্যের মাধ্যমে এভাবে পেশ করেছেন–

بہر امداد و بنور و حضرت عبد الرحیم — عبد باری عبد ہادی عز دین مکّی ولی

ہم محمدی محب اللہ شاہِ بو سعید — ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی

ہم محمد عارف و عبد حق و شیخ جلال — شمس الدین ترک و علاؤالدین فرید جو دہنی

قطب دین و ہم معین الدین و عثمان و شریف — ہم بمودود وابو یوسف محمد احمدی

بو سحاق و ہم بمشاد و ہبیرہ نامور — ہم حذیفہ وابن ادہم ہم فضیل مرشدی

সতর্কবাণী

সর্বাগ্রে বিগত জীবনের যাবতীয় পাপাচার থেকে তওবা মুরীদের অন্যতম কর্তব্য। এরপর নিয়মিত যিকির-আয্কার করবে। সিদ্ক (সততা), ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও তাকওয়া (আল্লাহভীতি)কে শক্তভাবে ধারণ করবে। আল্লাহ্র যিকির ব্যতিরেকে ওষ্ঠ সঞ্চালন করবে না। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহর যিকির নিজের অভ্যাসে পরিণত করবে। সর্বোপরি আপন আহলুল্লাহ শায়খের হাতে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে একেবারে এখতিয়ারহীন থাকবে। যেরূপ মৃতদেহ গোসলদাতার হাতে এখতিয়ারহীন থাকে। সাহাবায়ে কেরাম খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে থাকতেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যদি কারো পৃথিবীর বুকে চলমান মৃতদেহ দেখতে মনে চায় সে যেন আবূ বকরকে দেখে। তিনি আরো বলেছেন, 'তালহা সে সকল ভাগ্যবানের অন্যতম যারা আপন শাহাদাতের মানত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছ অর্থাৎ, শহীদ হয়েছেন।"

অথচ হযরত তালহা রা. তখনো দুনিয়ার বুকে জীবিত। বুঝা গেল, এখানে শাহাদাত মানে মৃত্যু বরণ করা নয়; বরং পূর্ণরূপে ফানা হওয়া ও ১০০% ভাগ আনুগত্য করাই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তিনি মহান আল্লাহ ও রাসূলের হাতে মৃতদেহের মত সম্পূর্ণ এখতিয়ারশূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা বলতে তাঁর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

তাফসীরে কাশ্‌শাফে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল শহীদ দেখতে চাইলে তালহাকে দেখে নাও।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

"তোমরা মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু বরণ কর।" (অর্থাৎ, দুনিয়ার যিন্দেগীতে আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুমের সামনে স্বীয় ইচ্ছা ও চাহিদাকে জলাঞ্জলী দাও।)

অনন্তর মুরীদ যখন আপন সত্তা মিটিয়ে একেবারে মৃতবৎ হয়ে আল্লাহর যিকির করবে, তার সে যিকির হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, নিজের পক্ষ থেকে নয়। পরন্তু যাকির আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অবিনশ্বরতা লাভ করে। কাজেই, যখন নশ্বর নফ্‌সের মৃত্যু ঘটল ও যিকরুল্লাহর মাঝে তার দখল রইল না, তখন যিকির অবিনশ্বরতা লাভ করবে। অর্থাৎ, মৃত্যুর পরেও সে যিকির অব্যাহত থাকবে। কারণ, মৃত্যুর প্রভাব মাটির দেহের ওপর, যিকিরের ওপর নয়। যিকিরের ওপর তার ধ্বংসশীল মন ও ইচ্ছার দখল পূর্বেই ওঠে গেছে।

সারকথা

গাফলেতি ও উদাসিনতা ঝেড়ে ওঠার পর সালেকের কর্তব্য হচ্ছে, নিজকে এমন শায়খের হাতে সোপর্দ করবে যিনি আরেফবিল্লাহ্, আমানতদার, দীনদার ও পরহিতৈষী, তরীকতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে ওয়াকিফহাল। কোনক্রমেই মুরীদ তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবে না। যাতে শায়খ তাকে রুজূ ইলাল্লাহ্ এর নিয়ম-পদ্ধতি এবং শরীয়ত ও তরীকতের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে পারেন। শায়খ ও পীরের কাজই হচ্ছে দীন ও শরীয়তকে মুরীদের অন্তরে সুদৃঢ় করা।

মনে রাখতে হবে, মুরীদের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-আশাকের পরিশীলন সর্বাগ্রে করতে হবে। এগুলো পরিমার্জিত না হলে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়।

হাদীসে শরীফে বর্ণিত আছে,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

"ঈমানের পরে হালাল রুজি উপার্জন করা ফরয।" (বায়হাকী : ৬/১২৮, কানযুল উম্মাল : ২৭/৪৩৯)

সূফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, হালাল রুজি উপার্জন/অন্বেষণ এমনিতেই সকল মুসলমানের ওপর ফরয। সুতরাং সুলূক ও তাযকিয়া'র পথের অভিযাত্রীদের জন্য এ ফরযটি আরো বেশি গুরুত্বের দাবিদার।

এ তিন বিষয়ের ইসলাহ্ বা সংশোধনের পর শরীয়তের যেসব ফরয ছুটে গেছে, যেমন- নামায, রোযা প্রভৃতি কাযা করবে।

এরপর যেসব হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক নষ্ট করা হয়েছে, সেগুলো যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দিবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "দিরহামের এক ষষ্ঠাংশ পরিমাণ হারাম (যা মানুষের কাছ থেকে অবৈধভাবে গ্রহণ করা হয়েছে) তার যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দেয়া হলে আল্লাহর নিকট সত্তরটি কবুল হজ্জের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে।"

কাউকে মারপিট করা হলে তার বিনিময় দিবে, কারো গীবত, চোগলখুরি, গালমন্দ করে থাকলে তার প্রতিকার করতে হবে। যদি ভিকটিম জীবিত থাকে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অন্যথায় তার জন্য দোয়া-ইস্তেগফার করে ঈসালে সওয়াব করতে হবে। এরপর নফ্‌সকে বড় দুশমন ভাবতে হবে এবং রিয়াযত ও মোজাহাদা দ্বারা তাকে শাসন করবে, আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। কারণ, নফ্‌সের দু'টি চরিত্র।

১. সে মনোবৃত্তির মাঝে পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকবে।

২. সে ইবাদত-বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

অতএব, মোজাহাদা অর্থাৎ, তার প্রিয় অভ্যাসগুলো ত্যাগ করা, তার চাহিদার বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে তাকে শক্ত হাতে দমন করা। বেশি বেশি যিকির-আযকার, সবসময় নফল রোযা, নফল ইবাদত ও সার্বক্ষণিক নফ্‌সের বিরোধিতা করে তার রুচিবোধ ও স্বাদকে তিক্ত করে তুলবে তবেই তাকে সর্বপ্রকার মন্দ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে পারবে। সবসময় নিদ্রার পরিবর্তে নিদ্রাহীনতা, পরিতৃপ্তির পরিবর্তে ক্ষুধা, সুখের স্থলে দুঃখ ও প্রাপ্তির স্থলে বঞ্চনা তার

সামনে পেশ করতে থাকবে। যাতে সে তওবার পথে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ তার যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তওবাকারী যুবক আল্লাহর অতি প্রিয়।"

কারণ, বার্ধক্যে নফ্স স্বাভাবিক কারণেই দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্তর কামনা-বাসনার স্বাদ উপভোগের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কাজেই, যৌবন কালেই নফ্সের কামনবাসনার মোকাবেলা করা উত্তম। জেনে রাখা উচিত, যিকির দু' প্রকার; তাকলীদি ও তাহকীকি। তাকলীদি যিকির ও তাহকীকি যিকিরের মাঝে বহু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ মানুষ আপন পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের মুখ থেকে শুনে যে যিকির শিখে ও মুখস্থ করে, সেটিই তাকলীদি যিকির। এ যিকির যদিও শয়তানকে প্রতিহত ও ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে যাকের তথা যিকিরকারীকে আল্লাহর নৈকট্য ও বেলায়াতের কাঙ্খিত সুচ্চ মাকামে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে না, অথচ এটি যিক্‌রে তাহকীকির মাধ্যমে সাধন করা সম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ : বাজার থেকে কেনা সাধারণ তীর-ধনুক দ্বারা যদিও শত্রু নিধন ও প্রতিহত করা যায়, কিন্তু সে তীর-ধনুক ব্যবহার করে কেউ সামরিক বাহিনীর সদস্য হতে পারে না; বরং সারিক বাহিনীর সদস্য হলে অবশ্যই তাকে সরকার অনুমোদিত তীর-ধনুক ও সরকারি অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে।

অনুরূপ আলোচ্য যিকির যা তালকীনের অনুমতিপ্রাপ্ত ও তছররুফের ক্ষমতা সম্পন্ন শায়খের সান্নিধ্যে অবস্থান করে হাসিল করতে হয় ও যে যিকিরের ধারাবাহিক যোগসূত্র ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য, সেটিই হচ্ছে তাহকীকি যিকির। অনন্তর এ যিকিরই যোগ্য মুরীদের অন্তরে তা'ছীর করে তার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে বিস্ময়কর হালাত সৃষ্টি করে।

ফলে এ যিকিরের চারাগাছ যখন তালকীনের নিড়ানির মাধ্যমে প্রকৃত মুরীদের কলবে ধরে যায় অতঃপর দৃঢ়তা ও শক্তি অর্জন করে, তখন আমলে সালেহ্ ও ইত্তেবায়ে সুন্নতের পানি দ্বারা তা প্রতিপালিত হতে থাকে, এরপর তার ওপর বেলায়েতের সূর্যের রোদ পড়ে। তখন মহান আল্লাহর হুকুমে তাতে মোকাশাফা ও মোশাহাদার ফল ধরে, ইখলাস ও ইরাদার সততা অনুপাতে তাতে আল্লাহর মহব্বত ও মা'রেফতের সুফল পাওয়া যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্। মনে রাখতে হবে মা'রেফত ও আল্লাহপ্রেম পর্যন্ত পৌঁছতে শায়খের তালকীনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

বস্তুত এ কারণেই হাদীস শরীফে মুমিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে ফুল রেনুর মিলন ছাড়া খর্জুর বৃক্ষে ফল ধরে না, তদ্রূপ মুরীদ যতক্ষণ পর্যন্ত কামেল শায়খের তালকীন গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অস্তিত্বের বৃক্ষেও মা'রেফতের ফল ধরবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একটি বৃক্ষের পাতা কোন ঋতুতেই ঝরে পড়ে না, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুসলান। বলতে পারবে গাছটির নাম কী? সাহাবায়ে কেরাম তদানীন্তন মরুর দেশের নানা গাছ-গাছালি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছিলো, এটি খেজুর গাছই হবে। কিন্তু বড়দের উপস্থিতিতে মুখ খুলতে সাহস পেলাম না। অবশেষে সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কী গাছ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন, খেজুর গাছ। যে পর্যন্ত রেণু মিলন না ঘটে খেজুর গাছে ফল ধরে না।

তালকীনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, শায়খের হুকুমে একটানা তিনদিন রোযা রাখা, অধিকন্তু সে তিনদিন অযূ সহকারে সর্বক্ষণ যিকিরে মগ্ন থাকা। খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, নিদ্রা, মানুষের সাথে ওঠা-বসা কম করবে। অতঃপর গাফেলতি থেকে হুযূর (চেতনা) ও মোরাকাবার দিকে অগ্রসর হওয়ার নিয়তে গোসল করবে।

হাদীস শরীফে এ গোসলের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণের নিয়তে গোসল কর। যাহোক সে গোসল করল। তারপর তাকে কালেমায়ে তাওহীদ তালকীন করলেন।" গোসল করার সময় বলবে, হে মালিক! আপনার দেয়া খাস তাওফিকের কল্যাণে আমার শরীর পাক করতে পেরেছি। আমার সামর্থ কেবল এটুকুই। বাদবাকী কাজ আপনার হাতে। মেহেরবানি করে আমার কলবকে পবিত্র করে মা'রেফতের নূর দ্বারা পূর্ণ করে দিন। নিঃসন্দেহে আপনি মুকাল্লিবুল কুলূব। সবকিছু আপনার অপার কুদরতের অধীন।

গোসলের পর শায়খের সম্মুখে নামাযের সুরতে বসে হুযূরি কলবের সাথে চুপচাপ শায়খের সাথে মোরাকাবা করবে। এরপর শায়খ আওয়াজ টেনে বলবেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মুরীদ শায়খের মুখ হতে আপন কলবে গ্রহণ করবে। পরন্তু কালিমার অর্থের দিকে খেয়াল করবে, لَآ اِلٰهَ বলে আমি অন্তরের অন্যান্য খেয়াল প্রত্যাখ্যান করছি এবং اِلَّا اللّٰهُ বলে মওজুদে হাকীকি ও প্রকৃত অস্তিত্ববান মহান আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য, উদ্দেশ্য, কাম্য, মহান সত্তা দ্বিতীয় কেউ নেই।

এরপর মুরীদ উচ্চস্বরে আওয়াজ টেনে অর্থের প্রতি খেয়াল করে এ কালেমা পাঠ করবে। এভাবে শায়খ দু'/তিনবার বলবেন ও মুরীদ তাঁর অনুসরণ করবে। শেষে শায়খ হাত তুলে দোয়া করবেন- 'রাব্বুল আলামীন! এ মুরীদের কালিমা আপনি কবুল করুন। নবী-রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামের ওপর আপনি যেভাবে কল্যাণের দ্বারসমূহ অবারিত করেছিলেন, এ মুরীদের জন্যও তাই করুন।

এরপর মুরীদ নিয়মিত কালিমার অযীফা চালু রাখবে। তাহলে আল্লাহর ফজলে একদিন না একদিন সে মনযিলে মাকসুদে পৌঁছবেই।

শায়খ নাজিমুদ্দীন কুবরা রহ. বলেন, ধ্যানশূন্য মৌখিক যিকিরও বড় প্রভাব বিস্তারের শক্তি রাখে। তবে যাকিরের অস্তিত্বের গাঢ় আবরণ যেহেতু এখনো বিদ্যমান রয়েছে, যার কারণে তা'ছীর সুপ্ত থাকে, প্রকাশ পায় না। বস্তুত নিদ্রাবস্থায় অথবা যিকিরের আধিক্যের দরুণ সালেকের অস্তিত্বে পর্দার গাঢ়ত্ব হ্রাস পায় ও তারল্যের সৃষ্টি হয়, সে অস্তিত্বের আবরণ মুক্ত হয়ে যায়। তখন যিকিরের প্রাবল্য প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, ওপরের দিকে অথবা সামনে কিংবা পিছনে একটি জ্যোতি সৃষ্টি হয়ে সালেককে আপন অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয়। মুরীদ আতঙ্কিত হয়ে কালিমা পাঠ করে। এতে আশঙ্কা আরো প্রবল হয়। অবশেষে গত্যন্তর না দেখে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে ও আত্মসমর্পণ করে খাঁটি মুমিন হয়ে যায়। অর্থাৎ, নিজেকে মহান খালেকের হাতে সোপর্দ করে রেযা ও তাসলীমের গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়।

সারকথা, যিকিরের পরিমাণ অনুপাতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কাজেই, যিকির যত বেশি হবে, আছর ও ক্রিয়া তত বেশি ও দ্রুত হবে।

মনে রাখতে হবে, হুযূরি কলব বা হৃদয়ের চৈতন্য ছাড়া কেবল হরফের উচ্চারণকে যিক্‌রে লিসানি বলা হয়। হুযূর ও তাওয়াজ্জুহকে যিক্‌রে কলবী বলে। এরপর হুযূর ও উপস্থিতিবোধ থেকে আরো উর্ধ্বে ওঠে মাযকূর অর্থাৎ, আল্লাহর মহা সত্তার মাঝে অবগাহন হচ্ছে সির্‌রী যিকির। কাজেই যিকিরের সময় যদি যাকেরের মনে যিকির করছে, এ উপলব্ধি থাকে তবে বুঝতে হবে, সে কাঙ্খিত মাকাম থেকে এক স্তর নিম্নে অবস্থান করছে।

যদি হুযূরি কলব না থাকে তবে সে দু' স্তর নিম্নে অবস্থান করছে। বস্তুত হুযূরশূন্য যিকিরকে লাকলাকা বা পাখির গুঞ্জরণ বলা হয়েছে। যিকিরের সার নির্যাস হচ্ছে, মাযকূর আল্লাহর ভিতরে মোস্তাগরাক ও ধ্যান নিমজ্জিত হওয়া। যিকির করা অবস্থায় যিকিরের অনুভূতিকেও হিজাব বা অন্তরায় মনে করা হয়। বস্তুত এপর্যায়ের নিমগ্নতা ও অবগাহনকে ফানা বলা হয়। ফানা অর্থ- নিজের নফ্‌স, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বাতেনী ইন্দ্রিয় ও সকল বাহ্যিক বিষয় বিস্মৃত হয়ে যাওয়া। এরপর সবগুলো মহান আল্লাহর মাঝে বিলীন করে দেয়া।

অতঃপর হুশ ফিরার সাথে সাথে সে যেন মহান সত্তা ও পবিত্র যাতকেই নিজের ভিতরে অনুভব করে। পক্ষান্তরে এ সময় যদি এতটুকু চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে যে, আমি আপাদমস্তক ফানা হয়ে গেছি, তবে তাও এক ধরণের কদার্যতা; বরং পূর্ণতা তো তখনই পরিগণ্য হবে যখন এ লীনতার উপলব্ধিও লোপ পাবে। কারণ, ফানা ও লীনতা হতে বিলীন হওয়াই ফানার সর্বশেষ স্তর। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও সকল আল্লাহ অন্বেষীকে এ মর্তবা দান করুন। আমীন!

উল্লেখ্য, কালিমা তাইয়্যেবা পাঠকারীর জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরি। অন্যথায় সে কালিমার কল্যাণ পুরোপুরি লাভ করতে পারবে না। বিষয়গুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

১. খুব ভালো করে অনুধাবন করতে হবে যে, আমি কী বলছি, কোন্ জিনিসের অস্তিত্বহীনতা ঘোষণা করছি ও কার অস্তিত্ব স্বীকার করছি। নফী ও প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করবে সেসব বস্তুর, যেগুলো বড় হওয়ার দাবীদার। যেমন- শয়তান, নফ্‌স ও নফ্‌সের কামনা-বাসনা।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ

"দেখেছ কি ঐ ব্যক্তিকে যে নিজ খাহেশাত ও মনোবৃত্তিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে।"

(সূরা জাশিয়া : আয়াত-২৩)

২. যিকির চলাকালীন দিল আল্লাহর মহত্ব ও শ্রদ্ধাবোধে সমৃদ্ধ রাখবে। পরন্তু মনে করবে, তিনি ছাড়া কোন প্রিয়জন ও কাঙ্খিত সত্তা নেই।

৩. নির্মল অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে মাওলা পাকের মিলন ও দর্শনে অধীর থাকবে। মনে রাখতে হবে, মাওলা পাকের খাঁটি প্রেমিক না হলে অথবা তাঁর দীদারের অদম্য আকাঙ্খা না থাকলে কষ্মিনকালেও তা হাসিল করা সম্ভব নয়। কেউ যদি মনে করে যে, মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, অমুক আমল করলে সফল হওয়া যায়। কাজেই, আমিও চেষ্টা করে দেখি, সফল হওয়া যায় কী-না? এমন ব্যক্তিও সফলতা লাভ করতে পারবে না। কারণ, তার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা। তাই তার এ আমলের পিছনে ইখলাস বা খাঁটি ভালোবাসা ক্রিয়াশীল নয়।

৪. অত্যন্ত আদব ও শ্রদ্ধার সাথে কালিমায়ে তাওহীদের হরফগুলো উচ্চারণ করবে। অন্যথায় লাভের স্থলে পাঠকের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। যেমন- হতে পারে, সে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি পাষাণ, পথভ্রষ্ট ও মাশায়েখে কেরামের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরব ও মোশাহাদা তথা নৈকট্য ও দর্শনের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। স্বীয় আমল-আখলাকের গুণে আলা ইল্লিয়্যীন তথা মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হলেও বেয়াদবির দরুণ আসফালুস্ সাফেলীন বা পতনের সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হবে।

৫. পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় ও সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য কালের বিভিন্ন অংশে রয়েছে সুগন্ধির ঝাপটা ও রহমতি বায়ূর ক্ষিপ্র প্রবাহ। তোমরা তার মুখোমুখি দাঁড়াও। মূলত এটি হচ্ছে রহমতে এলাহীর সুরভী। বস্তুত রহমতে এলাহীর সুরভীর সামনে আগমনই নিশ্চিত মোরাকাবা। সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে, লামহা, লুমআ', ওজ্দ ও অজূদ।

এ পাঁচটি গুণবৈশিষ্ট্য হাসিল হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে, যিকিরকারী নিজের ভিতরে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সুস্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করবে। অনন্তর এ পঞ্চগুণ ব্যতীত কখনই এ স্বাদের কল্পনা করা যায় না।

এছাড়া যিকিরের আরেকটি শর্ত হচ্ছে, যাকির সবসময় পাক-পবিত্র থাকবে। এক মুহূর্তও বে-অযূ থাকা তার জন্য বড় অসহনীয় মনে হবে। অবশ্য অযুর স্থলে গোসল করে নিতে পারলে অত্যুত্তম। কারণ, অযুর ওপর গোসলের শ্রেষ্ঠত্ব ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ফরয ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায়ে কোনোরূপ ত্রুটি করবে না। এরপর নফী-এছবাতের যিকিরে মনোনিবেশ করবে। বস্তুত এ যিকির হচ্ছে, সমস্ত আযকার ও তাসবীহাতের স্থলাভিষিক্ত। প্রবাদ আছে, "সব শিকার বুনো গাধার পেটে।"

অর্থাৎ, গোটা পরিবারের জন্য একটি বুনো গাধাই যথেষ্ট। যিকিরের জগতে নফী-এছবাত যিকির অর্থাৎ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকিরের অবস্থাও তদ্রূপ অর্থাৎ, এক যিকিরই যথেষ্ট হবে।

সর্ব প্রকারে গুনাহ পরিহার করবে, মানুষের সাথে ওঠা-বসা, মেলামেশা, কথাবার্তা থেকে বিশেষত খিলওয়াত বা নির্জনবাস ও সুলূকের প্রাথমিক সময় দূরে থাকবে।

যদি সত্যান্বেষী মুরীদ এ সব শর্তের ওপর একটানা চল্লিশ দিন আমল করতে পারে অবশ্যই তার ওপর আলমে রূহানিয়াত থেকে মোকাশাফা ও মোশাহাদার দ্বার উন্মুক্ত হবে।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর জন্য ইখলাস রক্ষা করে চলবে, তার দিল ও যবানে হিকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে।

যিকিরের প্রকার ও তার বিশ্লেষণ

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَا كُمْ

"তোমরা আল্লাহর যিকির কর, যেরূপ তিনি তোমাদের তা'লীম দিয়েছেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৮)

মহান আল্লাহ তার যিকিরকারী বান্দাগণকে যে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন তার কয়েকটি স্তর রয়েছে; যথা-

১. যবানী বা মৌখিক যিকির : অর্থাৎ, যে যিকিরের শব্দ ও আওয়াজ আছে, কিন্তু দিল উদাসীন।

২. যিক্‌রে নফ্‌সব বা আন্তরিক যিকির : অর্থাৎ, দিলে দিলে যিকিরের হরফ চিন্তা করা, যাতে নফ্‌স শুনতে পায়।

৩. যিক্‌রে কলব : অর্থাৎ, দিলের মনোযোগ। এটি গাফলেতি ও নিস্‌য়ান বা উদাসিনতা ও বিস্মৃতির বিপরীত।

৪. যিক্‌রে সিব্‌র। তার মানে আসরারে এলাহীর মোকাশাফা তথা আল্লাহর রহস্যাবলি উদ্ঘাটনের দ্বার খোলার জন্য মোরাকাবা করা।

৫. যিক্‌রে রূহ : অর্থাৎ, আল্লাহর অসংখ্য নান্দনিক গুণের ঝলক ও জ্যোতি অবলোকন করা।

৬. যিক্‌রে খফী : অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সত্তাগত জামাল ও অনুপম সৌন্দর্য পরিদর্শন করা।

এসব স্তর সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো-

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ اَطْوَارًا

"আমি তোমাদেরকে কয়েকটি স্তরে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা নূহ : আয়াত-১৪)

স্তর মোট সাতটি। প্রতিটি স্তরের প্রতি কুরআনে কারীমে ইঙ্গিত রয়েছে। স্তরগুলো হচ্ছে-

১. শরীর, জিহ্বা ও তার অংশ বিশেষ : এগুলো হচ্ছে, মাটির তৈরী, ঘন ও স্থূল। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

" নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা মুমিনূন : আয়াত-১২)

২. নফ্‌স : এ হচ্ছে, বায়ূর মত সূক্ষ্ম ও হালকা। নফ্‌স সমস্ত শরীরে বিদ্যমান যেভাবে দুধে ঘি ও বাদামে তেল বিরাজমান থাকে। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىۤ اِلٰى رَبِّكِ

"হে প্রশান্ত আত্মা! আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (সূরা ফজর : আয়াত-২৮

এগুলো হচ্ছে সে স্তরের দিকে ইশারা।

৩. কলব : এ হচ্ছে নফ্‌সের অভ্যন্তর। এটি নফ্‌স অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, বেশ চমকদার।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ

"তিনি তাদের হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।" (সূরা মুজাদালা : আয়াত-২২)

এটিও সে স্তরের দিকে ইঙ্গিত করে।

৪. সির্‌র : এ হচ্ছে রূহানী নূর বা জ্যোতি ও নফ্‌সের অবলম্বন। অর্থাৎ, এ ছাড়া নফ্‌স তার কর্মতৎপরতা পরিচালনা করতে পারে না। বস্তুত কোন ফায়দা বা আমল মূলত নফ্‌সের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিবিম্ব বটে, যা সির্‌র ব্যতীত আঞ্জাম দিতে পারে না।

৫. রূহ : এটিও এক রূহানী নূর ও জ্যোতি যা নফ্‌সের অবলম্বন। কারণ, আল্লাহর কুদরতি নিয়মানুসারে নফ্‌সের জীবন রূহের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। রূহ থাকলে নফ্‌সও জীবিত থাকবে।

৬. রূহে খফী : বেশিরভাগ সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট এর নাম খফী। বাস্তবে এর নাম আখফা হওয়া যুক্তিযুক্ত। কুরআনে কারীম একে আখফা বলেই ব্যক্ত করেছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ স্তরত্রয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে,

اِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সির্‌র ও আখফা সম্পর্কে জ্ঞাত।" (সূরা ফুরকান : আয়াত-৭)

তিনি আরো বলেছেন,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

"হে মুহাম্মদ! বলে দিন, রূহ আমার প্রভু কর্তৃক একটি নির্দেশ মাত্র।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮৫)

উল্লেখ্য, সৃষ্টির ষষ্ঠ স্তর আখফা, এটি গোপনীয়তার ক্ষেত্রে রূহ, সির্‌র ও কলব থেকেও উর্ধ্বে। আখফা সূক্ষ্ম এক নূর যা আলমে হাকীকত থেকে অধিক নিকটবর্তী। পাক দরবারে উপবিষ্ট নফ্‌সের জন্য তা দ্বাররক্ষী তুল্য। যখন নফ্‌স, কলব, আকল, সির্‌র ও রূহ্ সে পাক দরবার থেকে গাফেল হয়, তখন আখফা বিশেষ কাইফিয়ত ও পদ্ধতিতে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এতে সকলেই সজাগ ও জাগ্রত হয়ে ওঠে।

এ সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ রূহের অসীলায় আখফাকে নিযুক্ত করেছেন। বস্তত আখফা কর্তৃক বিস্মৃতি ও গাফেলতি দূরীকরণ প্রক্রিয়া কেবল সাধারণ মুমিন ও সাধারণ পর্যায়ের অলীদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অন্যথায় উচ্চ পর্যায়ের আউলিয়ায়ে কেরাম ও নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা কল্পনাতীত। কারণ, তাঁদের সির্‌র এর তো আসফাল তথা নিম্নের দিকে দৃষ্টিপাত বড়ই বিরল ঘটানা।

তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهُ

"তাঁরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁদের আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় নেই।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৯)

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, এখানে দ্বিতীয় আরেকটি রূহ আছে যা সবচেয়ে বেশি কোমল ও তীক্ষ্ণ, যা অন্যান্য সব লতিফাকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। এ জাতীয় রূহ যার তার হয় না; কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

يُلْقِيْ الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

"মহান আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্য হতে যার প্রতি ইচ্ছা রূহ ইল্‌কা করেন।"

(সূরা গাফির : আয়াত-১৫)

এ রূহ হচ্ছে আলমে কুদরতের কর্মী ও আলমে হাকীকতের দর্শক। মাখলূকের প্রতি কদাচিৎ তার দৃষ্টি পড়ে। কারো অভিমত হচ্ছে, নফ্‌স, সির্‌র, রূহ, কলব ও আখফা সব একই জিনিস। এ অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মহান আল্লাহ প্রত্যেক স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। বস্তত এ অভিমতটি সঠিক বলে মেনে নিলে সব ক'টি স্তর নিরর্থক ও বেহুদা বলতে হয়; যা বড় অবাস্তব কথা। আল্লাহ তায়ালা যখন প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন তখন এগুলোর মূল তত্ত্ব অবশ্যই আলাদা হবে।

৭. আকল : এটি রূহ্ ও আত্মার জ্যোতি বিশেষ। আকলের স্থান কলবের বাম দিকে। হযরত দাঊদ আ. এর কথা বর্ণিত আছে, একদা তিনি স্বীয় পুত্র সোলায়মান আ. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন বলতো, তোমার দেহে আকল ও বিবেকের স্থান কোথায়? তিনি উত্তরে বলেছিলেন কলবে। কারণ, কলব হচ্ছে, রূহের অবকাঠামো আর রূহ জীবনের অবকাঠামো।

বলাবাহুল্য, শয়তান ও তার প্রতারণা প্রতিহত করার জন্য যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন তদ্বীর নেই। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

"নামায নির্লজ্জতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। অনন্তর আল্লাহর যিকির অতি মহান।" (সূরা আনকাবূত : আয়াত-৪৫)

দম্ভ অহঙ্কার ভাঙ্গতে ও যাবতীয় মন্দ অভ্যাস পরিবর্তন করতে নামাযের শক্তি অপরিসীম। বিশেষত কালেমা তাইয়্যেবার ক্রিয়াশীলতা বর্ণনাতীত।

বেশিরভাগ মাশায়েখে কেরাম আয়াতের মর্ম এভাবে বর্ণনা উদ্ঘাটন করেছেন যে, তোমরা যে আল্লাহকে স্মরণ কর এর চেয়ে বেশি তিনি তোমাদের স্মরণ করেন, সেটিই অধিক বড় বিষয়। এটিই যথার্থ ব্যাখ্যা। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রহমত, কবুলিয়ত, আ'তা, ফযল, দান ও করুণা সহকারে স্মরণ করেন। অনন্তর এ যিকির বা স্মরণ আমাদের সব নিন্দনীয় আখলাক দূর করে দিবে।

অতএব, তাযকিয়া ও আত্মা পবিত্রকরণে নামায অপেক্ষা যিকির অধিক ক্রিয়াশীল।

মনে রাখতে হবে, কলব ও নফ্সকে নূরান্বিত ও আলোকিত করতে হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা আবশ্যক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও। কেননা, উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া অন্যতম খোদায়ী শান। পরন্তু তকদীরে এলাহী তথা ভাগ্যলিপির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সে মহৎ চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত।

সাথে সাথে, মোশাহাদা ও বিসাল বা মাওলা পাকের দর্শন ও মিলন হাসিল হওয়ার জন্য সীরাতে মুস্তাকীম তথা দীনের সরল পথের অনুসরণ ও সার্বক্ষণিক যিকিরের বিকল্প নেই।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

"এটি আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর। অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না। এতে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।"

(সূরা আনয়াম : আয়াত-১৫৩)

আল্লাহ্ তায়ালা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্দেশ করেন,

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"হে রাসূল! আপনার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয়, তা দৃঢ়রূপে আঁকড়ে ধরুন। নিশ্চয়ই আপনি সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৪৩)

এর থেকে বুঝা যায় যে, মোরাকাবা, খিলওয়াত ও সার্বক্ষণিক যিকির মগ্নতার মাধ্যমে সবসময় মহান আল্লাহর সন্ধানে লিপ্ত থাকা। তালেবানে হক বা আল্লাহ অন্বেষীদের দায়েমী ফরয ও স্থায়ী কর্তব্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

"হে মুহাম্মদ! বলে দিন, আমি কেবল আল্লাহকেই চাই। অতঃপর তাদেরকে তাদের অনর্থক আলোচনায় লিপ্ত থাকতে দিন।" (সূরা আনয়াম : আয়াত-৯১)

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেন,

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ

"তোমরা আল্লাহর পথে মোজাহাদা কর, যেমন করা উচিত। তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন।"

(সূরা হজ্জ : আয়াত-৭৮)

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোজাহাদা দ্বারা আলমে হাকীকতের মোজাহাদা ও সাধনা উদ্দেশ্য। কেননা, যখন বান্দাদের আকৃষ্ট ও নির্বাচিত করার পর তাদের থেকে মোজাহাদা কামনা করা হচ্ছে, তখন এর দ্বারা নিম্ন বা অনুচ্চ সাধনা উদ্দেশ্য এ ভাবনা সাধারণ বিবেক বিরোধী।

সারকথা, আল্লাহর পথের পথিক প্রাথমিক পর্যায়ের হোক অথবা শেষ পর্যায়ের, মোজাহাদা ও আল্লাহর জন্য কষ্ট বরদাশ্ত করা ছাড়া কারো গত্যন্তর নেই।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"আমৃত্যু আপন পালনকর্তার ইবাদত করতে থাক।" (সূরা হিজর : আয়াত-৯৯)

এ কথার মর্মও তাই। কেননা, আরেফের মর্যাদা তার মা'রেফত অনুযায়ী অবধারিত হয়। অনুরূপ মা'রেফতের পরিমাণও কম-বেশি হয় সায়ের ফিল্লাহ বা আল্লাহর সত্ত্বায় অভিযাত্রা অনুসারে। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ব অনন্ত, তাই সায়ের ফিল্লাহও হবে অপরিসীম।

সুতরাং আলমে আ'লা তথা উর্ধ্ব জগতের দ্বার যার সামনে উন্মোচিত হয়েছে তার জন্য কোন মর্যাদা পেয়ে তথায় স্থির ও পরিতুষ্ট থাকার অবকাশ নেই; বরং আমরণ মোজাহাদা ও পরিশ্রম করে যাওয়া চাই, যাতে সায়ের যাত্রার বা গতি অনুপাতে মা'রেফত ও অভিজ্ঞান বর্ধিত ও উন্নীত হতে থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমাকে পাওয়ার জন্য মেহনত মোজাহাদা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথের সন্ধান দিয়ে থাকি।" (সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬৯)

অতএব, মুনতাহী, ওয়াসিল বা চূড়ান্তে শিখরে উপনীত ও মিলনধন্য সালেক তো আপন মাহবূবের মিলন আনন্দে উদ্বেলিত। মুবতাদী ও প্রথমকি অবস্থার সালেক তো বিসাল ও মিলনের পাশে অবস্থান করে। অচিরেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এ দু'জন ছাড়া বাকী সবাই মূল্যহীন। তাদের কোন মর্যাদা নেই।

অনন্তর মাহবূবে পাকের মধুর মিলন তাদেরই হিস্যা, যারা আপন শরীরকে মোজাহাদার, নফ্‌কে সাধনার, কলবকে মোরাকাবার, সির্‌রকে সায়েরের ও রূহকে মাহবূবের তলবের নিকট পুরোপুরি সোপর্দ করে দেয়। এমনকি সুপ্ত রূহ পর্যন্ত সির্‌র পৌঁছতে সমর্থ হয়; এরপর সির্‌র আলমে হাকীকি ও আত্মিক জগতে উপনীত হয়ে ধন্য হয়।

অতঃপর সির্‌র যখন হাকীকত সম্পর্কে অবহিত হয় তখন তার মাধ্যমে নফ্‌স, আকল ও কলব অবগত হয়ে যায়। ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে, সির্‌র হচ্ছে প্রদীপ সদৃশ এবং নফ্‌স, আকল ও কলব সে প্রদীপের সাহায্যে হাকীকত অবলোকন করে। আর এ অবস্থা হয় শুরুতে।

একপর্যায়ে মুরীদ যখন তামকীন ও স্থিতি লাভ করে হাকীকতের উচ্চ স্তরে পৌঁছে, তখন সির্‌র, রূহ ও আখফার তুলনায় নফ্‌স অধিক শক্তিশালী, অতি সূক্ষ্ম অগ্রবর্তী হয়। নফ্‌স, কলব ও আকল মুরীদের শরীরে বিদ্যমান থাকে বটে; কিন্তু তার কিরণ, জ্যোতিরাশি আলমে জাবারূত তথা মহান আল্লাহর জালাল ও অহঙ্কারের সে উঁচু স্তরে অবস্থান করে যেথায় আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশ্‌তারা পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায় অর্থাৎ, আল্লাহর অন্বেষায় আমলে ইখলাস পয়দা করে নেয়, আল্লাহ্ তায়ালা তার হয়ে যান। তার যাবতীয় সমস্য সমাধানের দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালা নিয়ে নেন।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

"মহান আল্লাহ্ কী স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" (সূরা যুমার : আয়াত-৩৬)

বর্ণিত আছে, একদা হযরত মূসা আ. আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনি কখন আমার হয়ে যাবেন? উত্তর এলো, যখন তুমি আর তোমার থাকবে না। হযরত মূসা আ. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার না থাকা কোন পর্যায়ের হতে হবে? ইরশাদ হলো,"নিজ সত্ত্বাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে।"

হযরত ইয়াকুব সূসী রহ. বলেন, প্রকৃত মহব্বত তখনই সাধিত হয়, যখন প্রেমিক মহব্বতের ভাবনা অতিক্রম করে অনন্ত প্রেমাস্পদের অনুভবে মনোযোগী হয়। সারকথা, মহব্বত বা ভালোবাসার কল্পনা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায়। যেরূপ, এক সময় মাহবুব গায়েবের পর্দা ও অদৃশ্য অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিলেন তখন কোন মহব্বত বা প্রেম ছিল না।

অনুরূপভাবে কামাল মোশাহাদা ও পরিপূর্ণ দর্শনের কারণে মহব্বতের অনুভূতিও অবশিষ্ট থাকে না। ফলে মুহিব ও প্রেমিক একেবারেই মহব্বত শূন্য হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ অন্বেষীর কর্তব্য হচ্ছে, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাতের জন্য অস্থির ও ব্যাকুল থাকা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "জান্নাত অভিমুখে সর্বাগ্রে সে সকল লোককে আহ্বান করা হবে, যারা দুনিয়াতে সুখ-দুঃখ সর্ব অবস্থায় আল্লাহর হামদ ও শোকর আদায় করত। কারণ, সর্ব অবস্থায় আল্লাহর সন্ধানে রত থাকা মোহব্বত ও ভালোবাসার সততার প্রমাণ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন আল্লাহ্ তায়ালা কোন বান্দাকে মোহব্বত করেন, তখন তাকে মুসিবতে আক্রান্ত করেন। অতঃপর যদি সে ধৈর্য ধারণ করে, তখন তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। অধিকন্তু সে যদি এ অবস্থার ওপর রাজি থাকে তবে তাকে একনিষ্ঠ বন্ধু ও ইয়ার বলে মনোনীত করেন। পরন্তু তাকে বিশেষ স্নেহের বন্ধনে জুড়ে রাখেন। কারণ, রেযার মাকাম সবরেরও উর্ধ্বে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর ইবাদত কর।

অর্থাৎ, ইবাদতের মুহূর্তে হৃদয়মন যেন প্রফুল্ল থাকে। যদি পূর্ণরূপে প্রফুল্ল নাও থাকে, তবুও নফ্স বিরোধী বিষয়ের ওপর সবর করা বড় কল্যাণকর কাজ।

একদিন সরদারে দো' আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তদুত্তরে তারা বলল, আমরা ঈমানদার সম্প্রদায়। প্রশ্ন করা হলো, তোমাদের ঈমানের বিশেষ কোনো লক্ষণ আছে কী? বলল, আমরা মুসিবতে ধৈর্য ধরি, সচ্ছলতায় আল্লাহর শোকর আদায় করি ও আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকি। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কা'বার পালনকর্তার শপথ করে বলছি, নিঃসন্দেহে তোমরা মুমিন।

অন্য রেওয়ায়াতে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছিলেন, এরা বড় জ্ঞানী ও অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী। এদের ইল্‌মের যে গভীরতা দেখছি, এতে তাদের নবী হয়ে যাওয়া কোন বিচিত্র নয়।

কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, আল্লাহর যিকির দিলে স্বচ্ছতা আনে, মুসিবতের তিক্ততা ভুলিয়ে দেয়। কারণ, মহান আল্লাহ যাকেরীন বান্দাগণকে আপন কুদরতের অপার নিদর্শনাবলি দেখান। এতে তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ নিজ পবিত্র সত্ত্বা ও সিফাতে কাদীমা ও অবিনশ্বর গুণাবলির ব্যাপারে সমগ্র সৃষ্টিজগত হতে একেবারে বিমুখ ও অমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁরই কুদরতে স্থির ও তাঁর মুখাপেক্ষী।

যখন তাদের ওপরে এ মোশাহাদা ও অবলোকন প্রবণতা প্রবল হয় ও আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ফানী ও ধ্বংসশীল দেখতে পায়, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো কিছুই তাদের নজরে আসে না। কাজেই, এরা বালা-মুসিবতের তিক্ততা টের পাবে কীকরে? মা'রেফতের এ স্তরটি আরেফীন ও সিদ্দীকিনের হিস্যা। অনন্তর এরাই হচ্ছেন, আসহাবে মোশাহাদা ও মোকাশাফা। এটিই হচ্ছে সূফিয়ানে কেরামের 'আমি আল্লাহকে সবকিছুর আগে দেখেছি' এ কথার উৎস। এখানে দেখা অর্থ সুদৃঢ় একীন ও ইখলাসের সাথে সির্‌র এর চোখে দেখা।

হযরত হোসাইন রা. বলেন, মুসিবত বলতে রাব্বুল আলামীন কর্তৃক বান্দাগণের প্রতি প্রেরিত এক প্রকারের আফিয়াত বা প্রশান্তি।

হযরত সোহায়েল তস্তরী রহ. বলেন, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ-আপদ ও সংকট না আসত, তাহলে বান্দাগণ আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ পেত না। হযরত আবূ সাঈদ খাররায রহ. বলেন, দুর্দশা ও বালা-মুসিবত আল্লাহপ্রেমিকদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি হাদিয়া বা উপঢৌকন। এ হাদিয়ার মাধ্যমে কেমন যেন তিনি মহামিলনের গোপন শিকলে নাড়া দেন।

হযরত যুন্নুন মিসরী রহ. বলেন, খাঁটি ধৈর্যশীল ব্যক্তিই কেবল মুসিবতের কষ্ট গোপন রাখতে পারে।

হযরত রুওয়াইম রহ. বলেন, বিপদ-আপদ দিয়ে মহান আল্লাহ বান্দাদের নাড়া দেন ও বান্দাগণ এতে কেঁপে ওঠে। যদি তারা স্থির থাকতে পারত, একটু ধৈর্য ধরে আল্লাহর চৌকাঠের ওপর পড়ে থাকতে পারত, তবে তারা তাঁর মিলন লাভে ধন্য হত।

হযরত আবূ ইয়াকুব নহরপুরী রহ. বলেন, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে সমগ্র পৃথিবী আর্তনাদ করে ও সকলেই তা দূর করার জন্য উদগ্রীব। অথচ আরেফ তথা আহলুল্লাহ বিপদেও মহাসুখ অনুভব করেন, ফলে কখনো তা থেকে পরিত্রাণ চান না।

হযরত জোনায়েদ রহ. বলেন, বিপদাপদ আরেফীনের পথের মশাল, মুরীদের জন্য সংকেত ও গাফেলদের জন্য ধ্বংসের পদধ্বনি।

হযরত ইবনে আতা রহ. বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

"সততা ও মিথ্যাচারে বান্দার পরিচয় পাওয়া যায়।"

যদি স্বচ্ছলতায় শোকর ও কৃতজ্ঞতায় ইবাদতের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে, বিপদে হা-হুতাশ করে তাহলে বুঝতে হবে, সে তার মহব্বতের দাবীতে মিথ্যাবাদী।

হযরত আলী ইবনে বুনদার রহ. বলেন, দুনিয়া এমন গৃহ, দুঃখ-কষ্টই যার ভিত্তি। কাজেই, এ ধরার বুকে সমস্যা ও জটিলতামুক্ত থাকা অসম্ভব।

যিকির সুফল প্রাপ্তির জন্য আল্লাহপ্রেমিকের করণীয়

আল্লাহপ্রেমিককে সবসময় প্রশান্ত ও প্রফুল্ল থাকতে হবে। এটি তরীকতের অন্যতম বড় আদব। এর সাথে শায়খের তালকীন ও শিক্ষা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ দৃঢ়তার সাথে যিকিরে নিবিষ্ট থাকতে হবে। যাতে বাতেন এমনকি সকল শিরা-উপশিরা ও স্নায়ূ পর্যন্ত যিকিরের তা'ছীর ছড়িয়ে পড়ে। অস্তিত্বের অনামিশা, স্থূলতা যিকিরের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয় ও যিকিরের নূরে প্রশান্তি আসে। কেননা যিকিরের মধ্যে নূর ও নার তথা আলো ও অগ্নি উভয়ই বিদ্যমান। যিকিরের নূরে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, যিকিরের আগুন মানবীয় অস্তিত্বের মলিনতা, স্বভাবের রুক্ষতা ও শুষ্কতা জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। এমনকি মানবিক প্রভাব থেকে মুক্ত ও মাটির বোঝা থেকে হালকা হয়ে কলবের সাহায্যে ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রান্তর পার হয়ে মহান আল্লাহর সকাশে গিয়ে পৌঁছে।

অনন্তর যিকিরের পূর্ণাঙ্গ তা'ছীর ও বিশাল ক্রিয়া তখনই পরিলক্ষিত হয় যখন খিলওয়াত বা নির্জনবাসের কক্ষ সংকীর্ণ হয় ও সর্বপ্রকার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যিকির করা হয়। কারণ, লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ, তাদের ঘণঘণ দৃষ্টিপাত একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটায়। একারণেই যিকিরের স্থান সংকীর্ণ হতে হবে যাতে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে একান্ত মনে ও অধিক পরিমাণে যিকির করা যায়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির এত বেশি বেশি কর যে, সমাজের মানুষ তোমাদের পাগল বলে। অনন্তর সিদ্ক ও ইখলাস তথা সততা ও একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর যিকিরের চিহ্ন হচ্ছে, অন্তরের বিনয় ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি হওয়া। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"বস্তুত মুমিন সে সকল লোক মহান আল্লাহর আলোচনা শ্রবণের সাথে সাথে যাঁদের হৃদয় শিহরিত, ভীত হয়।" (সূরা আনফাল : আয়াত-২)

কেননা, তাঁদের যিকির হচ্ছে, উবূদিয়ত ও ইবাদত তথা দাসত্ব ও বন্দেগীর যিকির। একাগ্রতা ও সজাগ মনের যিকির। উদাসিনতা ও গাফেলতির যিকির নয়। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহপূর্বক আপন মুকার্‌রব ও নৈকট্যশীল ফেরেশ্তাদের মজলিসে গর্বের সাথে এ যিকিরকারীর আলোচনা করেন ফলে এ যিকিরের কারণে তার ভিতরে এ সকল গুণবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِذَا ذَكَرَنِيْ عَبْدِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَإِذَا ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهٖ

"আমার বান্দা যখন মনে মনে আমার যিকির করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যখন কোনো মজলিসে আমার যিকির করে, তখন আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি।" (বাহরে মাদীদ : ৫/৬০)

বস্তুত মহান আল্লাহ যাকে স্মরণ করেন, কলব ও সির্‌রে যিকির ও মাযকূর তথা স্মরিত মহান সত্তার মাঝে বিলীন হওয়ার মর্যাদা তার নসীব হয়। তার হৃদয় উত্তম হালত ও অবস্থা এবং শরীর উত্তম আমল দ্বারা সুসজ্জিত ও অলংকৃত হয়। সুবহানাল্লাহ! বান্দার প্রতি আল্লাহর কী অসাধারণ দয়া যে, তিনি যিকিরের হুকুম করেছেন। আবার তিনিই যিকিরের মাধ্যমে বান্দাকে নির্মল, পবিত্র ও নূরান্বিত করেন। ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী জ্ঞান, সৎ গুণাবলি অর্জন, অন্যায়-অপরাধ থেকে সুরক্ষা, শয়তানের পরিচয়, হৃদয়ের উজ্জীবন ও নির্মলতা, স্বীয় পাক যাতের নৈকট্য, যাকিরের আপন নফ্‌সের ওপর জয় লাভ, নফ্‌সকে ধমকানো-শাসানো, শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কামের আওতায় তাকে প্রবিষ্ট করার উপায়, ইল্‌ম-হিকমত ও কলবে উত্তম হালতের উদয় প্রভৃতি সবকিছু মহান আল্লাহ যিকিরের মাধ্যমে দান করেন। এ সকল অনুগ্রহ কেবল বনী আদমের জন্য নির্ধারিত।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. বলেন, শয়তান এত অধিক পরিমাণ বন্দেগী করার পরও মোশাহাদার স্তরে পৌঁছতে সমর্থ হয়নি। তাই সাজদার আদেশ প্রাপ্তির পর সে অহঙ্কার করেছিল। অথচ হযরত আদম আ. পদস্খলনের মুহূর্তেও মোশাহাদার স্তর থেকে নিচে নামেননি। তাই তো নিজের কৃত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ্ যেভাবে আকাশমণ্ডলকে ফেরেশ্‌তা, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত করেছেন, তদ্রূপ মানুষের অন্তরাত্মাকে আপন যাত ও সিফাতের নূর দ্বারা নূরান্বিত উজ্জ্বল করেছেন। আর যিকিরের মাধ্যমে সে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হয়।

ইসমে যাত তথা আল্লাহ শব্দ ও কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর নূর সবচেয়ে স্বচ্ছ। তার ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতির্ময়তা সবচেয়ে বেশি। তাই তো যিকিরকারী যখন অবিরত যিকির করতে থাকে তখন সে যিকিরের নূর কলবস্থ নূরের সাথে যুক্ত হয়ে কলবে এক শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে নেয়, যা পর্যায়ক্রমে কলবের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও নিজস্ব গুণে পরিণত হয়।

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, কালিমায়ে তাইয়্যেবা কলব ও সির্‌র এর ভিতরে আসন গেড়ে নেয়, এ কথার মর্ম এটিই।

যিকিরের সূচনা দ্বারা ইল্‌ম হাসিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় ইল্‌মের ওপর আমল করে মহান আল্লাহ সে আমলের কল্যাণে তাকে বহু অজানা বিষয়ের জ্ঞান দান করেন।"

এরপর যিকিরের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার পরে বিশেষ হিকমত ও অভিজ্ঞান অর্জিত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য আমল করে, হিকমতের ঝর্ণাধারা কলব থেকে তার যবানে প্রবাহিত হতে থাকে।"

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, যিকিরের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে একমাত্র মহান আল্লাহ। শব্দ ও বাক্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও যিকিরের মূল উদ্দেশ্য কবুলিয়ত অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার দরবারে মঞ্জুর হওয়া। অবশ্য এ উদ্দেশ্য সকল যিকির দ্বারাই অর্জিত হয়।

হযরত শিবলী রহ. একদা কোনো সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তোমরা তো যাকির। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আমি যাকিরীনের সঙ্গী।" কাজেই, তোমরা আল্লাহর সঙ্গীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছ। অনুরূপ জনৈক বুযর্গকে প্রশ্ন করা হল, যিকির-আযকারের ব্যবস্থা জান্নাতেও থাকবে কী? এতদুত্তরে তিনি বললেন, যিকির তো গাফেলতিকে দূর করার জন্য হয়ে থাকে। জান্নাতে যখন গাফেলতিরই প্রবেশাধিকার নেই সেখানে যিকির থাকার কী কোনো সুযোগ আছে?

শর্ত-৬ : খাওয়াতির বা অন্তরে উদিত অবাঞ্ছিত চিন্তা পরিত্যাগ করা

ষষ্ঠ শর্ত সর্বদা খাওয়াতির বা মনের ভিতরে উদিত অবাঞ্ছিত চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করা। বিষয়টি মোজাহাদাকারীর জন্য অত্যন্ত কঠিন। বস্তুত খাওয়াতির পরিচিতি সূফিয়ায়ে কেরামের এক বিশেষ ইল্‌ম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর সুফল হচ্ছে, কোন্ ভাবনা আল্লাহর রেযামন্দির অনুকূলে ও কোন্ ভাবনা এর বিপরীত? সেটা জানবার দক্ষতা ও যোগ্যতা লাভ করা। যে ভাবনা আল্লাহর রেযামন্দির অনুকূলে বলে মন সাক্ষ্য দেয়, তার অনুসরণ করবে আর এর বিপরীত যে ভাবনা রেযামন্দির বিপরীত তার বিরোধিতা করবে।

সুতরাং খাওয়াতির কী ও কত প্রকার? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আবশ্যক। তাই নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

ওয়ারিদ : বান্দার কোন ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ছাড়া কলবের ভিতরে ভাবান্তর সৃষ্টি হয় তাকে ওয়ারিদ বলে। চাই তা সম্মোধন আকারে হোক অথবা অন্যভাবে হোক। যেমন- হুয্‌ন বা দুঃখ, কব্‌য হতোৎসাহ ও বস্‌ত বা আগ্রহ ও প্রফুল্লতা। এগুলো অনেক সময় সালেকের ওপর আপতিত হয়, তদুপরি এর কারণ সালেকের অজানা থাকে। বুঝা গেল, এতে সালেকের নিজস্ব কোনো ইরাদা ও প্রচেষ্টা সক্রিয় নয়।

খাতের : সে ওয়ারিদকে বলা হয়, যা খেতাব ও সম্বোধন রূপে অন্তরে উদিত হয়। বেশিরভাগ সূফী সাহেবের নিকট খাওয়াতির চার প্রকার; যথা-

ক. খাতরায়ে হক অর্থাৎ, সত্য ও সঠিক ভাবনা যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। বস্তুত এটিও এক প্রকারের ইল্‌ম যা আল্লাহর নৈকট্যশীল ও আহলে হুযূর বা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত সালেকের কলবে অদৃশ্য হতে সরাসরি তিনি প্রত্যাদেশ (এল্‌কা) করেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ

"হে মুহাম্মদ! বলে দিন, আমার মহান আলিমুল গায়েব পালনকর্তা সত্যটাই এল্‌কা করেন।"

(সূরা সাবা : আয়াত-৪৮)

খ. খাতরায়ে মালাকী ও ফেরেশ্‌তাসূলভ অবস্থা। এ অবস্থার সৃষ্টি হলে ইবাদত-বন্দেগীর প্রেরণা, নেককাজের উদ্দীপনা ও গুনাহ থেকে পরিত্রাণের আগ্রহ জাগে। অধিকন্তু গুনাহে লিপ্ত হলে অথবা ইবাদতে অলসতা করলে ভর্ৎসনা আসে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের ওপর শয়তান ও ফেরেশ্‌তা উভয়ের প্রভাব রয়েছে। শয়তানের প্রভাব হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান ও গুনাহে স্বাদের আশ্বাস প্রদান। পক্ষান্তরে ফেরেশ্‌তার প্রভাব থেকে উৎসারিত হচ্ছে, হকের সত্যায়ন ও নেককাজে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান।

গ. খাতরায়ে নফ্‌সানী অর্থাৎ, দুনিয়ার উপস্থিত স্বাদ গ্রহণের চাহিদা ও অলিক খাহেশাতের পিছনে পড়া। আল্লাহ্ তায়ালা ইয়াকূব আ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন,

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا

"তিনি বললেন, এটি কখনই নয়; বরং তোমাদের প্রবৃত্তি ইউসুফের বিষয়টি তোমাদের কাছ সুসজ্জিত করে তুলেছে।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-১৮)

মহান আল্লাহ হযরত ইউসুফ আ. এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَمَاۤ اُبَرِّئُ نَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ

"আমি আমার প্রবৃত্তির নিস্কলুষতা প্রকাশ করছি না। কারণ, প্রবৃত্তি সবসময় মন্দ কাজের আদেশ করে থাকে।"

(সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫৩)

বুঝা গেল, গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করা ও গুনাহের কাজ চাকচিক্যময় করে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নফ্‌সের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। একেই খাতরায়ে নফ্‌সানি বলা হয়।

ঘ. খাতরায়ে শয়তানি যা সবসময় মানুষকে গুনাহ, পাপাচার ও নাফারমানির দিকে আহবান করে।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ وَاِخْوَانُهُمْ یَمُدُّوْنَهُمْ فِی الْغَیِّ ثُمَّ لَا یُقْصِرُوْنَ

"নিঃসন্দেহে পরহেযগার বান্দাগণকে কখনো শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে তৎক্ষণাত তারা আল্লাহর আযাবকে স্মরণ করে। অধিকন্তু হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিধান করে বাতিল থেকে বিরত থাকে। অনন্তর যারা শয়তানের ভাই তাদেরকে শয়তান গোমরাহির দিকে প্ররোচিত করে। এক্ষেত্রে শয়তান কোন ত্রুটি করে না।"

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-২০১)

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে আরো বলেন,

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় (বলে, যাকাত ও সদ্‌কা আদায় করলে অভাবে পড়বে।) অশ্লীল ও অবৈধ কাজের আদেশ করে। অনন্তর আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় করুণা ও মাগফেরাতের ওয়াদা করেন।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৬৮)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ

"হেদায়াতের পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যারা ধর্ম ত্যাগ করে, শয়তান তাদের সামনে বিপথগামিতাকে সুশোভিত করে পেশ করে। পরন্তু তাদেরকে উচ্চাশা প্রদান করে।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-২৫)

মহান আল্লাহ কুরআনে মাজীদে আরো বলেন,

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ

"কিয়ামতের দিন সমস্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর শয়তান স্বীয় বন্ধুদের সম্বোধন করে বলবে, আল্লাহর সমস্ত অঙ্গীকারই সত্য তবে আমার সকল অঙ্গীকারই ছিল ভিত্তিহীন, এ মুহূর্তে আমি তা ভঙ্গ করলাম। বস্তুত তোমাদের ওপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না।" (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-২২)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "শয়তান স্বীয় বন্ধুদের ওয়াসওয়াসা দেয়।" তিনি আরো বলেন, "অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণের বেলায় জ্বিন ও মানুষ শয়তানদেরকে শত্রু বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওই সকল শয়তান পরস্পর একে অপরকে কুমন্ত্রণা দিত ও সংশয় জাগাতো।"

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ থাকে, আমি তার ওপর শয়তানকে নিযুক্ত করে দেই।"

হাদীস শরীফে এসেছে, "শয়তান আদম সন্তানের কলবের ওপর হাঁটু গেড়ে জেঁকে বসে। এরপর আদম সন্তান যখন যিকির করে, শয়তান পলায়ন করে। আর যখন গাফেল হয়, তার দিলকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নেয়। পরন্তু আদম সন্তানের অন্তরে নানা কুমন্ত্রণা ও অসার আশার ফানুস জ্বালাতে থাকে।

বস্তুত খাতরায়ে হক ও খাতরায়ে মালাকীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, কোন বস্তু খাতরায়ে হকের মোকাবেলা করতে পারে না। যখন খাতরায়ে হকের বিজয় হয়, তখন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং অন্য সব খাতরা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

একদা জনৈক বুযুর্গের নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করল, খাতরায়ে হকের প্রমাণ কী? তদুত্তরে তিনি বললেন, সেটি একটি ওয়ারিদ, যার উদয় স্থল হচ্ছে কলব। সেটি মানুষের মনকে হকের এন্‌কার ও মিথ্যাচার হতে বারণ করে। (ফলে শয়তানের পক্ষে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন বা তার আসর গ্রহণ না করার উপায় থাকে না।)

খাতরায়ে মালাকীর বিরোধ হচ্ছে খাতরায়ে নফ্‌সানী ও খাতরায়ে শয়তানীর সাথে। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, যিকিরের নূরে নফ্‌সানি খাতরা প্রতিহত হয় না। উল্টা যিকির করা সত্ত্বেও তার চাহিদা ও দাবী বার বার পেশ করতে থাকে। তবে আল্লাহ তায়ালা তাওফী দিলে তার চাহিদা নিঃশেষিত হতে পারে। অবশ্য তা ভিন্ন কথা।

শয়তানী খাতরা যিকিরের নূর দ্বারা বন্ধ হলেও পুনরায় তা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। এমনকি একপর্যায়ে যিকির পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে। এটা অসম্ভব কিছু নয়। পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে,

"যিকিরের মুহূর্তে শয়তান পালিয়ে যায়, এরপর গাফেলতি দেখলে পুনরায় ফিরে আসে।"

সূফিয়ায়ে কেরাম আরেকটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন, খাতরায়ে মালাকীর অবস্থা হচ্ছে, বান্দা কখনো তার অনুসরণ করে, কখনো বিরোধিতা করে। কিন্তু, খাতরায়ে হকের খেলাফ কখনই করতে পারে না।

তাঁরা আরো বলেছেন, খাতরায়ে হক্কানী হচ্ছে সতর্ক সংকেত। খাতরায়ে মালাকী মানে নিজের মন থেকে ইবাদতের আবেদন ও দাবী আসা। খাতরায়ে নফ্‌সানী হচ্ছে, লজ্জত বা নগদ স্বাদ উপভোগের খাহেশ। খাতরায়ে শয়তানী খাতরায়ে নফ্‌সানীকে চমৎকার রং-রূপ দিয়ে প্রকাশ করে। কাজেই, সালেক নূরে তাওহীদের বদৌলতে হক ওয়ারিদগুলো গ্রহণ করে, নূরে মারেফতের অসীলায় খাতরায়ে মালাকী কবুল করে নেয়, নূরে ঈমানের সাহায্যে নফ্‌সকে শাসন, নিন্দাবাদ ও তিরস্কার করে। সর্বোপরি ইসলামের নূরের কল্যাণে চির শত্রু শয়তানকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে থাকে।

খাতরা বা মনের মাঝে উদিত ভাবনা প্রকার ও তার বিশ্লেষণ

হযরত জোনায়েদ রহ. কে একদা খাতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেলন, খাতরা চার প্রকার; যথা-

১. খাতরায়ে রাহমানী : যা হেদায়েত ও আসরারের দিকে পথনির্দেশ করে।

২. খাতরায়ে মালাকী : যা বন্দেগীর দিকে পথ দেখায়।

৩. খাতরায়ে নফ্‌সানী : যা পার্থিব মোহের দিকে আকৃষ্ট করে।

৪. খাতরায়ে শয়তানী : যা পাপাচার ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দিকে ধাবিত করে।

সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রসিদ্ধ আছে, চার প্রকার খাতরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে, তবে কোনোটা সরাসরি আর কোনোটা ফেরেশ্‌তা, নফ্‌স ও শয়তানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সরাসরি আগত খতরাকে খাতরায়ে রাব্বানী বলা হয়। যদি সেগুলো খাতরায়ে খায়ের বা কল্যাণজনক না হয়ে ভিন্ন ধরণের হয়, তাহলে আদবের কারণে সেগুলোর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে না করাই বাঞ্ছনীয়।

খাতরায়ে খায়ের অর্থাৎ, কল্যাণকর চিন্তা য ফেরেশতাদের মাধ্যমে হয়, তার নাম খাতরায়ে মালাকী ও খাতরায়ে শার ও কু-চিন্তা যদি থেমে থেমে আসে, পরন্তু তাতে এমন বস্তুর সংমিশ্রণ থাকে যে, নফ্‌স তৃপ্তি পায়, তাকে খাতরায়ে নফ্‌সানী বলে। অন্যথায় খাতরায়ে শয়তানি।

কোনো কোনো সূফী সাহেবের অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে উৎসারিত খাওয়াতির মোট চার প্রকার অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যখন আপন বান্দাকে তাঁর কুরব ও নৈকট্য দানে পুরস্কৃত করতে চান, সর্বপ্রথম তার কলবের সহযোগিতার জন্য রূহ ও কলবের সৈনিক অর্থাৎ, ফেরেশ্‌তাদের জামায়াত নাযিল করেন। এতে তার অন্তরাত্মা শক্তিশালী হয়ে সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের ডানা মেলে কুরব ও নৈকট্যের আকাশে উড়তে পারে। এভাবেই তা খাতরায়ে হক্কানী উদয়নের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যখন কাউকে বিতাড়িত ও বিদূরিত করতে চান, তখন তার দিকে দলে দলে শয়তান প্রেরণ করেন, তারা এসে নফ্‌সের সহায়তা করে। বস্তুত নফ্‌সের হিম্মত ও নিয়ত তথা আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল তো স্বভাবতই অসৎ ও নিম্নমূখী। তাই শয়তানের বাহিনীর মদদ পেয়ে সে আরো অধিক বলিয়ান হয়ে আপন স্বভাবগত নীচতার দিকে ধেয়ে আসে। এতে নফ্‌সানী খাতরা বহিঃপ্রকাশের পরিমাণ বেড়ে যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে এর থেকে নিরাপদ রাখুন।

খাওয়াতিরের পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান কখন সাধিত হবে? পার্থক্য জ্ঞান তখনই সূচিত হবে যখন কলবের দর্পণের মরিচা যুহ্‌দ ও দুনিয়া বিমুখতা, তাকওয়া, পরহেযগারী ও যিকিরের রেত দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়ার পরে তাতে বিভিন্ন দশা তার আসল স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকবে। পরন্তু যে ব্যক্তি যুহ্‌দ ও তাকওয়া অবলম্বন করেও এ স্তরে পৌঁছতে পারেনি, রাহে সুলূকের খাওয়াতিরের মাঝে পার্থক্য করার জন্য তার ওপর জরুরি হচ্ছে, যে খাতরা কলবে উদিত হবে, প্রথমে শরীয়তের নিক্তিতে তাকে তুলবে, যদি তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব মনে হয় তবে তদানুযায়ী আমল করবে। যদি হারাম ও মাকরূহ হয় তবে তা দূরীভূত করবে। মুবাহ হলে এমন দিক অবলম্বন করবে, যাতে অধিক পরিমাণ নফ্‌সের বিরোধিতা সাধিত হয়। কারণ, নফ্‌স স্বীয় কদার্যদার কারণে বেশিরভাগ সময় তুচ্ছ বস্তুর দিকে ধাবিত থাকে।

মোটকথা, নফ্সের বিরোধী যে দিকে যত বেশি হবে, তার তুচ্ছতার প্রতি অনুরাগের পরিমাণও তত কম হবে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নফ্সের এমন কিছু অতীব জরুরি দাবি ও অধিকার রয়েছে যেগুলো পূরণ করা অত্যাবশ্যক। কারণ, নফ্সের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব তার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন- বিয়ে–শাদী, পানাহার প্রভৃতির চাহিদা।

অতএব, হক ও মৌলিক পাওনা কোন্‌টি এবং হুযূয ও অতিরিক্ত আহ্লাদ কোন্‌টি তা নিরূপণ করা আবশ্যক। হুকূক বলা হয় জরুরি অধিকার বা পাওনাকে। আর হুযূয বলা হয়, অতিরিক্ত আহ্লাদ বা সৌখিনতার আকাঙ্খাকে। মুবতাদী বা প্রাথমিক পর্যায়ের সালেকের জন্য বিশেষভাবে হুকুক ও জরুরতের সীমারেখা জানা একান্ত জরুরি। জরুরতের সীমা অতিক্রম করা গুনাহ। অবশ্য মুন্তাহী তথা সুলুকের চূড়ান্ত শিখরে উপনীত ব্যক্তির জন্য স্বচ্ছলতার দরজা খুলে যায় ফলে তিনি জরুরতের সংকীর্ণ ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে স্বচ্ছলতার প্রশস্ত ময়দানে প্রবেশ করেন। এপর্যায়ে উপনীত হলে হুযূয পূরণ ও মন ভরে আরাম-আয়েশ করা আল্লাহর ফযলে তার জন্য ক্ষতিকর হয় না।

এমনকি কোন কোন তাসাউফের আলেম বলেছেন, আসলে ওয়াজিবের খাতরা খাতরায়ে হক্কানী, হারামের খাতরা খাতরায়ে শয়তানী, মোস্তাহাবের খাতরা খাতরায়ে মালাকী ও মাকরূহের খাতরা খাতরায়ে নফ্সানী। অবশ্য এখানে মোবাহের খাতরাকে খাতরা আখ্যায়িত করা হয়নি। কারণ, মুবাহ্ হচ্ছে এমন কাজ যা করা না করা উভয়ই সমান। করলে সওয়াব নেই, আবার না করলেও কোনো গুনাহ নেই। অথচ খাতরা নামকরণের জন্য কোনো এক দিক প্রবল হওয়া জরুরি।

শায়খ মাজদুদ্দীন বাগদাদী রহ. এর মতে, এ চার খাতরার সাথে আরো তিন খাতরা সংযোজন করা চাই; যথা-৫. খাতরায়ে রূহ, ৬. খাতরায়ে কলব ও ৭. খাতরায়ে শায়খ।

কোন কোন মাশায়েখ আরো দু'টি খাতরা সংযোজন করেছেন; যথা-৮. খাতরায়ে আকল ও ৯. খাতরায়ে একীন।

কিন্তু তাহকীকি কথা হচ্ছে, এসব খাতরা উক্ত চার খাতরার মাঝে নিহিত রয়েছে। যেমন- খাতরায়ে রূহ ও খাতরায়ে কলব তো খাতরায়ে মালাকীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ খাতরায়ে আকল রূহ ও কলবের সহযোগিতার জন্য হলে তা খাতরায়ে মালাকী। যদি নফ্স ও শয়তানের মদদ যোগালে নিঃসন্দেহে তার নাম হবে খাতরায়ে শয়তানী। খাতরায়ে শায়খ হচ্ছে শায়খ নিজের সুউচ্চ মনোবল ও মনঃসংযোগের মাধ্যমে মুরীদের কলবে শক্তি পৌঁছান। মুরীদ কোন সমস্যায় পড়ে সেখান থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে না পেলে তখন শায়খের প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট করে। এতে তৎক্ষণাত আল্লাহর হুকুমে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। একে খাতরায়ে হক্কানী বলা চলে। কারণ, শায়খের কলব অদৃশ্য জগতের দিকে উন্মুক্ত একটি দরজার মত। দরজা থেকে যাকিছু আসে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে তা আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগত থেকেই আসছে। মনে করতে হবে, আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে প্রতি মুহূর্তে মুরীদের অন্তরে যে ফায়েয পৌঁছছে, মূলত তা শায়খের অসীলাতেই পৌঁছছে।

খাতরায়ে একীন হৃদয়ে উদিত সেসব প্রবল ওয়ারিদ ও চিন্তাকে বলা হয়, সন্দেহ, সংশয় কখনই যার মোকাবেলা করতে পারে না। কাজেই, এটাও এক প্রকার খাতরায়ে রাব্বানী। "আওয়ারিফুল মায়ারিফ" গ্রন্থকার বলেন, খাতরায়ে আকল হচ্ছে, উল্লেখিত চার খাতরার মধ্যবর্তী খাতরাটির নাম। তিনি আরো বলেন, খাতরায়ে আকল কখনো নফ্স শয়তানের সহযোগী হয় ফলে নানা যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দিয়ে বা স্বাদ দেখিয়ে বান্দাকে গুনাহে লিপ্ত করে। যদি আকল না থাকত তবে আযাব ও সওয়াব কিছুই হতো না। যেমন- পাগল গুনাহ করলে শাস্তি নেই।

বুঝা গেল, সওয়াব ও আযাব দু'টিই আকলের কারিশমা বা কৃতিত্ব। বস্তুত খাতরায়ে আকল কখনো ফেরেশ্তা ও রূহের সহকর্মী হয়ে থাকে। যাতে বান্দা স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে পুরস্কৃত হয়। খাতরায়ে একীন মূলত ঈমানী শান্তি, ইল্ম ও হিকমতের আধিক্য এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞার পর্যাপ্ততা। কাজেই, এটি কোন স্বতন্ত্র খাতরা নয়।

জেনে রাখা উচিত, মোজাহাদারত সালেকের ওপর খাতরাত ঝড়ের মত ভীড় করে। কাজেই, সুলুকের প্রাথমিক অবস্থায় একেবারে চোখ বুজে পথ চলবে। ভালো-মন্দ কোন প্রকার খাতরার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। কারণ, মুবতাদী তথা প্রাথমিক পর্যায়ের সালেকের কাছে পার্থক্য জ্ঞান থাকে না। হতে পারে সে মন্দকেই ভালো বলে বুঝে বসবে। এতে তার ক্ষতির সমধিক আশঙ্কা রয়েছে। এরপর যখন সর্বপ্রকার খাতরা উপেক্ষা করে চলবে তখন প্রশংসিত তথা

রাব্বানী ও মালাকী খাতরা কলবে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করবে। একপর্যায়ে হাজারো চেষ্টা করেও তাকে অপসারণ করা সম্ভব হবে না। অথচ শয়তানী ও নফ্‌সানী খাতরা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

খাওয়াতির নফী বা দূরীভূত করার পদ্ধতি হচ্ছে, যিকিরের শব্দ ও অর্থের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করবে, যাতে অন্য কিছুর কল্পনাও অন্তরে উদিত হওয়ার সুযোগ না পায়। এমনকি খাতরাতের মাঝেও শুভাশুভ ভাবতে যাবে না। অর্থাৎ, কোন্‌টা নফ্‌সানী, শয়তানী অথবা মালাকী খাতরা আর কোন্‌টা রাব্বানী তথা আল্লাহ কর্তৃক ইল্‌হাম? এ চিন্তায় পড়বে না। কেবলমাত্র যিকিরের প্রতি ধ্যান নিবদ্ধ রাখবে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "আমি যিকিরকারীদের সঙ্গী।"

যিকির চলাকালীন মহান আল্লাহর তা'যীমের প্রতি অত্যন্ত লক্ষ্য রাখবে। মনে করবে, আমি এক মহান বিশ্ব সম্রাটের সম্মুখে উপবিষ্ট। মুরীদে সাদিক ও খাঁটি আল্লাহ অন্বেষী এক নিমিষেই তাজরীদের দরজায় উপনীত হতে সক্ষম। তাজরীদ হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছুর ধ্যান থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। অবশ্য তাফরীদের দরজায় দীর্ঘদিন যাবত খাওয়াতির নফী বা প্রত্যাখ্যান করতে করতে পৌঁছতে হয়। কারণ, যেসব বাহ্যিক বস্তু মুবতাদির দৃষ্টিগোচর হয় তা সবই তার খেয়ালে অঙ্কিত হয়ে যায়। এরপর যখন সে নির্জনে যিকির আরম্ভ করে তখন সে অঙ্কিত অনুভূতিগুলো তার মোশাহাদার সাথে মিশ্রিত হয়ে সামনে এসে ভীড় করে। এরপর মনের বিবর্তনশীল চিন্তা ও কল্পনা শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসার সাথে যুক্ত হয়ে একাগ্রতা বিনষ্ট করে, হৃদয়ের প্রস্রবণকে ঘোলাটে ও বাতেনকে অস্থির করে তোলে। সর্বোপরি যিকিরের মিষ্টতা ও মোনাজাতের স্বাদ নষ্ট করে দেয়। যেমন- ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, টাকা-পয়সা প্রভৃতি, যেগুলো সে সারা জীবন দেখে আসছে।

যেহেতু এগুলো তার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে তাই যিকিরের সময় এসব কল্পনা উঁকি ঝুঁকি মারে। এমনকি কখনো কখনো নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে যিকির থেকে গাফেল করে ওগুলো অর্জনের প্রতি উদগ্রীব করে তোলে। কখনো অযথা মনযোগ বিঘ্নিত করে যিকিরের স্বাদ ও নূর থেকে বঞ্চিত রাখে। কাজেই, এর থেকে পরিত্রাণ লাভ করার নামই হচ্ছে তাফরীদ যা দীর্ঘকাল সাধনার পরই অর্জন করা সম্ভব।

তবে হ্যাঁ, তাজরীদের মাকাম বলতে মনের ভিতরে এরূপ ভাবান্তরের সৃষ্টি হওয়া যে, মহান আল্লাহ সমকক্ষ সম্মান-শ্রদ্ধা, ভক্তি- মহব্বতের পাত্র ও সর্বোচ্চ কাম্য ও উদ্দেশ্য অন্য কেউ নেই। এটি দ্রুত অর্জিত হয়। কাজেই, সর্বদা মনের চিন্তা দূর করতে থাকবে। কারণ, এটিই খিলওয়াত বা নির্জনবাসের চূড়ান্ত শর্ত ও উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে শয়তানী এল্‌কা রহমানী এল্‌হাম দ্বারা এবং নফ্‌সের কল্পনা রূহ ও কলবের আলাপনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

শর্ত-৭ : পূর্ণ ভক্তিসহ শায়খের সাথে কলবী সম্পর্ক রাখবে

সপ্তম শর্ত হচ্ছে, পূর্ণ ভক্তি সহকারে সর্বদা শায়খের সাথে কলব ও হৃদয়কে জুড়ে রাখবে। কেননা শায়খ হলেন একমাত্র বন্ধু।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরহেযগার হও ও সাদেকীনের বা সত্যবাদীদের সাথে সম্পৃক্ত থাক।" (সূরা তাওবা : আয়াত-১১৯)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"যদি তোমাদের কোন বিষয় অজানা থাকে, তাহলে আহ্‌লে যিকিরকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা নাহল : আয়াত-৪৩)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর ও মহান আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অসীলা তালাশ কর।"

(সূরা মায়েদা : আয়াত-৩৫)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য। তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁর অনুকরণ করবে হক রাস্তা পেয়ে যাবে।"

(আল আযওয়া : ২/১০৭, তুহফাতুল আহওয়াযী : ৩/২৪৯)

বস্তুত প্রকৃত শায়খ তো তিনিই হবেন, যিনি এ পথ ভালো করে দেখেছেন, শুনেছেন। হালাকাত ও ধ্বংসের সম্ভাব্য ঘাঁটি সম্পর্কে অবগত, যাতে মুরীদানকে লাভ, ক্ষতি এবং হেদায়াত ও গোমরাহী হাতে কলমে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কাজেই, এমন মনীষীর সাহচর্য সে সৎ সাথীর সাহচর্যের চেয়ে নিম্ন স্তরের কীভাবে হতে পারে, যার সম্পর্কে খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সৎ সঙ্গীর তুলনা করা যেতে পারে আতর/সুগন্ধি বিক্রেতার সাথে। যদি সে আতর নাও দেয় তবু সুরভী তো অবশ্যই ছড়াবে।

এ শর্ত-৭ এর অধীনে আরো আলোচনা রয়েছে যা শর্ত-২ এ সন্নিবেশিত হয়েছে বিধায় এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

শর্ত-৮ : কখনই আল্লাহর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না

অষ্টম শর্ত হচ্ছে, মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে কখনো আপত্তি উত্থাপন না করা। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা বললেন, আপন পালনকর্তার জন্য তোমার দীনকে খাঁটি কর। তিনি বললেন, আমি খাঁটি করে নিলাম, নিজ গর্দানকে রাব্বুল আলামীনের হুকুমের সামনে অবনত করলাম।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৩১)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিজকে সোপর্দ করল অধিকন্তু সে স্বীয় আমলে একনিষ্ঠ, সে মজবুত হাতল ধারণ করল।" (সূরা লোকমান : আয়াত-২২)

আল্লাহ্ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেন,

وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

"(খন্দকের যুদ্ধে) কাফিরদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে তাঁদের ঈমান ও তাসলীম তথা আত্মসমর্পণের মাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছিল।" (সূরা আহযাব : আয়াত-২২)

অতএব, মুরীদ যখন খিলওয়াত বা নির্জনবাসের সংকল্প করবে তখন তার জন্য উত্তম হচ্ছে, ভালো করে গোসল করা। সে গোসল হবে মৃত্যুর নিয়তে। এরপর মহান আল্লাহর সামনে এরূপ বে-এখতিয়ার হয়ে যাবে, যেমন গোসলদাতার সামনে মৃত ব্যক্তি হয়ে থাকে। রেযা ও তাসলীম তথা সন্তুষ্টি ও সমর্পণের অবস্থা অবলম্বন করে নিজেকে সর্বতোভাবে আল্লাহ্ তায়ালার হাতে সোপর্দ করে দিবে। সর্বোপরি পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা অভ্যাসে পরিণত করবে। স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর বিরুদ্ধে অনুযোগ করবে না। এতে যদি কলবে বস্ত ও প্রশস্ততার অবস্থা দেখতে পাও তবে শোকর আদায় করবে। পরন্তু একীন করবে যে, এর ফায়যান মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হচ্ছে। অনন্তর মুরীদকে আল্লাহর সমীপে এমন থাকা চাই, যেমন রোগী চিকিৎসকের সামনে

থাকে। রোগী যখন জানতে পারে যে, চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, পরিজ্ঞাত, দক্ষ। অধিকন্তু তিনি আমার প্রতি দয়াশীলও তখন সে তার সার্বিক অবস্থাদি তাঁর হাওয়ালা করে দেয়। এরপর ওষুধ, অনুপান তিতা-মিঠা যাই হোক না কেন, কোনরূপ আপত্তি করে না; বরং মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে নেয় ও তাতেই নিজের মুক্তি ও আরোগ্য নিহিত মনে করে।

ঠিক তদ্রূপ মুরীদ যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, পরম করুনাময়, এমনকি মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের চেয়েও অধিক স্নেহপরায়ণ। পরন্ত তিনি আসমান-যমীনের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভালো-মন্দের ইল্‌ম রাখেন, একটি ধুলিকণাও তার নিকট গোপন নয়। এতদসত্ত্বেও বান্দা নিজের ওপর অবিচার করে চলেছে নিরবধি। তার রূহ ও অন্তরাত্মাকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সাথে সাথে নিজের নাজাত, সফলতা ও পরিত্রাণের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন তখন অগত্যা সে নিজের যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করে দেয়, আল্লাহর কাযা ও কদর তথা ফয়সালা ও ভাগ্যলিপির সামনে মস্তক অবনত করে দেয়।

এরপর মহান আল্লাহ যদি তাকে বস্‌ত বা আনন্দ স্ফূর্তি নসীব করেন তবে তার জন্য মনেপ্রাণে শোকর আদায় করবে। পরন্তু নিশ্চিত বিশ্বাস করবে যে, তার কলবের শেফা ও রোগের চিকিৎসা এর মধ্যেই নিহিত। পক্ষান্তরে যদি মহান আল্লাহ্ তাকে কবয তথা অভাব-অনটন দ্বারা পরীক্ষা করেন তখন মনে করবে, আমার অন্তরের সুস্থতা, বাতেনী হালতের ইসলাহ্ ও রোগের নিরাময়ের জন্য এ প্রক্রিয়া অবধারিত।

কবি অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন,

سپردم بتومایہ خویش را   تودانی حساب کم وبیش را

"তোমার কাছে নিজের সারা জীবনের পূজি সোপর্দ করলাম। কম না বেশি সে হিসাবের ভার তোমাকেই দিলাম।"

মহান আল্লাহ বলেন,

عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

"হতে পারে তোমরা কোন বিষয়কে অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার কোন বস্তুকে তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২১৬)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"এতে বিস্ময়ের এমন কী আছে যে, এক বিষয়কে তোমরা অহিতকর মনে করছ অথচ মহান আল্লাহ তাতে রেখেছেন তোমাদের জন্য সমূহ কল্যাণ।" (সূরা নিসা : আয়াত-১৯)

মুরীদের ভিতরে যেসব গুণবৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, তা মূলতঃ তাসলীম ও তাফ্‌বীয তথা সমর্পণ ও সোপর্দের কল্যাণেই সূচিত হয়। ফলশ্রুতিতে সে উপনীত হয় মাকামে কামালে উবূদিয়ত তথা পূর্ণ দাসত্বের স্তরে। অনন্তর এ বুলন্দ মর্তবায় যিনি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন তাকে হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করেই পৌঁছতে হয়েছ। মনে রাখতে হবে, এ সফরের পহেলা কদম ও প্রথম সিঁড়ি হচ্ছে মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার অভিযোগ বর্জন করা। একপর্যায়ে যখন তাসলীম ও সোপর্দ স্তর কিয়ামত দিবসের মত হয়ে যাবে, অর্থাৎ, যখন প্রশ্ন করা হবে, অদ্যকার রাজত্ব কার? নিজের মনকে নিজে এ প্রশ্ন করবে ও নিজেই শুনবে।

সর্ব প্রকার সন্দেহ-সংশয় নিরসণ হবে, কলবের সুবিস্তৃত মাঠে দলে দলে ফেরেশ্‌তা অবতরণ করবে। আল্লাহর রহমতের মেঘমালা আনওয়ারে ইলাহী ও তাজাল্লিয়াতের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকবে। এতটাই পুলকিত, আনন্দিত, পরিতৃপ্ত ও বিচিত্র নেয়ামত পেয়ে ধন্য হবে; যার যথার্থ জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লার জন্য সংরক্ষিত। তার মুখ ও ভাষা মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের বর্ণনা দিতে অক্ষম ও মুক হয়ে অন্তরের ভাষায় বলবে, জনসাধারণ না আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের অনুমান করতে পেরেছে, আর না তাঁর তা'যীমের হক আদায় করতে পেরেছে। এ হচ্ছে কামালিয়ত ও পূর্ণতা, এর নামই রূপলাবণ্য, সৌন্দর্যমাধুরী।

অভিযোগ প্রবণতা ত্যাগ করা

আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ কখনো মুখে আনবে না এমনকি মনেও স্থান দিবে না। এর সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরি ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা, ভয় ও শঙ্কা, ইবাদতে প্রফুল্লতা ও বিষন্নতা, হৃদয়াকর্ষণ ও সন্ত্রস্ততা, মা'রেফত ও প্রেমময়তা, আত্মবিস্মিতি ও স্বীকৃতি, সমক্ষ উপস্থিতি ও হাজেরী, সমীপ্য ও দূরত্ব, চৈতন্য ও অবচেতন, সাধনা ও উদ্ঘাটন, সমীপ্য বসবাস ও গোপন আলাপন, অনাদি ও অনন্ত করুনাধারা, অনন্ত যথার্থতা, দশার ওপর নিয়ন্ত্রণ, আলস্য ও হৃদয়ের কঠোরতা, ইয্যত ও কামাল তথা সম্মান ও পূর্ণতা প্রভৃতি যে কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক না কেন, প্রফুল্লচিত্তে তা মেনে নিবে। রাব্বানিয়ত ও আল্লাহ্মুখিতার জ্যোতি এবং ওয়াহ্দানিয়ত ও একত্বের নূরের কল্যাণে মহান আল্লাহর অপার রহমত ও করুনার আঁচলে আশ্রয় নিবে। অনন্তর মহান আল্লাহ এতই রহীম ও করীম যে, তিনি নিজেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে সুমহান চরিত্রের ইফাযা ও উদ্ভাস ঘটিয়েছেন। আবার নিজেই তার প্রশংসায় সিক্ত হয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কলম : আয়াত-৪)

হযরত ওয়াসেতী রহ. এর নিকট একদা প্রশ্ন করা হলো, সমগ্র মানুষের মাঝে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কী? তদুত্তরে তিনি বললেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আত্মা সমগ্র সৃষ্টিজগতের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। বাদবাকী সবকিছুই তার পরে। কালের পরিধি বেশি লাভ করার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ্ মোবারক আখলাক, চরিত্র ও অন্যান্য নান্দনিক গুণাগুণে সবচেয়ে বেশি পরিপক্বতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে হয়নি।

হাদীস শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি তখন থেকে নবুয়তের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছি, যখন আদম আ. পূর্ণরূপে সৃষ্টি হননি।"

কোন কোন শায়খ বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত মানুষের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের চেয়ে অধিক অনুরাগী ও আকর্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কারো হৃদয়কে পাননি বিধায় তাঁকে এত দ্রুত মিরাজ তথা উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণের বিরল সম্মানে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ, নবুয়তের দশম বর্ষে দুনিয়াতে অবস্থান কালেই তাঁকে এ পরম সৌভাগ্য দান করেছেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অদম্য বাসনা ও উদগ্র আগ্রহের দরুণ তাঁকে আপন দর্শন ও সরাসরি আলাপনের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

"মহৎ চরিত্রে পূর্ণতা বিধানই আমার আবির্ভাবের প্রধান লক্ষ্য।" (মুস্তাদরাকে হাকেম : ৪/২০)

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! দীন কী জিনিস? এতদুত্তরে তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "উত্তম আখলাক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার চরিত্র।"

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

"সর্বোত্তম মুমিন সে ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" (তাবরানী : ৮/১৪২)

ইসলাম মূলত যাবতীয় মহৎ গুণবৈশিষ্ট্য, অনুপম চরিত্র, আদব ও শিষ্টাচারে বেষ্টিত একটি সর্বজনীন ধর্ম। এ গুণগুলো অবলম্বন না করে ইসলামের পূর্ণতা ও সুফল লাভ করা সম্ভব নয়।

অতএব, সালেক যখন শানে তাসলীম তথা সমর্পণ যোগ্যতায় সমৃদ্ধ ও পরিপক্ব হবে তার ভিতরে মুসলমানী ও উন্নত আখলাক সৃষ্টি হবে ফলে আলোচ্য উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ্।

সম্পূরক পর্যালোচনা

জেনে রাখা উচিত, আলোচ্য আটটি শর্ত পালন করতে পারলে মানবীয় মৌলিক উপাদানগুলো পরিস্কার হয়ে যাবে। রাব্বুল আলামীনের অমুখাপেক্ষী দরবার পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি সৃষ্টি হবে। তাযকিয়া ও ইখলাস বা আত্মার সংশোধন ও পরিমার্জণের যোগ্যতা যেহেতু আগইয়ার অর্থাৎ, নিজের ওজুদ বা জৈবিক অস্তিত্ব এবং নফ্‌স ও শয়তানকে দমন করা ছাড়া অর্জিত হয় না, তাই এসব শর্ত বর্ণিত হল। কারণ, এগুলো ছাড়া সে তিনটি বস্তু প্রতিহত করা যায় না।

অজূদ একটি গভীর অমানিশার নাম; যা পানি, মাটি, বায়ূ ও আগুন এ চার উপাদান দ্বারা গঠিত। মোজাহাদার মাধ্যমে এগুলো পবিত্র করা জরুরি। বস্তুত নফ্‌স হচ্ছে মানব দেহের অভ্যন্তরে গাঢ় কালো ও অন্ধকার অতি সূক্ষ্ম বায়ুবীয় একটি উপাদান। রিয়াযত ও মোজাহাদার মাধ্যমে এর পরিশীলন আবশ্যক। শয়তান কুফরের তমসাচ্ছন্ন একটা ঘোলাটে অগ্নিময় বস্তু। মানবদেহে যতদূর পর্যন্ত রক্ত প্রবাহ সক্রিয়, ততদূর তার আনাগোনা। কাজেই, তাকে বহিস্কার করা একান্ত জরুরি।

কিমিয়া বা পরশমনির মত এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আলোচ্য তিন আঁধার থেকে লতিফায়ে নূরকে বের করে আনে। কারণ, পৃথিবীতে আগমনের পর যখন থেকে বিবেক-বুদ্ধি হয়েছে, তখন থেকেই তাতে নানা ধরণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সব চিত্র পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন, ফলে হৃদয়ে মরিচা ধরে যায়, অলসতা ও উদাসিনতা সৃষ্টি হয়। আর তাই তো খিলওয়াত, যিকির, রোযা, তাহারাত, শওক, সুকূত, নিরবতা খাওয়াতির ও খাতরাত বিদূরণ, তাওহীদে মতলব ও রব্‌ত অর্থাৎ, একক শায়খের প্রতি হৃদয়ের নিবিষ্টতা ও তৎসঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা হৃদয় দর্পণের মরিচা পরিস্কার করতে হয়।

কারণ, যিকির হচ্ছে আগুন, রেত অথবা কামারের হাপর তুল্য। আর খিলওয়াত হচ্ছে লোটা বা পাত্র তুল্য আর রোযা হচ্ছে পরিষ্কারক যন্ত্র। নিরবতা, খাতরা দূরীকরণ, সালেকের আত্মিক সংযোগ হচ্ছে শাগরেদ ও কারিগর আর তাওহীদে মতলব ওস্তাদতুল্য। বান্দা যখন এ সকল শত নিয়মিত পালন করে, তখন তার হৃদয়ে মাইয়্যাত ও শুহূদ তথা অনন্ত সঙ্গ সমক্ষ উপস্থিতির জ্যোতি ও নূর উদ্ভাসিত হয়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

"তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা হাদীদ : আয়াত-৪)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ

"তোমরা যেদিকেই ফিরবে সেদিকেই মহান আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বা বিরাজমান।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১১৫)

অনুচ্ছেদ-৭

সব সময় সালেককে ইবাদতে ব্যস্ত থাকতে হবে

প্রতি মুহূর্তে সালেক কোন না কোন ইবাদতে ব্যস্ত থাকবে। এর সাথে একীন করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার থেকে সামান্য ইবাদতেরও হিসাব নিবেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا

"যদি সরিষার দানা পরিমানও কোন আমল হয় আমি তাও হাজির করব।"(সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৪৭)

কয়েকটি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ মাকাম হাসিল হয়। যথা-

১. তওবা : তওবা অর্থ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বা রুজু' থাকা। অত্যধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করতঃ আল্লাহর সমীপে অনুতপ্ত থাকা।

২. ইনাবত : অর্থাৎ, গাফেলতি ও উদাসিনতার পর যিকিরের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কোন কোন সূফী বলেন, যাহেরী রুযু' এর নাম হচ্ছে তওবা যা মূলত বাতেন থেকেই উৎসারিত হয়।

৩. ইফ্‌ফাত : অর্থাৎ, কাম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা।

৪. ওয়ারা': অর্থাৎ, সে সকল বস্তু এড়িয়ে চলা, যেগুলো বান্দাকে মহান আল্লাহকে থেকে দূরে রাখে। হযরত ইব্‌রাহীম ইবনে আদহাম রহ. বলেন, হারাম প্রতি বিমুখ থাকা ফরয অথচ হালালের প্রতি বিমুখতা ফযীলত ও মর্যাদার কারণ। অধিকন্তু সংশয় ও সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বিমুখ থাকা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের বিষয়।

৫. ইরাদা : অর্থাৎ, সর্বদা পরিশ্রম করা ও আরাম বর্জন করা।

৬. ফকর : অর্থাৎ, নিজের মালিকানায় কোন বস্তু না রাখা, যা নেই সে ব্যাপারে একেবারে চিন্তামুক্ত থাকা। অর্থাৎ, কোনো হস্তমজুদও রাখবে না, আর না থাকবে কোনো বস্তু অর্জনের মোহ ও না পাওয়ার ব্যথা।

৭. সিদ্‌ক : সিদ্‌ক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাহের-বাতেন তথা ভিতর-বাইর বরাবর হওয়া। এ মাকাম হাসিল করার জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে যাহেরে বাতেনে ইস্তেকমাত ও দৃঢ়তার সম্পর্ক রাখা জরুরি।

৮. তাসাব্বুর : তাসাব্বুর অর্থ নফ্‌সকে তবীয়ত বিরুদ্ধ, অপছন্দনীয়তার কষ্ট ও তিক্ততা সহনে অভ্যস্ত করা।

৯. সবর : সমগ্র মাখলূকের ব্যাপারে শেকায়েত ও অভিযোগ বর্জন করা।

১০. রেযা অর্থাৎ, মুসীবতের স্বাদ উপভোগ করা।

১১. ইখলাস : ইখলাস বলতে খালেক বা স্রষ্টার সঙ্গে একান্ত মোয়ামালা রাখা। অর্থাৎ, মাঝখানে মাখলূকের কোন দখল না থাকা। লোকেরা ভালো-মন্দ যাই বলুক না কেন তায়া'ত ও আনুগত্যে হ্রাস-বৃদ্ধি না হওয়া।

১২. তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুল হচ্ছে ওয়াদা ও হুমকির বিষয়ে কেবল তাঁর ওপর ভরসা করা। সাথে সাথে গায়রুল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ ও নির্ভীক থাকা।

অনুচ্ছেদ-৮

কথা কেবল জনসাধারণের উপকারের নিয়তে বলবে

মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, কোনো কথা বললে তা নসীহত, হেদায়াত ও সর্বসাধারণের উপকারের নিয়তে বলবে। সাথে শ্রোতার ধারণ ক্ষমতা ও বুঝশক্তির প্রতিও যত্নবান থাকতে হবে। যে প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়নি অযথা তা টানবে না। কেউ প্রশ্ন করলে প্রশ্নকারীর বোধবুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিবে। হযরত জোনায়েদ রহ. কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, একই প্রশ্ন বিভিন্ন জনে করলে আপনি বিভিন্ন রকম উত্তর দেন, এর কারণ কী? বললেন, এটি প্রশ্নকারীর বুঝের পার্থক্যের দরুণ হয়ে থাকে।

অতএব, যে যতটুকু বুঝে তাকে ততটুকুই বলা উচিত। প্রশ্নকারীর আপন যোগ্যতা মাফিক প্রশ্ন করা উচিত। তার বাইরে প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

কোন কোন সূফী একথাও বলেছেন, নিজের যোগ্যতার অতীত বিষয়ে প্রশ্ন করা জায়েয। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বহু ফিক্‌হ (জ্ঞানের কথা) এর বাহক এমন রয়েছেন, যার নিজের কাছে সে বাণী বোধগম্য না হলেও হতে পারে, যার কাছে পৌঁছানো হয় সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।"

সুতরাং যদিও সে কথা শ্রোতার বোধের উর্ধ্বে হয়, তথাপি হতে পারে উত্তরটি শুনে রাখলে অন্যরা তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

কখনো অপাত্রে ইল্‌ম দান করবে না। অবশ্য কারো কারো অভিমত, পাত্র-অপাত্র যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই। যে শিখতে আসবে তাকেই শিখাবে। কারণ, দীনে ইল্‌ম এমনিতেই অপাত্রে যাবে না। কাজেই অযোগ্যের তা অর্জনের সুযোগ নেই।

নিজের চেয়ে জ্ঞানে বড় ব্যক্তির সম্মুখে বসে কথা বলা ঠিক নয়। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ, এর উপস্থিতিতে কেউ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের নিকট একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওস্তাদের সম্মুখে বসে আমি কথা বলতে অপারগ।

কেউ কেউ বলেছেন, তাসাউফ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করা কেবল এমন ব্যক্তির জন্য শোভা পায়, যিনি সাহেবে হাল ও ভুক্তভোগী। অধিকন্তু তিনি নিজের হালত, অবস্থা ও আমলের কথা বর্ণনা করবেন। নিছক নাকেল ও অনুবৃত্তিকারীর জন্য এ আলোচনা শোভা পায় না। কথা বলার উপযুক্ত সময় হওয়ার পূর্বে কথা বলবে না। কারণ, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকা বেশি।

দুনিয়াদারের নিকট কখনো সম্মানিত হওয়ার প্রত্যাশা করবে না। অন্যথায় আপন ইল্‌ম দ্বারা কখনোই উপকৃত হওয়া যাবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজাতীয় ইল্‌ম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ওলামায়ে কেরামকে দেখানো, নির্বোধ জনসাধারণকে সমবেত করা ও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করে, সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা খুঁজে নেয়।

যত শিখবে সে অনুযায়ী আমল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আহলে ইল্‌মগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিখে তদানুযায়ী আমল করে, উক্ত ইল্‌ম তার দিলে গিয়ে হিকমতে পরিণত হয়। অন্যরাও তা শুনে লাভবান হয়।

পক্ষান্তরে যে আমল করে না, সে যেন কতক কল্পকাহিনী ঠোঁটস্থ করছে, যা অচিরেই ভুলে যাবে। মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, যে কথা বক্তার হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়, তা অবশ্যই শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে থাকে। আর যে ইলম কেবল মুখে আওড়ানো হয়, তা শ্রোতার কর্ণ অতিক্রম করে না।

জেনে রাখা উচিত, যার অন্তরে সুলূক ইল্লাল্লাহ এর বীজ অঙ্করিত হয়, অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার সদিচ্ছা জাগ্রত হয়, অবশ্যই তার হেফাযত করা উচিত। কারণ, নেকির ইচ্ছাই এক প্রকার গায়েবী মেহমান, আসমানি অতিথি, যা সামান্য অবহেলা ও অবমূল্যায়ন দেখলে অসন্তুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাত বিদায় নেয়। পরে আর ফিরে আসে না। কাজেই এ মূল্যবান মেহমানের কদর করবে। তার সামনে রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন করবে। যা সে আনন্দচিত্তে খেয়ে হজম করতে সক্ষম হয়। বস্তুতঃ এমন সুখাদ্য শায়খে তরীকতের দরবার ব্যতীত অন্যত্র মিলবে না। কারণ, মুরীদের অন্তরে উদ্ভূত সৎ ইচ্ছার বীজ হচ্ছে নবজাতক শিশুর মত। অদৃশ্য জগত থেকে সবেমাত্র আবির্ভাব।

অতএব, তার খাদ্য মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। এমনকি বাজারের দুধও নয়। অনুরূপ নেক ইরাদার যে নূর তাওফীকে এলাহীর সাহায্যে মুরীদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে তার তরবিয়ত ও লালন-পালন ও প্রকৃতদাতা আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী ঝর্নার পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হতে পারে না। অনন্তর গায়বের র্ঝনা হচ্ছেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে ধন্য এ সকল শায়খ, যাঁদের ওপর আল্লাহ্ তায়ালার ফায়েয ও ইরাদতের বারিধারা বর্ষিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাঁরা আল্লাহ্‌র আহ্‌ল হয়ে গেছেন।

"আওয়ারিফুল মায়ারিফ" গ্রন্থে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা আমার সিনায় যাকিছু দান করেছেলেন, আমি তা আবূ বকর সিদ্দীককে অর্পণ করেছি।"

সুতরাং যার কলবে আল্লাহ প্রাপ্তির ইচ্ছা বিদ্যমান তার জন্য নিজের রায় ও বিবেকের ওপর তুষ্ট না হয়ে আলোচ্য গুণাবলিসম্পন্ন কোন আহলুল্লাহ শায়খের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া আবশ্যক। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম যেখানেই তিনি অবস্থান করুন না কেন তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ, তাঁর কোনো বিকল্প নেই। এ ধরণের শায়খের সন্ধান লাভের পর তাঁর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করবে।

কোন ইচ্ছা, এখতিয়ারই নিজের হাতে রাখবে না। অধিকন্তু সবসময় সোচ্চার থাকবে। শয়তান যতই কুমন্ত্রণা দিক না কেন- আল্লাহ জানেন, এ শায়খ কামিল কী-না? কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও এ ওয়াসওয়াসাকে অন্তরে স্থান দিবে না; বরং বলিষ্ঠ পৌরুষ ও উন্নত আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তা প্রতিহত করতে হবে। সর্বোপরি নিম্নোক্ত হাদীসটি স্মরণ রাখবে, "তোমরা শুন ও আনুগত্য কর, যদি তোমাদের শাসক কুৎসিত হাবসী ক্রীতদাসীও হয়।"

এজন্য কোন অবস্থাতেই নিজেকে নিজের এখতিয়ারে রাখবে না; বরং শায়খের তাবে' হয়ে থাকবে। কারণ, সূফিয়ায়ে কেরাম কামালে ইরাদতের গুরুত্ব ও শায়খের বিরুদ্ধাচারণের পরিণতি ও ভয়াবহতা বুঝাতে গিয়ে এতদূর উক্তি করেছেন, মুরীদের নিজ স্বাধীন থাকার চেয়ে একটি বিড়ালের অধীনে থাকাও উত্তম। তবে হ্যাঁ, শায়খের যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো তাঁর ভিতরে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে কী-না তা অবশ্যই যাচাই করে নিবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করার জন্য প্রেরণ করেছেন। পরন্তু তাঁকে নিজ গুণে সঠিক পথের হাদী ও প্রদর্শক বানিয়েছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

وَاِنَّكَ لَتَهۡدِیۡۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

"হে মুহাম্মদ! আপনি সত্যিই সিরাতে মুস্তাকীম ও সরল পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।" (সূরা শূরা : আয়াত-৫২)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি হেদায়াতের দীপ্তিমান রবি হয়ে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছেন। এরপর তার তিরোধানের পর এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে গেছেন। তাঁরা সুচারুরূপে এ মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় কিয়ামত অবধি প্রত্যেক যুগে একের পর এক দাওয়াতী কাফেলা আগমন করতে থাকবে আর এ প্রক্রিয়ায়ই দাওয়াতের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন তারকাতুল্য। তাঁদের মধ্যে যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।" (আহকাম ফী উসূলিল কুরআন : ১/৪৪৫)

বস্তুত হেদায়াতের এ অমূল্য রত্ন কেবল সে ব্যক্তির নিকট থাকবে, যিনি রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে নীচ পর্যন্ত মধ্যবর্তী ওয়াসিতা ও সূত্র সমূহ থেকে যাহেরী ও বাতেনী ইল্‌মের উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এরপর যে ব্যক্তি এ ধরণের শায়খের সন্ধান পেয়ে যাবে এবং শায়খও তাকে আপন মুরিদ/মুজাহিদ হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। তার জন্য শায়খের যাহেরী ও বাতেনী ইহ্‌তেরাম করা একান্ত কর্তব্য। এতে কোন ত্রুটি করা যাবে না।

যাহেরী এহ্‌তেরাম

কখনো শায়খের সাথে কথাকাটাকাটি বা বিতর্কে জড়াবে না। তাঁর থেকে যাকিছু শুনবে নিশ্চিত ভুল মনে হলেও তাঁর সাথে এ নিয়ে কথা বাড়াবে না। কারণ, শায়খের দৃষ্টি তার দৃষ্টির চেয়ে অনেক উর্ধ্বে, শায়খের ইল্‌ম তার ইল্‌ম অপেক্ষা অনেক গভীর ও পূর্ণাঙ্গ। শায়খের সামনে জায়নামাযে বসবে না। তবে হ্যাঁ, কেবল নামাযের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা উঠিয়ে নীচে বসবে।

শায়খের সামনে নফল নামায পড়বে না। তিনি হুকুম করলে তা যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করবে। কোনো ত্রুটি করবে না। শায়খের জায়নামায মাড়াবে না। তাঁদের সম্মুখে মারেফতপন্থীদের স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ করবে না। শায়খের চেহারার দিকে বারবার তাকাবে না। তাঁর সাথে আচার-ব্যবহারে নিসংকোচ প্রফুল্লতা ও স্বাধীনভাব প্রকাশ করবে না। অনুমতি পেলে ভিন্ন কথা। শায়খের তবিয়তের ওপর বোঝা হয় এমন কাজ করবে না। সবসময় নত শির হয়ে বসবে। শায়খের সামনে বসে কারো দিকে তাকাবে না। এতে গাফেলতি ও অমনোযোগিতা সৃষ্টি হয়।

বাতেনী এহ্‌তেরাম

বাতেনী এহতেরাম হচ্ছে, কোন ব্যাপারে শায়খের কথায় আপত্তি করবে না। যাহেরের মত বাতেনেও কথা-কাজ, চালচলন তথা সর্বদিক থেকে শায়খের প্রতি আদবের লেহায রাখবে। অন্যথায় এটা হবে মোনাফেকি ও কপটতা। নিজের মনে কোন সন্দেহ বা উৎকণ্ঠা থাকলে তা স্পষ্ট করে বলবে। এতে আল্লাহ্‌র ফযলে বাতেনও যাহেরের অনুকূল হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে যেসব ওয়াক্তের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যিকির ও নফল দ্বারা সে সময়গুলো আবাদ ও সমৃদ্ধ রাখবে।

ফযীলতপূর্ণ কয়েকটি সময় হচ্ছে-

১. ইশরাক : সূর্যোদয় থেকে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উর্ধ্বে ওঠা পর্যন্ত ইশরাকের ওয়াক্ত। এ সময় চার রাকায়াত নামায এক রেওয়ায়েত মতে দু' রাকায়াত নামায পড়া মোস্তাহাব।

২. চাশ্‌ত : এর ওয়াক্ত হচ্ছে ইশরাকের পর থেকে যাওয়াল অর্থাৎ, পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলে পড়ার আগ পর্যন্ত। এসময় নামায পড়া সুন্নত বা মোস্তাহাব। রাকায়াত সংখ্যা দু' থেকে বারো পর্যন্ত হতে পারে।

৩. যাওয়ালের নামায : সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর এর ওয়াক্ত হয়। তখন চার রাকায়াত (এক রেওয়ায়েতে দু' রাকায়াত) নামায পড়া সুন্নত বা মোস্তাহাব।

৪. মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় : তখন দু' দু' রাকায়াত করে ছয় রাকায়াত নামায আদায় করবে। বিশ রাকায়াত পড়তে পারলে অতি উত্তম। একে সালাতুল্ আওয়াবীন বলা হয়। এ নামায হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এরপর হুযূরে কলবের সাথে জলী অথবা খফী যিকিরে মনোনিবেশ করবে।

৫. রাতের বেলা তের রাকায়াত নামায আদায় করবে : এর মধ্যে তিন রাকায়াত বিতির। বাদবাকী রাকায়াতসমূহ তাহাজ্জুদের নামায। তাহাজ্জুদের নামাযের সর্ব নিম্ন পরিমাণ দু' রাকায়াত।

তাহাজ্জুদের নামায পড়ে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যিকিরে কাটাবে। আবার ফজরের নামায পড়ে ইশ্রাক পর্যন্ত যিকিরে রত থাকবে। এ ছাড়া দু' রাকায়াত তাহিয়্যাতুল অযূ এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকায়াত তাহিয়্যাতুল মসজিদও নিয়মিত আদায় করবে। আসরের পর তাহিয়্যাতুল অযূ নামায পড়া ওলামায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন। অবশ্য কোন কোন মাশায়েখ জায়েযও বলেছেন।

সারকথা, যে ব্যক্তি উপরোক্ত আটটি শর্ত ঠিকমত পালন করবে, এ সকল ওয়াক্তের আদব-লেহায করবে সে অবশ্যই মুখলেস হয়ে যাবে ইন্শাআল্লাহ। তার ওপর শয়তান প্রাবল্য বিস্তার করতে পারবে না। তিনি খাস আল্লাহ্ওয়ালা ও জান্নাতী মানুষে পরিণত হবে। কারণ, আহ্লে সুলূকের নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম আজই প্রস্তুত। কিয়ামতের দিন সৃষ্টি হবে এমন নয়। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে।

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي

"হযরত আবূ বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল রা.কে ডেকে পাঠালেন। এরপর বললেন, কোন আমল তোমাকে আমার আগেই জান্নাতে প্রবিষ্ট করল? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি, আমার সামনে সামনে তোমার হাটার শব্দ শুনতে পেয়েছি। এমনকি গত রাতে জান্নাতে প্রবেশ করেও আমার সামনে সামনে তোমার হাটার শব্দ শুনতে পেয়েছি।" (তিরমিযী : ৫/৩৯১)

অন্য হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি জান্নাতে গিয়ে একটি অট্টালিকা দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এ'টি কার? বলা হল ওমরের। তখন ওমরের গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়ে গেল তাই ভিতরে প্রবেশ করলাম না।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

"আমি আবূ তালেবের টাখনু পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত দেখেছি। আমি যদি তার ভাতিজা না হতাম, তাহলে জাহান্নামের গর্ত হত তার নিবাস।"

অনুচ্ছেদ-৯
আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতের বর্ণনা

জেনে রেখ, আউলিয়ায়ে কেরামের বড় কারামত হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসে যে সকল গায়েবী বিষয়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ, আখেরাত, জান্নাত, জান্নাতের ওয়াদা, জাহান্নাম ও তার হুমকি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের ঈমান শুহূদী ও প্রত্যক্ষ দর্শনের পর্যায় হয়ে থাকে। নফ্স কখনই সেটা ইন্কার বা অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি পরকালীন বিষয়ে শয়তান তাঁদের ভিতরে কোন ধরণের সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা এপর্যায়ের করা হয় যে, যদি অদৃশ্যের পর্দা অপসারিত হয়ে জান্নাত-জাহান্নাম চোখের সামনে হাজির হয়, তবুও তাঁদের একীন বিন্দু পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না। তাঁরা সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, মহান আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। তাঁর কুদরত কখনো হিকমত শূন্য নয়।

মনে রাখতে হবে, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তাসদীক ও সত্যায়নের পর্যায় না পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকীকত ও গুঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাবে না।

হযরত হারেছা রা. সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হারেছা! কী অবস্থায় তুমি প্রভাত করলে? তিনি আরয করলেন, হুযূর! খাঁটি ঈমানী অবস্থায় আমার রাত কেটেছে। প্রত্যুত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখ, যা বলছ, ভালো করে বুঝে-শুনে বল। যে কোন দাবির বাস্তবতা থাকে। বল, তোমার দাবির সে বাস্তবতাটি কী? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার নফ্সকে দুনিয়া থেকে বিমুখ রেখেছি। দিনের বেলা রোযার মাধ্যমে তাকে ক্ষুধার্ত ও রাতে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে বিনিদ্র রেখেছি। আমি যেন আল্লাহর আরশ আমার সামনে বাস্তব উপস্থিত দেখছি। (যেমন কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে।) আরো দেখতে পাচ্ছি, জান্নাতবাসীগণ পরস্পর সাক্ষাত করে আনন্দে মাতোয়ারা। জাহান্নামীরা পরস্পর একে অপরকে ভর্ৎসনা করছে, ধিক্কার দিচ্ছে। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ।

হযরত হারেছা রা. এর প্রস্থানের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হারেছার হৃদয়কে মহান আল্লাহ আপন নূরে নূরান্বিত করে দিয়েছেন।

ফায়দা

স্মর্তব্য, যিকিরকারীর অন্তরে নূর অনুপ্রবেশ করেছে। এর আলামত হচ্ছে, তার মধ্যে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার ভাব থাকে না। শরহে সদর ও হৃদয়ঙ্গম হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে, ক্রমেই তার অন্তর হতে ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়ার আসবাবপত্রের মোহ কমতে থাকে। যিকির দ্বারা এতমিনান ও প্রশান্তি লাভের চিহ্ন হচ্ছে, যিকিরের গলবা ও প্রাবল্যের মুহূর্তে হৃদয়ে যে নূর প্রবেশ করেছিল, তার দ্বারা তার চক্ষু শীতল হবে।

নিঃসন্দেহে প্রতিটি রূপের একটি মর্ম ও তত্ত্ব আছে, প্রতিটি অনুভূতিলব্ধ বিষয়ের তাত্ত্বিক অস্তিত্ব ও সকল বাহ্যিক বস্তুর আলমে গায়বে একটি রূপক অস্তিত্ব থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব স্বীকার করে কিন্তু বাহ্যিক অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, সে মুলহিদ ও ধর্মদ্রোহী। যে বাহ্যিক অস্তিত্বের জন্য আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব অস্বীকার করে তার অস্তিত্ব পঙ্কিল, কর্দমাক্ত। যে যাহের ও বাতেন, বাহির ও অভ্যন্তর উভয়ের সমন্বয়কারী। অধিকন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াবলির ক্ষেত্রেও তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে পৃথিবীতে থেকেই আলমে গায়ব ও অদৃশ্য জগত অধ্যয়ন করেন, তিনি হচ্ছেন প্রকৃত সূফী, সুন্নী ও সঠিক পথের অভিযাত্রী।

মাযহাবের ইমামগণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তবে আমল যে কোনো এক মাযহাবের ওপর করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেক মাযহাবকে হক জানবে।

তাওহীদ ও রেসালাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির কোন আপত্তিকর মন্তব্যের যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো ব্যাখ্যা করা সম্ভব অপব্যাখ্যা করবে না। তাকে নিন্দাবাদ ও তিরস্কার করবে না।

মনে রাখতে হবে, শায়খ হওয়ার একমাত্র তিনিই উপযুক্ত যিনি মোজাহাদার মাধ্যমে নফ্সকে আদব ও চিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে কষ্ট ও তিক্ততা সহনে অভ্যস্ত বানিয়েছেন। সর্বোপরি সালেহীন ও খাঁটি আল্লাহ্ওয়ালা আকাবিরের খেদমতে কিছুদিন আদব সহকারে নতজানু হয়ে বসেছেন ও তাঁদের সোহবতে ধন্য হয়েছেন, দীনের

হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান, সীমারেখা, মাযহাবের উসূল ও ফু'রূ' জেনে মাকামাত আলিয়া বা সম্মানের উঁচ্চ স্তরসমূহ অতিক্রম করে উর্ধ্বে চলে গেছেন।

পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ সকল গুণ অনুপস্থিত তার জন্য শায়খ ও পীর হওয়া হারাম। কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি নিজের আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নফ্সের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রিপূ নির্ণয় ও অনুভব করতে অক্ষম এবং সাধনা করে আলোচ্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করেনি তার অনুকরণ করা জায়েয নয়।

অতএব, মুরীদকে সর্বাগ্রে এ বিষয়গুলো জানতে হবে। তারপর নিজের নিরলস মোজাহাদা ও অক্লান্ত সাধনার মাধ্যমে নফসের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও হ্রাস-বৃদ্ধি কী রয়েছে সেগুলো তালাশ করতে হবে। অবশেষে যে হালত ও অবস্থা সামনে আসবে তা শায়খের সামনে পেশ করবে। কথিত আছে, "যে ব্যক্তি আপন রোগ ও শারীরিক সমস্যার কথা ডাক্তারের কাছে খুলে বলে না সে নির্বোধ।"

এরপর ক্রমান্বয়ে সামনের মাকাম ও মনযিলের দিকে অগ্রসর হবে। এক মাকামের আদব পুরোপুরি আয়ত্ত না করে দ্বিতীয় মাকামের দিকে পা বাড়াবে না। যেমন- মাকামে ওয়ারা' থেকে ফারেগ না হয়ে যুহ্দ অর্জনের চেষ্টা করবে না। এভাবে আমল করতে থাকলে একসময় তাঁর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উন্মেষ ঘটবে।

জনৈক সূফী বলেছেন, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হরকত ও সঞ্চালনের মাধ্যমে যে আমল হয়, তার চেয়ে কলবের সঞ্চালনের মাধ্যমে আমল করা বহুগুণে শ্রেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যদি আবূ বকর রা. এর ঈমানকে ওজন করা হয় তবে সমগ্র বিশ্ববাসীর ঈমানের চেয়ে তা ভারী হবে।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "আবূ বকর রা. অত্যধিক নামায, রোযা করার কারণে সবার ওপর এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেননি; বরং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ কেবল একীন ও বিশ্বাস, যা তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে।" এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর যে পরিমাণ স্থিরতা, দৃঢ়তা, ইস্তেকামাত ও অবিচলতা হযরত আবূ বকর রা. দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন, দ্বিতীয় কেউ তা পারেনি। তাই তো আবেগঘন পরিস্থিতিতে তিনি মিম্বরে ওঠে হাম্দ ও সালাতের পর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দিলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত করত, সে যেন ইসলাম থেকে ফিরে যায়। মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। যে আল্লাহর ইবাদত করে সে যেন অবিচল থাকে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না কখনই।

এছাড়া আবূ বকর রা. তৎকালীন মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হযরত ওসামা রা. এর বাহিনী, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতার দরুণ রওয়ানা হতে পারেনি, তাদের অভিযানে পাঠিয়ে দিলেন। অথচ সকল সাহাবায়ে কেরাম এ বলে তাঁকে বাধা দিচ্ছিলেন, এদেরকে দ্রুত অভিযানে পাঠালে মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কিন্তু তিনি সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে বাহিনী বের করেই দিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাতে দীন হেফাযতের ব্যবস্থা করলেন।

মুরীদের কর্তব্য হচ্ছে, সে তার যাহেরকে অযীফায় মগ্ন ও বাতেনকে ইরাদাতে ব্যাপৃত রাখবে। এতে হৃদয়ে আল্লাহর তরফ থেকে ওয়ারিদাত তথা বিভিন্ন বিষয় উদিত হতে থাকবে। সে সময় সে ইরাদাত ছেড়ে একমূখী হয়ে মহান আল্লাহর তাওফীকে ওয়ারিদাতে মনোনিবেশ করবে। যেমন- আবূ সোলায়মান দারানী রহ. বলেন, যখন মোয়ামালা কলব পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ আরাম করতে থাকে।

অতএব, সব সময় বাতেনকে আবাদ রাখা, হালত দশায় ব্যাপৃত থাকা, আসরার ও বাতেনী রহস্যপুঞ্জ সংরক্ষণ করা। অধিকন্তু নিজ শ্বাস-প্রশ্বাস গণনায় মনোনিবেশ করা অত্যন্ত জরুরি। যথা- সূফিগণ বলেছেন, যে ফকীর ও আল্লাহপ্রেমিকের ইবাদত হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ খাতরাসমূহ প্রতিরোধ করা। এটি একটি সার্বক্ষণিক বাতেনী আমল ও অভ্যন্তরীণ কর্ম।

কোন কোন শায়খ বলেছেন, যে মুরীদকে নফ্সের বাসনা, নফ্সের স্বাদ ও উপভোগে লিপ্ত দেখ সে মিথ্যাচারী। আর যে প্রশংসা-নিন্দা ও গ্রহণ-বর্জনের মাঝে পার্থক্য করতে না পারে, তাকেও মিথ্যুক মনে করবে।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. বলেন, যদি এসব চিহ্ন ও লক্ষণ না থাকত তবে তো সে সুলূকের দাবী করে বসত।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

"হে মুহাম্মদ! আপনি ললাট দেখে অবশ্যই মুনাফিকদেরকে চিনতে পারবেন। আরো চিনতে পারবেন তাদের আওয়াজ শুনে অর্থাৎ, তাদের কাজ-কর্ম, কথাবার্তা সবকিছুই কুফর ও নিফাকের প্রমাণ বহন করে।

মুরীদের অন্তরে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকা অপরিহার্য যে কোন মর্তবা, মাকাম, হালত এমনকি কোন ইবাদতই ইখলাস অর্জন ও রিয়া বর্জন ব্যতিরেকে শুদ্ধ হয় না।

এটিও অত্যন্ত জরুরি যে, সালেক সর্বক্ষণ নফ্সের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, তার আখলাককে ভালোভাবে যাচাই করতে থাকবে। কারণ, নফ্স কখনো গোনাহ্ ছাড়া নেকের হুকুম করে ন। তাই মা'রেফতের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পরেও নফ্সের ব্যাপারে শংকামুক্ত হবে না।

কারণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বড় রাসূল ও আরেফ হওয়া সত্ত্বেও নফ্সের পর্যবেক্ষণ, নযরদারি করতেন কঠিনভাবে। তার অনিষ্ট থেকে সবসময় পানাহ চাইতেন।

হযরত আলী রা. বলেন, নফ্সের সাথে আমার ব্যবহার রাখালের মত। আমি তাকে একদিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসলে সে অন্যদিকে ছুটতে থাকে।

হযরত আবূ বকর ওয়ার্রাক রহ. বলেন, নফ্স প্রতি মুহূর্তে রিয়াকার ও লৌকিকতাপ্রিয় তো আছেই। অনেক সময় সে মুনাফিক আবার কোন অবস্থায় মুশরিক পর্যায় পৌঁছে যায়। মুশরিক হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আপন ইচ্ছাশক্তি ও চাহিদার ক্ষেত্রে সে নিজকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও অংশীদার দাবি করতে চায়। এককথায় আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের থেকে যেরূপ তা'রীফ ও স্তুতি চান, ঠিক তদ্রূপ নফ্সও মানুষের প্রশংসা কামনা করে থাকে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আমার আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা কর না।"

নফ্সও নিজের জন্য এ শান পছন্দ করে।

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ, "তোমরা আমাকে ভয় কর ও আমার প্রতিই আশা রাখ।"

নফ্স স্বয়ং সে আশা ও ভয়ের আধার হতে চায়। নফ্সের শির্ক বলতে একেই বোঝানো হয়েছে। বস্তুত তা মুনাফিকী ও রিয়া হওয়ার বিষয়টি এত স্পষ্ট, যা ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, মানবদেহের ভিতরস্থ একটি লতিফার নাম নফ্স। এটি নানা ধরণের বদ স্বভাবের আঁকর। দৈহিক অবকাঠামোর আরেকটি লতিফার নাম রূহ, যা সমূহ সৎ গুণবৈশিষ্টের উৎস। যেমন- নাক ঘ্রাণ শোঁকার, কান শ্রবণ ও চোখ দেখার মাধ্যম। মাশায়েখ ইযাম এমন কথাও বলেছেন যে, রূহ ও আত্মা হচ্ছে সকল খায়ের বা কল্যাণের খনি। বস্তুত বিবেক হচ্ছে, রূহ ও আত্মার সৈনিক। আল্লাহর তাওফীক হচ্ছে রূহের মদদদাতা। কলব হচ্ছে বিজয়ী সৈনিকের তাবে' বা অনুগামী।

খারাবি বা অনিষ্ট প্রবল হলে কলব খারাবির আকরে পরিণত হয়। যদি খায়ের ও কল্যাণ জয় লাভ করে, তাহলে কলবও তদ্সঙ্গে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ-১০

দেহের অভ্যন্তরীণ স্তর এবং মুরীদের দৃষ্টি কোথায় থাকবে ও কখন সে ইবাদতের যোগ্য হবে

যে মুরীদ তওবার স্তর পরিশুদ্ধ করে ওয়ারা' বা তাকওয়ায় পরিপক্বতা লাভ করে যুহ্দ তথা দুনিয়াবিমুখতার স্তরে কদম রেখেছে, এরপর রিয়াযত ও মোজাহাদা দ্বারা স্বীয় নফ্সকে তরবিয়ত দিয়ে পরিশীলিত করেছে, তাকে শায়খ ও পীরের তরফ থেকে খেরকা, খেলাফত ও এজাযত দেয়া যেতে পারে। তবে খেরকা ও খেলাফতের মর্যাদা রক্ষা করে চলা অত্যন্ত জরুরি।

জেনে রাখা উচিত, যাহের ও বাতেন এতদুভয়ের সমষ্টিক নাম মানুষ। এর মধ্যে প্রত্যেকটির লেবাস-পোশাক ভিন্ন ভিন্ন। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

"তাকওয়ার লেবাসই সর্বোত্তম।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৬)

মোটকথা, মানুষের যাহের অর্থাৎ, দেহ ও শরীরের লেবাস হচ্ছে যা শরীয়ত অনুমোদন করেছে, নিজের সামর্থ অনুযায়ী যোগাড় করা সম্ভব। যেমন- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো প্রশস্ত হাতার জুব্বা পরিধান করতেন আবার কখনো সংকীর্ণ হাতার জামা পরতেন। কখনো পরতেন মূল্যবান জামা ও চাদর, আবার কখনো মোটা ও খসখসে কাপড়। এ তো গেল দেহের বহিরাংশ ও তার লেবাসের আলোচনা।

অনুরূপ মানব দেহের অভ্যন্তরে কয়েকটি বস্তু আছে; যথা-

১. নফ্স : তার লেবাস হচ্ছে শরীয়ত। অর্থাৎ, হালাল-হারাম, বৈধাবৈধ সকল হুকুম-আহ্কামের কক্ষ, সে শরীয়তের তাবে' ও অধীন থাকবে।

২. কলব : তার লেবাস হচ্ছে তরীকত।

৩. সির্‌র : হাকীকত ও মৌলিকত্বে প্রবেশ হচ্ছে এর লেবাস।

৪. রূহ ও আত্মা : তার লেবাস উবূদিয়ত বা একনিষ্ঠ দাসত্ব।

৫. খফী : তার লেবাস মাহ্‌বূবিয়ত ও প্রেমাস্পদতা।

অনন্তর মানুষের অন্যান্য হিজাব ও আচ্ছাদন সম্পর্কে অতীতে আলোচনা হয়েছে।

সারকথা, আল্লাহ্ তায়ালা যাকে শরীয়তের এত্তেবা' ও আনুগত্যের তাওফিক দান করেন, সে কামালে উবূদিয়ত ও পরিপূর্ণ দাসত্বের স্তরে পৌঁছে যায়, অধিকন্তু উবূদিয়তের দরুণ আল্লাহর নূরে রূহ্ তথা আত্মার জ্যোতির্ময়তা আচ্ছাদন থেকে তাকে মুক্তি দেন। পরিশেষে সে কামালে মাহ্বূবিয়ত ও পরিপূর্ণ প্রেমাস্পদতার বিরল সম্মানে বিভূষিত হন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, তোমরা যদি মহান আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তবে আমার অনুকরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে নিবেন।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

যথাযথভাবে শরীয়তের আনুগত্য করতে পারলে আল্লাহর ইচ্ছায় অমানিশার যাবতীয় পর্দা সরে যাবে। পরিণামে মানুষ মুখলিস ও আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যায়, শরীরের কদার্যতা, রূহের আকাশচারিতা থেকে পরিত্রাণ পায়। ফলশ্রুতিতে উঁচু থেকে উঁচুতর মাকামে উত্তীর্ণ হয় এবং

فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

"পরম ক্ষমতাধর সত্ত্বা সমীপে সত্যের মহাসনে সে সংবর্ধিত ও অভিনন্দিত হয়।" (সূরা কামার : আয়াত-৫৫)

এটি হচ্ছে হযরত খিযির আ. এর সে কথার মর্ম, "সূফীর অন্তর না যমীনে সংকুলান হয়, না আসমান তাকে আবৃত করতে পারে।"

মোটকথা, শরীয়তের অনুসরণ হচ্ছে দেহ বা বাহ্যিক রূপ। উবূদিয়ত হচ্ছে তার হাকীকত বা প্রাণ। এতদুভয় বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করা দুনিয়া ও আখেরাত কোথাও সম্ভব নয়। বস্তুত মহান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ শরীয়তের বিরোধিতা করতে পারে না। বিরোধিতাকারীর জন্য চরম লাঞ্ছনা অবধারিত। যেমন- বালয়া'ম বাউরা, বারসীসা প্রমূখের ঘটনা সর্বজন বিদিত।

রাব্বুল আ'লামীন! উন্নতির পরে অবনতি থেকে আমাদের রক্ষা কর। স্বভাব ও চরিত্রের কর্তৃত্ব থেকে যাহের ও বাতেন। অর্থাৎ ভিতর ও বাইরকে সংরক্ষণ করতে হবে। সর্বোপরি শরীয়তের পথ থেকে কেশাগ্র পরিমাণও বিচ্যুতি গ্রহণযোগ্য নয়।

রাব্বুল আ'লামীন! যাহেরে, বাতেনে, কথায়, কাজে এবং ইবাদত ও আদতে সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণরূপে আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমীন!

জেনে রাখা দরকার, বাতেনী হারাকাত ও আত্মোপলব্ধির পিছনে আরো পর্দা, আরো আচ্ছাদন রয়েছে। নফ্সের আচ্ছাদন হলে, প্রবৃত্তি, স্বাদ, উপভোগ লালসা ও কলবের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ধ্যান ও কল্পনাই বড় অন্তরায় (পর্দা)। আকল ও বিবেকের জন্য আচ্ছাদন হচ্ছে বোধিত বিষয়সমূহের মাঝে নিবদ্ধ থাকা।

অনন্তর সির্‌র এর পর্দা হচ্ছে, আসরার ও লব্ধ রহস্যে অবরুদ্ধ থাকা এবং রূহের পর্দা হচ্ছে মোকাশাফাত বা হৃদয়ের তথ্যজ্ঞান। খফীর জন্য পর্দা হচ্ছে আযমত ও কিবরিয়া বা মহত্ব ও বড়ত্ব। প্রকৃতপক্ষে কামেল সে সালেক যে এর কোনটির প্রতিই দৃষ্টিপাত করে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের সফরে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার অসংখ্য নাজ-নেয়ামতের প্রতি একটি বারের জন্যও নজর দেননি। সবসময় একমাত্র মহান প্রেমাস্পদের জামাল ও সৌন্দর্য দর্শনে বিভোর ও তন্ময়াবিষ্ট ছিলেন। মহান আল্লাহ বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেন,

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى

“আবৃতকারী বস্তুসমূহ যখন সিদ্‌রাকে আবৃত করে রেখেছিল তখন আমার হাবীব তাঁর আসল প্রেমাস্পদ থেকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি সরাননি।” (সূরা নাজম : আয়াত-১৭)

বস্তুত মানুষ জ্ঞানী ও আল্লাহর তাওফিকপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যতক্ষণ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণও দুনিয়ার খেয়াল অন্তরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। উল্লেখিত পর্দাসমূহ দুনিয়ার অন্তর্ভূক্ত।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ঈসা আ. একটি কাঁচা ইটের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জাগ্রত হওয়ার পরে শয়তানকে শিয়রে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কাছে কেন? শয়তান বলল, আপনাকে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য এসেছি। হযরত ঈসা আ. বললেন, হে মালাউন! আমি রূহুল্লাহ আর তুই মরদূদ আযাযিল। আমার ব্যাপারে তুই এ দুঃসাহস কীকরে পেলি? বলল, সাহসের মূল হচ্ছে, আপনার নিকট আমার একটি বস্তু রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কী? বলল, আপনার মাথার নিচের ইটটি।

একথা শুনার সাথে সাথে হযরত ঈসা আ. ইটটি দূরে ছুড়ে ফেলেন। তাৎক্ষণিক শয়তানও পালিয়ে গেল। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন।

বড় চিন্তার বিষয় হচ্ছে, দুনিয়ার সাথে সামান্য সম্পর্কও মানুষের জন্য কতটা বিপজ্জনক। সাথে সাথে শয়তানের দুঃসাহস অনেক বাড়িয়ে দেয়। এরপর সে হামলা করতে দ্বিধাবোধ করে না।

অনুচ্ছেদ-১১
তরীকতের যাহেরী ও বাতেনী রোকন এবং সালেকের শ্রেণিবিন্যাস

জেনে রেখ, তাসাউফ ও তরীকতের যাহেরী রোকন বা বাহ্যিক স্তম্ভ পাঁচটি; যথা-১. খেদমত, ২. হুরমত, ৩. খিলওয়াত, ৪. সোহবত ও ৫. হিম্মত।

অনুরূপ বাতেনী রোকন বা অভ্যন্তরীণ স্তম্ভও পাঁচটি; যথা- ১. আমল, ২. ইল্‌ম, ৩. হালত, ৪. কলব ও ৫. মা'রেফত। কোন কোন সূফী বলেছেন, তাসাউফের প্রথম ভাগ ইল্‌ম, মধ্যম ভাগ আমল ও শেষ ভাগ হচ্ছে আ'তায়ে ইলাহী বা আল্লাহর বিশেষ দান। ইল্‌মের অর্থ হচ্ছে পর্দা ওঠে সালেকের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়া। আর আমল হচ্ছে এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। আ'তায়ে ইলাহীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সে আমলকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া।

আল্লাহর পথের পথিকগণ তিন প্রকার; যথা-

এক. মুরীদে তালেব বা অন্বেষী।

দুই. মুতাওয়াস্‌সিত সা'য়ের বা ভ্রমণকারী।

তিন. মুন্তাহী ওয়াসিল বা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত।

বস্তুত মুরীদের আসল অবস্থান হচ্ছে, সে রিয়াযত ও মোজাহাদা করবে, নফ্‌সের বিলোপ সাধন ও পতনের পথ আঁকড়ে ধরবে। ভোগ, লালসা ও অভিলাষ পুরোপুরি ত্যাগ করবে। না হলেই নয় এমন কতক হক ব্যতীত বাদবাকী সবকিছু একেবারে ছেড়ে দিবে।

ভ্রমণকারী ও মধ্যম পর্যায়ের সালেক হচ্ছে, যে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বড় ধরণের ঝুঁকি মাথায় নিবে। সর্বাবস্থায় একনিষ্ঠ তলবের প্রতি যত্নশীল থাকবে, প্রতিটি মাকাম ও স্তরের আদব রক্ষা করে চলবে। বস্তুত মুন্তাহী বা

চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, হুশ, চৈতন্য ও ইস্তেকামাতের সাথে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের হক আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা করা। সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, আনুকূল্য-প্রতিকূলতা প্রভৃতি যে কোনো পরিস্থিতিতে এক অবস্থার ওপর অনড় ও অটল থাকবে। অর্থাৎ, তার আহার-ক্ষুধা, শয়ন, জাগরণ সব বরাবর হবে। ভোগাসক্তি ও সৌখিনতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে কেবল মূল হকগুলোর সাথে দায়সারা গোছের আচরণ করবে।

বাহ্যত তাকে লোকজনের সাথে দেখা গেলেও তার অন্তর থাকবে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। বস্তুত এসব হালত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে হেরাগুহায় নির্জনবাস অবলম্বন করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি দায়ী ইলাল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহভোলা জনগোষ্ঠিকে আল্লাহর দিকে ডাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হত তিনি মাখলূকের সঙ্গে আছেন, অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তাঁর জালওয়াত, খিলওয়াত, সঙ্গীহীনতা ও জনসঙ্গতা বরাবর ছিল। আহলে সুফ্ফা বা সুফ্ফায় অবস্থানকারী সাহাবায়ে কেরামও মা'রেফতে স্থির থেকে আমীর-ওমারা বা শাসক ও মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মানবসংশ্রব তাঁদের রূহানিয়ত বা আধ্যাত্মিক উচ্চ স্তরে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বা তাঁদের ক্ষতি করতে পারেনি।

আদব রক্ষা করা

বলাই বাহুল্য, আদবের ওপর সমগ্র তাসাউফ নির্ভরশীল। হযরত আবূ আবদুল্লাহ ইবনে খফীফ রহ. বলেন, হযরত ওয়ায়েম রহ. আমাকে নসীহত করেছিলেন, বৎস! নিজের আমলকে লবণের মত ও আদবকে আটার মত বানাও। অর্থাৎ, আমলের অপরিহার্যতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু আদবের প্রতি তদাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেয়া চাই। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, তাসাউফ পুরোটাই আদব। প্রতিটি মুহূর্ত ও স্তরের ভিন্ন ভিন্ন আদব রয়েছে। অনন্তর যে ব্যক্তি সে আদবগুলো শক্তভাবে পালন করতে সক্ষম হবে, সে নিশ্চিত আহলুল্লাহর মর্যাদা লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত রইল, সে নিকটে থেকেও বহুদূরে। কবুলিয়তের প্রবল আশার কেন্দ্রে আগমনের পরেও প্রত্যাখ্যাত।

প্রবাদ আছে, "বেয়াদব বেনসীব" অর্থাৎ বেয়াদব ভাগ্যাহত, কপাল পোড়া, সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আহ্লে তাসাউফ তথা তরীকত পন্থীদের পথ বড় ভয়াবহ, বন্ধুর, বড় পিচ্ছিল। এ পথে সামান্য আদবের খেলাফ হলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই সুফিয়ায়ে কেরাম দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী এমনকি নিজের জীবন ও স্ত্রী-সন্তানের চিন্তা পর্যন্ত অন্তরে স্থান দেন না। কারণ, এসব জিনিসের খেয়াল করলে স্বভাবতই তার প্রতি মন দূর্বল হয়ে পড়ে। বস্তুত গায়রুল্লাহর প্রতি আকর্ষণ হাজারো অনিষ্টের কারণ।

হযরত জোনায়েদ রহ. কে একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল, সূফী কারা? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, সূফীগণ হলেন, এমন সম্প্রদায় যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবকূলের মধ্য থেকে বাছাই করে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যদি তাঁদেরকে গোপন রাখেন তবে বন্ধু হিসেবে, আর প্রকাশ করলেও বন্ধু হিসেবেই প্রকাশ করেন।

একদা হযরত ইব্নে আ'তা রহ. কে জিজ্ঞেস করা হল, তাসাউফ কী জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, তাসাউফ স্বভাবের স্বচ্ছতা ও প্রকৃতির পবিত্রতার নাম, যা মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকে। ওই সদ্ব্যবহারের নাম, যা মানুষের বাইরকে পরিবেষ্টন করে রাখে।

হযরত উয়ায়ম রহ. একদা হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, সূফীর সিফাতে যাতী বা সত্ত্বাগত গুণ কী? তিনি বললেন, সাবধান! হে আবূ মুহাম্মদ! কী বলতে চাও বল, কিন্তু তাদের যাতী সিফাত সম্পর্কে জানতে চেয়ো না। অবশেষে তার উপর্যুপরি পীড়াপীড়ি দেখে বলতে বাধ্য হলেন, আসল সূফীগণকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউই চিনে না। এটিই বাস্তব কথা।

হযরত সোহায়েল তস্তরী রহ. বলেন, মহান আল্লাহর নিবিড় সঙ্গ লাভের অপর নাম তাসাউফ। যে সম্পর্কের কথা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।

সূফিয়ায়ে কেরামের আখলাক

সহনশীলতা, কল্যাণকামিতা, পরহিতৈষণা, সৃষ্টির প্রতি দয়া, নম্রতা, ইহ্সান, পরোপকার, নিজের ওপর পরস্বার্থ প্রাধান্য দেয়া, খেদমত, মানুষকে ভালোবাসা, হাসিখুশি থাকা, দানশীলতা ও বদান্যতা, অর্থ ও সম্মানের প্রতি নির্মোহতা, মানবতা, পৌরুষ, ক্ষমা, মীমাংসাপ্রিয়তা, বিশ্বস্ততা, লজ্জাশীলতা, শান্তশিষ্টতা, বেশি বেশি দোয়ায় অভ্যস্ত হওয়া, উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া, নিজেকে তুচ্ছ জানা, অন্য ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, আকাবির ও মাশায়েখের তা'যীম করা, ছোটদের প্রতি সদয় থাকা, নিজের ইহ্সানকে ছোট ও পরের ইহ্সানকে বড় করে দেখা।

হযরত সোহায়েল তস্তরীর রহ. নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সচ্চরিত্রের অর্থ কী? তিনি বললেন, নিম্নস্তরের সচ্চরিত্র হচ্ছে, অপরের দেয়া পীড়া সহ্য করা ও প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে বরং যালেমের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা। পরন্তু নিম্ন স্তর হচ্ছে যুলুম থেকে ফিরে আসার জন্য তার পক্ষে দোয়া করা।

হযরত ইবনে মোবারক রহ. বলেন, উত্তম চরিত্র হচ্ছে, সদা হাস্যোজ্জল থাকা, কাউকে কষ্ট না দেয়া এবং তার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, উদারচিত্তে সকলকে মার্জনা করা।

মা'রেফত মর্মার্থ

মা'রেফত অর্থ আল্লাহর পথের সন্ধান লাভ করা। মা'রেফত দু' প্রকার; যথা-এক. এস্তেদলালী ও দুই. শুহূদী।

এক. এস্তেদলালী মা'রেফত : অর্থাৎ, পার্থিব বস্তুসমূহ অবলোকন করে ওয়াজিবুল উজূদ তথা অবশ্যম্ভাবী সত্ত্বা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের পরিচয় লাভ করা।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ

"অচিরেই আমি তাদেরকে আমার কুদরতের নিদর্শনাবলি দেখাবো দিক-দিগন্তে এবং তাদের সত্ত্বার মাঝে।" (সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৫৩)

মা'রেফতের এ স্তরটি ওলামায়ে রাসেখীন তথা দক্ষ আলেমগণের। তাঁরা কুদরতের নিদর্শন দেখে স্রষ্টাকে চিনতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সে মা'রেফত ওই ব্যক্তির সাধিত হয়ে থাকে, যাঁর ওপর গায়েবী কতক বিষয় কাশ্ফ হয়েছে। যাতে তিনি বস্তুজগতের যাহের ও বাতেন উভয়ের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার পবিত্র সত্ত্বার ওপরে দলিল স্থাপন করতে পারেন। কারণ, মহান আল্লাহ যাহের ও বাতেন উভয় জগতকে আপন সত্ত্বার পরিচয়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, যে ব্যক্তি কেবল যাহেরী আলম তথা এ ভৌতজগতের বিষয়াবলি দ্বারা প্রমাণ পেশ করবে তার প্রমাণ অপূর্ণ। যেমন- নফ্সের কথা ধরা যাক, তার দু'টি দিক রয়েছে; যাহের ও বাতেন। যে ব্যক্তি নফ্সের যাহের দ্বারা দলিল পেশ করে, বাতেন দ্বারা দলিল পেশ করতে অপারগ, তার দলিলও অসম্পূর্ণ থাকবে।

অতএব, নফ্সের বাহ্যিক দিক দ্বারা দলিল দেয়ার সাথে সাথে আখলাক, চরিত্র পরিশীলন ও অলঙ্কৃত করার চেষ্টা করবে। যাতে তার সম্মুখে আলমে মালাকূত তথা রহস্যময় আদি ভৌতিক জগতের রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যদি আদম সন্তানের কলবের আশেপাশে শয়তানের আনাগোনা না হত, তাহলে তারা সরাসরি আসমানী সম্রাজ্যের রহস্যাভাণ্ডার অবলোকন করতে পারত। ভালো করে বুঝে নাও, যার বাতেন বা অন্তরদেশ মা'রেফতের নূর দর্শনে উদ্ভাসিত ও আলোকিত নয়, তার বাহ্যিক চক্ষুদ্বয় সুস্থ থাকলেও আসলে সে অন্ধ।"

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ; বরং অধিক পথভ্রষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৭২)

সুতরাং যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে মনোযোগ দেয়, তাওফিকে এলাহী তার সঙ্গে থাকে না। মা'রেফতে এলাহী বা মহান প্রভুর পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তার হয় না। পার্থিব সুখাভিলাষ দেখে আল্লাহ তাকে দূরে ফেলে দিয়েছেন। পরন্তু শাশ্বত ও অনাদী গুণরাজি দর্শন থেকে বঞ্চিত করেছেন।

দুই. শুহূদী ও বদীহি মা'রেফত : অর্থাৎ, চিন্তা ও যুক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে প্রথমবারেই যা অর্জিত হয়।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

"আপনার পালনকর্তা কী যথেষ্ট নন কী? তিনি সকল বস্তুর ওপর চক্ষুষ্মান।" (সূরা ফুস্সিলাত : আয়াত-৫৩)

এটি হচ্ছে আহ্লে মোশাহাদা ও সিদ্দীকিনের মা'রেফত। এতে কুদরতের অপার নিদর্শনাবলির অভ্যন্তর থেকে বস্তুর দলিল স্থাপন করা হয়। জনৈক বুযুর্গের প্রসিদ্ধ উক্তি, সবকিছুর পূর্বে আমি আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখেছি। এ প্রকারের মা'রেফতকে একীন ও ইহ্সান নামেও অবিহিত করা হয়। মহান রাব্বুল আলামীনের আদি সত্ত্বা থেকে এঁরা সৃষ্টিজগতের জ্ঞান লাভ করেন, সৃষ্টিজগতের মাধ্যমে খালিক ও মহান স্রষ্টার ইল্ম হাসিল করেন না।

বর্ণিত আছে, হযরত দাঊদ আ. এর ওপর একদা ওহী আসল, হে দাঊদ! মা'রেফত কাকে বলে, জান কী? তিনি আরয করলেন, রাব্বুল আলামীন! আমার জানা নেই। ইরশাদ হল, আমার দর্শনে অন্তর জিন্দা ও প্রাণবন্ত থাকার নামই মা'রেফত।

হযরত আহমদ ইবনে আসিম আনতাকী রহ. বলেন, অন্য কারো ওপরে নয়, কেবল এক ব্যক্তির ওপর আমার ঈর্ষা হয়, যিনি আল্লাহ্ তায়ালার মা'রেফত অর্জন করেছেন। আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনা, আরেফীন ও মুহিব্বীনের স্তরের মা'রেফত হাসিল না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়। বস্তুত আমি মা'রেফতে তাসদীক বা একীনের প্রত্যাশী।

হযরত ওয়াসেতী রহ. বলেন, মা'রেফত অর্থ ইন্দ্রীয় উপলব্ধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ দর্শন করা আর খবর হচ্ছে সংবাদের মাধ্যমে কোন বিষয় অবগত হওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, মা'রেফত এমন ইল্মকে বলা হয়, যা গাফেলতি ও উদাসীনতার পর অর্জিত হয়। এ কারণেই মহান আল্লাহর শানে মা'রেফত শব্দের ব্যবহার প্রযোজ্য নয়। তাই তো আল্লাহকে আরেফ বলাও সমীচীন নয়। কেননা, আল্লাহ তো স্বীয় ইল্মে কাদীমের কারণে অনাদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সমভাবে আলীম ও সর্বজ্ঞাত। কালের আবর্তণে তাঁর অজ্ঞতা ও গাফেলতি কল্পনাতীত।

হযরত সোহায়েল তস্তরী রহ. বলেন, আ'রেফের কর্মপন্থা হচ্ছে, নিজের নফ্সকে আবর্জনা, কদার্যতা ও নাপাকী থেকে পবিত্র করে মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনে সদা প্রস্তুত থাকবে।

সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করবে। সর্ববিষয়ে আদবের প্রতি পূর্ণ খেয়াল করে চলবে ও নিয়তকে সহীহ ও নির্ভেজাল রাখবে। অনন্তর স্বীয় পবিত্র নফ্সকে রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে মোকার্রাব ও নৈকট্যশীল বানানোর প্রয়াসে ব্যপৃত থাকবে।

হযরত ইবনে আতা রহ. বলেন, মহান আল্লাহর সাথে অত্যন্ত উঁচু সম্পর্ক রাখবে। আল্লাহর পূর্ব প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ নিয়ে অত্যন্ত গভীর চিন্তা-ফিকির করবে। ফলশ্রুতিতে সেগুলো নজরে এত বড় লাগবে, যার তুলনায় অন্য সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। এমনকি বাতাসে ওড়া, পানির ওপর হাঁটাও কোন বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হবে না। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিটি কাজই এত আশ্চর্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর যে, কোন বস্তুই তার চেয়ে বেশি চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর হতে পারে না।

হযরত শিবলী রহ. কে জিজ্ঞেস করা হল, মা'রেফত কী? তিনি উত্তর দিলেন, যখন আল্লাহর সাথে তোমার ব্যবহার এরূপ হবে যে, নিজের আমলের প্রতিও তোমার নজর যাবে না। গাইরুল্লাহর দিকে তোমার মোটেই চোখ উঠবে না। তখন তুমি কামেল ও পূর্ণাঙ্গ মা'রেফতের অধিকারী বিবেচিত হবে।

মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, দুনিয়াতে আল্লাহর মা'রেফত ও পরিচয় লাভের যে পদ্ধতি, আখেরাতে আল্লাহ্ তায়ালার দীদারের পদ্ধতিও ঠিক তদ্রূপ হবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে আরেফ আল্লাহ তায়ালার মহান সত্ত্বা ও তার অসীম অস্তিত্বকে বেষ্টন করতে অক্ষম। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা দিক, সীমা, পরিসীমা, পরিমণ্ডল ও সসীমতা থেকে মুক্ত। ঠিক তদ্রূপ আখেরাতের দর্শকরাও কোন পরিবেষ্টন ছাড়াই আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন লাভ করবে।

বস্তুত ইদরাক হচ্ছে মূল সত্ত্বা আবেষ্টন করা। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে সে কথাই বলেছেন,

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

"চক্ষুসমূহ তাঁর পবিত্র যাতের ইদরাক করতে পারে না।" (সূরা আনয়াম : আয়াত-১০৩)

মানুষের দৃষ্টি আল্লাহর পবিত্র যাতের গভীরে পৌঁছতে অপারগ।

মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, আল্লাহর মা'রেফত যার হাসিল হয়নি, তার জন্য চুপ থাকা জরুরি। অসম্ভব কী? অজ্ঞতাবশত আদবের খেলাপ কোন বাক্য মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, সারা জীবন চেষ্টা করেও যার ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে না। বস্তুত যার মা'রেফত হাসিল হয়ে যায় তার তো এমনিতেই নীরবতা এসে যায়। কারণ, নিরাকার সত্ত্বার কোনো বর্ণনাই সে দিতে পারে না। এ কারণেই মাশায়েখে তরীকতের উক্তি, "যে আল্লাহর পরিচয় পেয়েছে সে নির্বাক ও বোবা হয়ে গেছে।"

জনৈক শায়খকে প্রশ্ন করা হল, মা'রেফতের তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গ লাভ করা। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. বলেন, শুন, যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, ক্ষুধার যাতনা ও নির্জনতার কষ্ট তার কাছে ভিড়তে পারে না। কেননা, সে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গেই আছে। পরন্তু তাঁর মধ্যেই বিলীন ও তার মহব্বতে বিহ্বল।

কোন কোন সূফীর বর্ণনা, আরেফ হচ্ছে এমন মহামনীষী যার হৃদয়ে সুমহান সত্ত্বার মা'য়ারিফ ও জ্ঞানভাণ্ডার নিরন্তর উদ্ভাসিত হতে থাকে, গাফেলতি ও উদাসীনতা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যায়। হযরত ওমর রা. এর থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "সব বস্তুর একটি খনি থাকে, আরেফের হৃদয় হচ্ছে তাকওয়ার খনি।"

সর্বোপরি তিনি অপার ইরফান ও অভিজ্ঞানের ধারক। এ কারণেই তাঁকে আরেফ বিল্লাহ বলে অভিহিত করা হয়।

অনুচ্ছেদ-১২

উসূলে দীন বা দীনের মূলনীতি ও ইলমের স্তর

প্রকাশ থাকে যে, দীনের উসূল তথা মূলনীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সালেকের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যাতে তার মা'রেফত, উবূদিয়ত ও ইবাদত সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে আমার বান্দা! তুমি পরহেযগারী অবলম্বন কর আমার পরিচয় পেয়ে যাবে। ক্ষুধার্ত থাক আমাকে দেখতে পাবে। নফ্সের হাত থেকে স্বাধীন ও মুক্ত হও তবে মা'রেফত, উবূদিয়ত, ইবাদত তথা আমার গোলামীর স্তরে উপনীত হতে পারবে।"

সূফিয়ায়ে কেরামের নিকটে দীনের উসূল বা মূল বিষয় ছয়টি; যথা-

১. ইসলাম, ২. বিশুদ্ধ ই'তিকাদ, ৩. ঈমান, ৪. ঈকান, ৫. মা'রেফত ও ৬. তাওহীদ।

ইসলামের বাহ্যিক বিষয় পাঁচটি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ মূলের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত; যথা-

এক, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

দুই. নামায কায়েম করা।

তিন. যাকাত আদায় করা।

চার. মাহে রমযানের রোযাব্রত পালন করা।

পাঁচ. সামর্থ থাকলে হজ্জ করা।

ইসলামের হাকীকত বা তত্ত্ব হচ্ছে, এক নূর বা জ্যোতি যা মুমিনের সিনায় প্রদান করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

"যার বক্ষ মহান আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে আল্লাহর নূরের মধ্যে বিরাজ করছে।"
(সূরা যুমার : আয়াত-২২)

যখন ইসলামের হাকীকত ও তত্ত্ব আল্লাহ প্রদত্ত নূর বা দ্যুতি স্থির হলে ও ইসলামের বাহ্যিক স্তম্ভ পাঁচটি। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, 'মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের পূর্ণতা ও খাঁটি মুসলমানিত্বের সুফল হচ্ছে, মানুষ তার অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। বস্তুত ই'তিকাদ হচ্ছে এক নূর বা আলোবিশেষ, যার অবস্থান হৃদয়ের গহীনে। সে নূর অন্তর জগত হতে সংশয়ের যাবতীয় অমানিশা দূর করতে থাকে।

মনে রাখতে হবে, নিজের খেয়াল-খুশি মত একটা ধারণা হৃদয়ে লালন করলেই সেটা ই'তিকাদ বা বিশ্বাস বলে গণ্য হবে না; বরং গ্রহণযোগ্য হতে হলে তা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে' তাবেয়ীনের আকায়েদ ও বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে নিঃসন্দেহে।

সেমতে আল্লাহ সম্পর্কে তা'তীল বা নিষ্কর্মতা, ইলহাদ বা নাস্তিকতা, তাশবীহ বা কোন বস্তুর তুল্যরূপ ধারণা, জিস্‌ম বা দৈহিক গঠন, হুলূল বা অনুপ্রবেশ ও ইত্তিহাদ বা একাত্মতা অর্থাৎ, সকল সৃষ্টির ভিতরে তিনি প্রবিষ্ট প্রভৃতি সবই বিদ্‌য়াতী ও বিপথগামীদের আকীদা। মহান আল্লাহ এ বিভ্রান্তি থেকে আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

সুতরাং যে সকল আকীদা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের তিন সোনালী যুগের ইজমা অনুযায়ী নিষ্পন্ন হবে সেগুলো সঠিক। অন্যথায় ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ তিন সোনালী যুগের প্রশংসায় বলেছেন,

"সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, এরপর তার পরবর্তী (তাবেয়ীনের) যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী (তাবে' তাবেয়ীনের) যুগ।"

সত্যের অনুকূল ই'তিকাদের নাম ইল্‌মে রাজেহ, যার লয় নেই, ক্ষয় নেই। এ ইল্‌মের হাকীকত সে নূর বা জ্যোতি যা কলবে অবতীর্ণ হয়। জ্ঞাত বিষয়ের সাথে এর কিরনের সম্পর্ক হচ্ছে দৃশ্যমান বস্তুর সাথে চোখের জ্যোতির সম্পর্কের মত। এ ইল্‌ম মিশকাতে নবুয়ত তথা নববী দীপশিখার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার কলবে অবতীর্ণ হয়। অনন্তর এ নূর নিজ শক্তি ও স্তর অনুযায়ী বান্দাকে আল্লাহর মা'রেফতে যাতী বা সত্ত্বাগত অভিজ্ঞানের দিকে, অথবা আল্লাহর অবিনশ্বর মা'রেফতে সিফাতী ও গুণগত অভিজ্ঞানের দিকে, অথবা হুকমে ইলাহী (শরীয়ত) এর দিকে সুতীব্র আকর্ষণ করতে থাকে।

মনে রাখতে হবে, এ ইল্‌মের **স্তর তিনটি**; যথা-

১. ইল্‌মুল একীন : (দলিল প্রমাণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।)

২. আইনুল একীন : (মোশাহাদা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।)

৩. হক্কুল একীন : (দর্শন ও শ্রবণ ছাড়াও যে জ্ঞান স্পর্শ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।)

উদহারণ স্বরূপ : সমুদ্রের পানির জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকেরই আছে। এটি হচ্ছে ইল্‌মুল একীন। সে পানি প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে আইনুল একীন, যার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। পরন্তু সমুদ্রের পানিতে ডুব দেয়া বা তাতে গোসল করার সুযোগ তো অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এ সৌভাগ্য একেবারে নগণ্য সংখ্যক মানুষের হয়ে থাকে। এটি হক্কুল একীন।

ইলমে লাদুন্নী

মহান আল্লাহ হযরত খিযির আ. সম্পর্কে বলেন,

وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

"আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে ইল্‌ম দান করেছি।" (সূরা কাহাফ : আয়াত-৬৫)

এ ইল্‌মের মর্ম হচ্ছে, মহান আল্লাহর পবিত্র যাত ও সিফাতের সন্দেহাতীত মা'রেফত ও অভিজ্ঞান অর্জিত হওয়া, যাতে কলব তা প্রত্যক্ষ করার স্বাদ অনুভব করে।

ইল্‌মে একীন খাঁটি সহীহ ঈমানেরই বাস্তব প্রতিফলন। ঈমানের বিশুদ্ধতা ছাড়া এপর্যায়ের ইল্‌ম আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কলবের পবিত্র প্রান্তরে ঈমানী ফসল উদগত না হওয়া পর্যন্ত বক্ষের সুপরিসর ময়দানে ইল্‌মে একীন কখনো দীপ্তিমান হয় না।

ঈমান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পয়গাম/বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তা সবই সত্য জানা ও আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত ও একত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

অনন্তর ঈমানের হাকীকত ও মূল তত্ত্ব হচ্ছে সে নূর, যা মুমিনের কলবে আসন গ্রহণ করে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ

"তাদের অন্তরে ঈমান অবধারিত করে দেয়া হয়েছে।" (সূরা মুজাদালা : আয়াত-২২)

রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের মধ্যে বলেন,

"ঈমানদার সে লোক, যার প্রতিবেশী তার থেকে শংকামুক্ত থাকে।"

এ জাতীয় হাদীসের মধ্যে ঈমানের পূর্ণতা ও তার ফলাফলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঈমান ২ প্রকার; যথা-

১. আতায়ে খোদাওয়ান্দী বা আল্লাহর দান : আলোচ্য আয়াতে হৃদয়ে ঈমান লিপিবদ্ধ করণ দ্বারা এ প্রকার ঈমান উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. কাসবী বা উপার্জিত ঈমান : বান্দা যা মেহনত মোজাহাদা করে অর্জন করে। আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান বান্দার মেহনতের কারণে শক্তিশালী হয়।

কসবী ঈমানের অপর নাম হচ্ছে, তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা। এটি বান্দার নিজস্ব কর্ম ও ক্রিয়া। যদি তাওহীদের সাথে আল্লাহর তা'যীম ও শ্রদ্ধাও মিশ্রিত থাকে সেটি হচ্ছে কামিল ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান। মহান আল্লাহ পাক কালামে ঘোষণা করেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

(তাঁর মত কিছুই নেই। [সূরা শূরা : আয়াত-১১]) বলে তাওহীদের দিকে, এরপর

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

(এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরা শূরা : আয়াত-১১])" বলে সে তা'যীম ও মহা সম্মান প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

বান্দা যখন জানবে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় যাত ও সিফাত তথা পবিত্র সত্ত্বা ও বিমূর্ত গুণের ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয়, বান্দা তাঁর সামনে হাজির ও উপস্থিত এবং একটি অণু পর্যন্ত আল্লাহর অফুরন্ত ইল্‌ম ও সুবিশাল জ্ঞান বেষ্টনীর বাইরে নেই তখন তার অসামান্য তা'যীম এমনিতেই হৃদয়ে জাগরুক হবে ও তাঁর সন্তুষ্টির বাইরে পদচারণার কল্পনাও আসবে না। এটিই হচ্ছে ঈমানের কামাল ও পরিপূর্ণতা।

কুফর অর্থ রাসূল, রেসালাত ও মুরসিলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। রাসূলের আনীত কোনো একটি বস্তু অস্বীকার করাও স্পষ্ট কুফরি। এ অস্বীকৃতি প্রকাশ্যে হলে তার নাম কুফর ও গোপনে হলে তাকে নেফাক বা মুনাফেকি বলা হয়। কুফর ও নেফাক থেকে মুক্তি লাভ করা তখনই সম্ভব, যখন দিল থেকে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ একক। নবী, রাসূল ও ফেরেশ্‌তাকূল এবং আসমানি কিতাবসমূহ, বিচার দিবস, পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে হিসাবের জন্য একত্রিত হওয়া, জান্নাত ও জাহান্নাম প্রভৃতি নিঃসন্দেহে সত্য। পাপ-পূন্য, অভাব-অনটন, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিমাণ নির্ধারণ, একে তাকদীরও বলা হয়। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। মুখে একথার স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে।

ইসলামের রোকনগুলো নির্ভুল ও সত্য জেনে তদানুযায়ী আমল করবে। কুরআনে কারীমকে আল্লাহর কালাম ও তাঁর পবিত্র বাণী এবং কা'বা শরীফকে কিবলা জানবে। সর্ব বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার অনুকূল আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দীন ও শরীয়তকে

কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল মনে করবে। যদি কোন অমুসলিম স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হয় তবে উল্লেখিত বিষয়গুলো স্বীকার ও তার ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টি ও ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে।

উদহারণ স্বরূপ : যদি ইহুদীবাদ থেকে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তবে তাওহীদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বরহক পয়গম্বর স্বীকার করার পর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিতে হবে, 'আমি ইহুদী ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট ও নারাজ। এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

"যে ব্যক্তি শয়তানকে (বাতিল ধর্ম) অস্বীকার করল, ঈমান আনয়ন করল, নিঃসন্দেহে সে মজবুত হাতল ধারণ করল।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৬)

আল্লাহর পথের সন্ধান লাভই মা'রেফত। হযরত ইব্‌রাহীম আ. এর উক্তি কুরআন মাজীদে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ

"যদি মহান আল্লাহ আমাকে সঠিক পথনির্দেশ না করেন তবে আমি হব বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত।"

(সূরা আনয়াম : আয়াত-৭৭)

হযরত আয়েশা রা. রেওয়ায়েত করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খুঁটির ওপর সম্পূর্ণ গৃহ নির্ভরশীল। দীনের খুঁটি হচ্ছে, আল্লাহর মা'রেফত তথা একীন। প্রকৃত আকল তো কামে' হয়। হযরত আয়েশা রা. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। কামে' দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এতদুত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কামে' হচ্ছে পাপ কার্যে বাঁধা ও নেককাজে উৎসাহ দানকারী।

বস্তুত মহান আল্লাহর মা'রেফত হচ্ছে দীনের মূল আর ইস্তিগফার ও ইবাদত-বন্দেগী তার শাখা বা ডাল-পালা স্বরূপ। মূলের অস্তিত্ব আগে আর শাখা তার পরে।

মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে বলেন,

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ

"হে আমার হাবীব! জেনে রাখুন, আমি আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বূদ নেই এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৮)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ

"বাস্তবিক পক্ষে আমিই মা'বূদ। আমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কোনো মাবুদ নেই। কাজেই, তুমি আমারই ইবাদত কর।"(সূরা তাহা : আয়াত-১৪)

আলোচ্য দু'টি আয়াতের মধ্যে মা'রেফত ও তাওহীদকে ইস্তিগফার ও ইবাদতের পূর্বে আনা হয়েছে। আভিধানিক অর্থে সাধারণত জানার নাম মা'রেফত। মা'রেফত সে ইল্‌মকে বুঝায়, যা গাফেলতি ও উদাসিনতার পর সাধিত হয়। সূফিয়ায়ে কেরামের মতে, মহান আল্লাহ যাত, সিফাত, সত্ত্বা ও গুণ সংক্রান্ত বিশেষ ইল্‌ম ও জ্ঞানকে মা'রেফত বলে যার মধ্যে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

মা'রেফতে যাতির ব্যাখ্যা হচ্ছে, মহান আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বাকে একক, অমুখাপেক্ষী, স্বনির্ভর মনে করবে। কাউকে তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁকে কারো তুল্য জানবে না।

আর মা'রেফতে সিফাতী বলতে আল্লাহকে চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, নিরংকুশ ক্ষমতান অধিকারী, প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, যাবতীয় সৎ গুণসমূহে গুণান্বিত, নশ্বরতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে একীন করবে।

তাওহীদ হচ্ছে মা'রেফতের প্রাণ। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুওয়াহ্হিদ বা তাওহীদপন্থী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মা'রেফত মূর্খতার চেয়েও নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে মা'রেফতের চিহ্ন হচ্ছে, মহান আল্লাহর মোশাহাদা ও সমক্ষ অবলোকন তার জীবন ধারণের একমাত্র উপাদান ও সহায়ক।

মা'রেফতে শুহূদী বা আল্লাহর মোশাহাদা ও অন্তরদর্শন, একীন থেকেও দৃঢ়তর হয়। মা'রেফতে শুহূদী অর্জিত হয় যখন সির্র কলবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার মোশাহাদা ও দীদারের স্তরে উপনীত হয়। কেননা, প্রকৃত মা'রেফত দীদারের মাধ্যমেই সাধিত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ কিছু পর্দা সরিয়ে আপন যাত ও সিফাতের রোশনি দেখান, যাতে বান্দা মা'রেফত হাসিল করতে পারে। সকল পর্দা কখনোই অপসারিত হয় না। কারণ, যদি সকল পর্দা সরিয়ে দেয়া হয় তবে সমগ্র সৃষ্টিজগত জ্বলেপুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যাবে।

তাওহীদের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে এক বলে জানা। ওলামায়ে কেরামের মতে, আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকৃতি দানের নাম হচ্ছে তাওহীদ। সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন, তাওহীদ অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াহ্দানিয়তের মোশাহাদা করা। প্রকৃত তাওহীদ হচ্ছে, নশ্বর, ধ্বংসশীল বস্তুর নশ্বরতা ঘোষণা করা সাথে সাথে অবিনশ্বর সত্তার অবিনশ্বরতা স্বীকার করা। হযরত জোনায়েদ রহ. কে বলা হল, আল্লাহ্ তায়ালার সিফত ও গুণাগুণের কিঞ্চিত বর্ণনা দিন। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন,

هُوَ بِلَا هُوَ لَا هُوَ اِلَّا هُوَ

"তিনি আছেন তিনি ব্যতীত আর তিনি বলতে কেউ নেই তিনি ছাড়া।"

এ কথা শুনার সাথে সাথে প্রশ্নকারী একটি বিকট চিৎকার দিয়ে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহ. বলেন, আমি সচেষ্ট থাকি, যাতে তাজরীদের মুখ থেকে তাওহীদের কথা বের করব না। কেউ বলেছেন, তাওহীদ অর্থ অবিনশ্বর ও নশ্বরের মাঝে পার্থক্য করা। নশ্বর থেকে মুখ ফিরিয়ে অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তার প্রতি এমনভাবে মনোনিবেশ করা যে, সে নিজের অস্তিত্বই খুঁজে পাবে না। যদি তাওহীদের অবস্থায় বান্দার নিজ সত্তার অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে তবে তা তাওহীদ হয় কী করে? এবং তাকে একত্ববাদীই বা কীকরে বলা যায়? সে তো দ্বৈতবাদী হয়ে গেল।

মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ আদিতেই এক ও অদ্বিতীয় ছিলেন। তৎসঙ্গে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, "কেবল আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন। তাঁর সাথে অন্য কিছুই ছিল না। আরশ ছিল পানির ওপর অবস্থিত। অতঃপর তিনি সমগ্র জাহান সৃষ্টি করেন।"

যখন বুঝা গেল, আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র মাখলূক সৃষ্টির পূর্বে ও পরে একা ও লা-শরীক ছিলেন। মহান আল্লাহর এ একত্বের বিষয়টি তখন কারো স্বীকৃতি বা সমর্থনের অপেক্ষা রাখেনি। আল্লাহর তাওহীদ সকল তাওহীদের উর্ধ্বে। বান্দা "নাউযুবিল্লাহ" আল্লাহ্ তায়ালাকে ওয়াহদানিয়ত ও একত্বের আসনে সমাসীন করেছে। এটি বান্দার কৃতিত্ব, এমন ধারণা পোষণ করার কোন অবকাশ নেই; বরং বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার এটি একটি স্বতন্ত্র দয়া ও মেহেরবানি; যার কারণে সে একথা স্বীকার করে স্বয়ং শিরকের গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুওয়াহ্হিদ একত্ববাদীর সম্মান লাভের সুযোগ পেয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তো পূর্বেও এক ও লা-শরীক ছিলেন। বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও এগুণে বিভূষিত থাকবেন। বস্তুত তাওহীদ হচ্ছে, একটি নূর বা রোশনি, যার দ্বারা খালেক বা মহান স্রষ্টার সত্তার অবিনশ্বরতা ও সৃষ্টির ধ্বংসশীলতা মোশাহাদা ও অবলোকন করা যায়। বস্তুত এ তাওহীদ হচ্ছে, তাওহীদে ইল্মী তথা জ্ঞানগত তাওহীদ এবং তাওহীদে বয়ানী বা বিবরণনির্ভর তাওহীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বের। কারণ, জ্ঞানে সাধারণত সন্দেহের পূর্ণ অবসান হয় না ও অন্যের অস্তিত্ব চিন্তনের বিলুপ্তি ঘটে না।

বুঝা গেল, তাওহীদে ইল্মীর ভিতরে সংশয়ের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, শুনা খবর প্রত্যক্ষ দর্শনের সমান হন। অতএব, তাওহীদে মোশাহাদার সাথে তাওহীদে বয়ানের তুলনা হতে পারে না। অধিকন্তু যে ব্যক্তি তাওহীদের পাশাপাশি আপন পালনকর্তার দীদার লাভে ধন্য হলো তার পাপরাশি পূন্যে পরিণত হয়ে গেল। আর যে

ব্যক্তি খাঁটি মনে একত্ববাদ স্বীকার করে নিল, আল্লাহ্ তায়ালা তার ওপর জাহান্নামের আগুণ হারাম করে দিলেন। অগণিত হাদীস এর সাক্ষ্য বহন করে।

তাওহীদের আকলী ও নকলী তথা যৌক্তিক ও বর্ণনানির্ভর প্রমাণ রয়েছে অসংখ্য-

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

১. "আল্লাহ সাক্ষী, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮)

اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا

২."নিশ্চই আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।" (সূরা তাহা : আয়াত-১৪)

لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَیْنِ اثْنَیْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

৩." দু' উপাস্য গ্রহণ কর না। আল্লাহ তো একজনই।"(সূরা নাহল : আয়াত-৫১)

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَیْرُ اللّٰهِ

৪. "না-কী আল্লাহ ভিন্ন তাদের জন্য কোন স্রষ্টা আছে? (নেই)।" (সূরা তূর : আয়াত-৪৩)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"ইবাদতের জন্য তাওহীদ যথেষ্ট ও সওয়াবের জন্য জান্নাত যথেষ্ট।" ইত্যাদি ইত্যাদি

সারকথা, তাওহীদের যুক্তিনির্ভর ও শরীয়ত প্রদত্ত অসংখ্য দলিল রয়েছে তবে তার মধ্যে চারটি দলিল অতিশয় স্পষ্ট। সে দলিলগুলো হচ্ছে যথাক্রমে-

এক. সৃজন, দুই. লালন-পালন, তিন. জীবন দান ও চার. মৃত্যু দান।

এ যোগ্যতাগুলো মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে নেই। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ

"আল্লাহ তিনিই যার সুমহান সত্তাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদিগকে রিযিক দান করেছেন। অতঃপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন ও পুনর্জীবিত করবেন।" (সূরা রূম : আয়াত-৪০)

বুঝা গেল, একত্ববাদ আল্লাহ্ তায়ালার এক বিশেষ ও অনন্য গুণ। একারণে ওলামায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে এযাম সহ সকল মাযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত। পরন্তু তাঁদের এ নির্মল তাওহীদি বিশ্বাসে আল্লাহর সাথে অন্য কারো সাদৃশ্যকে জায়েয মনে করেন না।

মোটকথা, তাওহীদ বলতে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে এমনভাবে বিশ্বাস করা, যেখানে তাওহীদবাদীর ব্যক্তিসত্ত্বার চেতনাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সূফিয়ায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, তাওহীদের হালতে খোদ তাওহীদকেও পরিত্যাগ করবে। কেননা, অন্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ করা, এমনকি তাওহীদ খেয়াল করাও তাশবীহ'র শামিল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

একীন হচ্ছে, মুমিনের কলবে নূরে হাকীকতের উদ্ভাসন যাতে মনুষ্য পর্দা অপসারিত হয়ে বিশেষ দশা ও আস্বাদনের অবস্থা সৃষ্টি হয়। তখন একীন নিছক দলিল নির্ভর থাকবে না।

হযরত আলী রা. বলেন, "যদি গায়বের পর্দা অপসারিত হয় তবে আমার মোশাহাদা ও দর্শনের পরিস্ফুটন ও স্পষ্টতায় কিঞ্চিৎ পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না। (কেননা, আমার নিকট সবকিছু আগ থেকেই স্পষ্ট ও পরিস্ফুটিত)

ঈমানের নূর ও একীনের নূরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে-

ঈমানের নূর পর্দার অভ্যন্তরে বিরাজ করে। যেমন পাক কালামের ঘোষণা,

یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ

"তারা গায়েব ও অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৩)

একীনের নূর সে জ্যোতি অদৃশ্য পর্দা অপসারণের পর মুমিনের অন্তরে দীপ্তিমান হয়। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে উভয় নূর একই। সুবহে সাদিক রাতের আঁধার ছিন্ন করে সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ নিয়ে উদিত হয়। এটি ঈমানের দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, সূর্য উঠেছে নিশ্চিত কিন্তু এখনো তার আলোকচ্ছটা পর্দার অন্তরালে রয়ে গেছে। এরপর যখন সে সূর্যের গোলক বেরিয়ে প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হয়। এটি হচ্ছে নূরে একীনের উদাহরণ।

সুতরাং ঈমান হচ্ছে একীনের মূল বা শিকড়। একীনের কতগুলো শাখা রয়েছে; যথা-১. ইল্‌মুল একীন, ২. আইনুল একীন, ৩. হক্কুল একীন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "ঈমান হচ্ছে একীনেরই আরেক নাম। ইল্‌মুল একীন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ'র মর্ম ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা, যা মহান আল্লাহ বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দিলেই বান্দার পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

"আমি সোলায়মানকে সে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮৯)

এখানে আল্লাহ্ তায়ালার বুঝানোর মাধ্যমে যে ইল্‌ম হাসিল হয়েছে তাকেই বলে ইল্‌মুল একীন। অনন্তর এটি একটি বিশেষ রহমতও বটে। (কারণ, বান্দার কোনরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীতে তা হাসিল হয়।)

যেমন, মহান আল্লাহ হযরত খিযির আ. সম্পর্কে বলেছেন,

آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا

"আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ রহমত ও কৃপা দান করেছি।" (সূরা কাহাফ : আয়াত-৬৫)

অর্থাৎ, নূর ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছি।

হযরত খিযির আ. এর সে ইল্‌ম ছিল মানবীয় শিষ্টাচার ও মাখলূকের প্রতি করুণা ও দয়া সংক্রান্ত ইল্‌ম। যালেম শাসকের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য দরিদ্র মাঝির কিশ্‌তি ফুটো করে দেয়া, ঈমানদার পিতা-মাতাকে কুফর থেকে রক্ষার মানসে বালক হত্যা এবং নেককার লোকটির এতীম সন্তানের সম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্তে তাঁর বিধ্বস্ত দেয়াল সংস্কার করা। প্রত্যেকটি ঘটনাতে তাঁর সেই বিশেষ ইল্‌মেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছিল।

মোদ্দাকথা, যার সহীহ্ ইল্‌ম হাসিল হয়, ঈমান ও আকীদা তার সবই দুরস্ত হয়ে যায়। তার তাওহীদও মা'রেফতে পরিণত হয়। বস্তুত দুনিয়াতে যার তাওহীদ সঠিক হয়ে গেল, আখেরাতে অবশ্যই আল্লাহর দীদার তার নসীব হবে।

একীন অর্থ মূর্খতা ও সন্দেহের ব্যাধি থেকে অন্তরের আরোগ্য লাভ করা। বলাবাহুল্য, শরীরের সুস্থতার চেয়ে অন্তরের সুস্থতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেউ বলেছেন, ঈমান ও একীনের মধ্যে পার্থক্য সেরূপ, যেরূপ পার্থক্য অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের মাঝে। অর্থাৎ, অন্ধ ব্যক্তি সূর্যোদয়ের জ্ঞান মোশাহাদা ও সরাসরি দর্শনের মাধ্যমে অর্জন করে না; বরং অপরের থেকে শুনে তা বিশ্বাস করে। অথচ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে। এরই নাম একীন।

ইবাদত

ইবাদতের স্তর তিনটি; যথা-

এক. সওয়াবের আশা ও আযাবের ভয়ে ইবাদত করা। এ স্তরটি প্রসিদ্ধ, সুবিদিত।

দুই. আল্লাহ্ তায়ালার আবদিয়ত ও দাসত্বের সম্মানের খিলওয়াত অর্জনে জন্য ইবাদত করা। কোন কোন সূফী এ স্তরের নাম রেখেছেন উবূদিয়ত।

তিন. ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার তা'যীম, ইজলাল ও হায়বত তথা সম্মান-শ্রদ্ধা ও সমীহ'র কারণে হয়ে থাকে। ইবাদতের এ স্তরটি সবচেয়ে উন্নত। অনেকে স্তরটিকে আবূদাত বলে অভিহিত করেছেন। ইবাদতের মহল বা স্থান হচ্ছে শরীর। এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশাবলি পালিত হয়। উবূদিয়তের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে রূহ্। কারণ, উবূদিয়ত হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম-আহকামের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। বস্তুত সন্তুষ্টির সম্পর্ক আত্মার সাথে। আবূদাত

উভয় প্রকারের চেয়ে উত্তম। তার মহল সির্র। মূলত এটিই হচ্ছে আসল ইবাদত, উবূদিয়ত তার শাখা। মূল ব্যাতিরেকে শাখার অস্তিত্ব কল্পনাতীত। ইবাদত, উবূদিয়ত উভয়টিই মূলতঃ রিয়াযত ও মোজাহাদার মাধ্যমে বান্দার উপার্জিত আমল আর আবূদাত হচ্ছে সরাসরি মাওলা পাকের দান ও নির্দেশনা।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ. এর ভাষ্য উল্লেখ করেন,

اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

"আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, অচিরেই তিনি আমাকে হেদায়াত দান করবেন।" (অর্থাৎ, আবূদতের মর্তবা দান করবেন।)(সূরা সাফ্ফাত : আয়াত-৯৯)

মুহাক্কিকীন বলেছেন, সিদ্দীকে আকবর রা. এর ইবাদত ছিল আল্লাহর মহব্বত সমীহ ও লজ্জাপ্রসূত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিসৃত বাণী সেদিকেই ইঙ্গিত করে, আবূ বকর অত্যধিক নামায, রোযার প্রভৃতি ইবাদতের কারণে তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করেনি; বরং হৃদয়ে বিরাজিত এক বিশেষ অবস্থার কারণে তোমাদের ওপর তার এ অসামান্য মর্তবা। অর্থাৎ, সেটি ছিলো ইবাদতের এক বিশেষ হালত, যার অপর নাম আবূদত।

হযরত ওমর রা. আল্লাহ্ তায়ালার খাওফ ও হায়বত তথা ভয়ের কারণে ইবাদত করতেন। সেকারণে জনসাধারণের মাঝে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। কারণ, যে মহান আল্লাহকে ভয় করে সমগ্র সৃষ্টিজগত তাকে ভয় পায়। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর রা. এর ছায়া দেখলেই শয়তান পালয়ন করে।"

হযরত ওসমান রা. লজ্জাশীলতা ও শ্রদ্ধার কারণে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতেন। মহান আল্লাহ্ তাকে পূর্ণমাত্রায় হায়া ও লজ্জার দৌলত দান করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি কী সে ব্যক্তিকে সমীহ করব না, যাকে আসমানের ফেরেশ্তারা পর্যন্ত সমীহ করে।"

হযরত আলী রা. মহব্বত ও তা'যীমের ইবাদত করতেন। নিম্নোক্ত আয়াতে কুরঅনিয়া তাঁর শানেই অবতীর্ণ হয়েছে,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

"তারা আল্লাহর মহব্বতের কারণে মিসকীন, এতীম ও বন্দীদের খাবার দেয়।" (সূরা দাহর : আয়াত-৮)

বস্তুত ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এরূপই ছিল। (অর্থাৎ, তাঁরা অনেক উন্নত অন্তর নিয়ে ইবাদত করতেন, যার চিহ্ন ও নিদর্শন তাঁদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হত।)

সুতরাং যার আবূদাতের মর্তবা হাসিল হয়ে গেছে, সে দীদারের স্তর সাধন করেছে। (অর্থাৎ, সে যেন মাবূদে হাকীকিকে দেখে নিয়েছে ফলে তার জন্য আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা কঠিন আযাব তুল্য ও বড় কষ্টদায়ক মনে হয়।) অধিকন্তু সে জানে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে অবশ্যই আল্লাহর রুইয়াত ও দীদার থেকে মাহ্যূব ও বঞ্চিত হবে। তার নিকট এর চেয়ে কঠিন কোন শাস্তি নেই। তাই সে বিরোধিতার সাহসই করতে পারে না।

জেনে রেখ, হক বলতে এমন মহান সত্ত্বাকে বুঝায় যিনি চির ভাস্বর বিদ্যমান, চিরস্থায়ী, চিরপ্রতিষ্ঠিত ও মহাপোকারী, চাইলে ক্ষতিও করতে পারেন। অনন্তর তিনি অসীম রহমতের মালিক। অতএব, হক একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই। তাঁর ক্ষেত্রেই হক শব্দের ব্যবহার যথার্থ প্রযোজ্য। যদি কখনো গাইরুল্লাহকে হক বলা হয় তবে সেখানে হকের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব হচ্ছে বিয্যাত ও স্বমহিমায় বিরাজমান, বাদবাকী সবকিছু তাঁর মাধ্যমে সৃষ্ট ও অস্তিত্বপ্রাপ্ত। কাজেই স্বমহিমায় অস্তিত্ববান মহান সত্তার জন্যই এ শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ

"হকের বাইরে গোমরাহী বৈ কী থাকে।" (সূরা ইউনুস : আয়াত-৩২)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কবি লবীদ অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন,

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلُ

"বাস্তবিকই আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুই বাতিল।"

সারকথা, যখন সকল গাইরুল্লাহ্ বাতিল সাব্যস্ত হল তখন লা-শরীক আল্লাহ্ একাই হক রইলেন। কেননা, বাতিলের বিপরীতই তো হক। বস্তুত হকের প্রকৃতি ও স্বভাব হচ্ছে সে বাতিলের বিলুপ্তি সধান।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

"আমি হককে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করি। এরপর হক তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।"

(সূরা আম্বিয়া : আয়াত-১৮)

হাকীকত

হাকীকত শব্দের আভিধানিক অর্থ যথার্থ জ্ঞান ও অনুধাবন। উসূল ও মা'আনী শাস্ত্রবিদের পরিভাষায় হাকীকত অর্থ হচ্ছে কোন শব্দকে তার মূল অর্থে ব্যবহার করা। মাশায়েখে তাসাউফের পরিভাষায় হক বলতে যাত এবং হাকীকত বলতে তার সিফাত বুঝায়। এখানে যাত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মহান সত্ত্বা, সিফাত বলতে তাঁরই বিমূর্ত গুণাবলি উদ্দেশ্য। একারণেই মুরীদ যখন দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে মনোবৃত্তির সীমা পেরিয়ে আলমে ইহ্সান বা বীক্ষণ জগতের সীমানায় পৌঁছে তখন সে হাকীকতের জগতে প্রবেশ করেছে। তারা এমত পোষণ করেন। সুফিয়ায়ে কেরাম আরো বলেন, যদি এমন হয় যে, মুরীদ অদ্যবধি আসমা ও সিফাত বা নাম ও গুণাবলির জগতে বিচরণশীল তবে সে এ বিষয়ের আলেম, জ্ঞাত এবং ওয়াসিল ও মিলনপ্রাপ্ত হয়েছে। যখন সে আল্লাহ্ তায়ালার যাত পর্যন্ত পৌঁছে তখন তাঁদের মতে, সে লোকটি হকের সন্ধান পেয়েছে।

মোটকথা, সুফিয়ায়ে কেরাম হক ও হাকীকত শব্দদু'টি গায়রুল্লাহ্র সত্ত্বা ও গুণবৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহার করে থাকেন। কখনো করলে তা হয় রূপক অর্থে। কেননা, তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছু থেকে তাঁরা থাকেন বিচ্ছিন্ন।

হযরত আবূ দারদা রা. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, "প্রত্যেকটি জিনিসের একটি হাকীকত থাকে।" এখানে হাকীকত শব্দটি মাজায অথবা রূপক অর্থে গায়রুল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ প্রত্যেকটি সত্ত্বার কোন না কোন গুণবৈশিষ্ট্য থাকে, যা তার জন্য নির্ধারিত হয়।

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত হারিছা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, হারিছা! আজ কী অবস্থায় তোমার ভোর হলো? তিনি উত্তর দিলেন, ঈমানী হালতে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, হে হারিছা! সব বস্তুরই একটি হাকীকত থাকে, বল তোমার ঈমানের হাকীকত কী?" বলাবাহুল্য ঈমানের অপরিহার্য গুণ সম্পর্কে আলোচনাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের তাৎপর্য। যখন হারিছা রা. সে বিশেষ গুণটি বর্ণনা করলেন, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তাঁর উত্তরটি সঠিক বলে স্বীকৃতি পেল।

হক্কুল একীন শব্দটির প্রয়োগ আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র সত্ত্বার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। অবশ্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য এর ব্যবহার রূপক অর্থে হয়। কারণ, সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট প্রসিদ্ধ রয়েছে, প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁর পক্ষ থেকে আগত আবার তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। অনন্তর সর্ববিষয়োপরি তাঁর একচ্ছত্র মালিকানা।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

অনুচ্ছেদ-১৩
সহীহ ইলম ও আমলে সালেহ এর গুরুত্ব এবং ঈমান ও তাকওয়ার স্তর

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

"তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর একে অপরকে সাহায্য কর।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-২)

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"তারা একে অপরকে হক ও সবরের তাকীদ করে।" (সূরা আসর : আয়াত-৩)

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

"তারা একে অন্যকে দয়া ও মেহেরবানীর তাকীদ করে।" (সূরা বালাদ : আয়াত-১৭)

হযরত আবূ হোরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"দীন হচ্ছে পর কল্যাণ কামনা।" (তিরমিযী : ৪/১৭৪, জামে সগীর : ১/৩০২)

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমার কথা হচ্ছে, সহীহ্ ইল্ম ও বিশুদ্ধ আমল ব্যতীত আল্লাহর কুর্ব ও বিসাল তথা নৈকট্য ও মিলন কামনা এবং মাগফিরাতের আশা করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। অনন্তর এ দু'টি বিষয় কালামুল্লাহ্ থেকে গ্রহণ করা উচিত। কেননা, কালামুল্লাহ্ তাওহীদ, মা'রেফত, আমল, হালত, আকীদা-বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের হেদায়াত বা নির্দেশিকা। সহীহ্ ইল্ম ছাড়া আমল শুদ্ধিতা অসম্ভব। আহওয়াল যেহেতু আমলেরই ফসল, তাই আমল সঠিক না হলে ভালো হালত আশা করা যায় না। আল্লাহ্ তায়ালা কেবল বিশুদ্ধ ও খালিস আমল কবুল করেন।

আমল সহীহ হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে শরীয়ত অনুযায়ী সম্পাদন করা। খালিস তখন হবে যখন আমল কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হবে। এছাড়া আমল কবুল হওয়ার জন্য তাকওয়ার শর্ত তো রয়েছেই।

কুরআন কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

"আল্লাহ্ তায়ালা কেবল মুত্তাকীদের থেকেই গ্রহণ করেন।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-২৭)

মনে রাখতে হবে, তাকওয়া ছাড়া কেউ পরিত্রাণ পাবে না তবে দয়াময় আল্লাহ্ যদি কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

"আল্লাহ্ পরহেযগারদের মুক্তি দান করবেন।" (সূরা যুমার : আয়াত-৬১)

মোটকথা, ঈমান ও তাকওয়া অতীব জরুরি বিষয়। বস্তুত এর ওপরই নাজাত নির্ভরশীল। তবে এর কয়েকটি স্তর রয়েছে।

ঈমান ও তাকওয়ার স্তর

ঈমান ও তাকওয়ার স্তর চারটি। তার মধ্যে একটি অপরটি থেকে উন্নত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"যারা ঈমান এনেছে ও নেকআমল করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোন গুনাহ্ নেই। যখন ভবিষ্যতের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করে, ঈমান আনে ও নেকআমল করে। এরপর তাকওয়া অবলম্বন করে ও ঈমান আনে। এরপর তাকওয়া অবলম্বন করে, নেকআমল করে ও ইহ্সান অবলম্বন করে। অনন্তর মহান আল্লাহ ইহ্সানওয়ালাদের ভালোবাসেন।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-৯৩)

আলোচ্য আয়াতে ঈমানের তিনটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে চতুর্থ স্তরের নাম রাখা হয়েছে ইহ্সান।

এক. পুরোপুরি পরহেযগারী ব্যতীত ঈমান আনা ও শরীয়তের অনুসরণ করা। এটি ফিসক ও গুনাহের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নাও হতে পারে।

দুই. স্পষ্ট হারাম কাজ থেকে বেঁচে ঈমান ও আমলে সালেহ্ করা। পরন্তু যেসব ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে খানিকটা অবকাশ রয়েছে সেগুলো সম্পন্ন করা। এটি প্রথম স্তরের চেয়ে উন্নত।

তিন. ঈমান আনয়ন করা, এরপর স্পষ্ট হারাম ও যে সকল বিষয় শরীয়তের পক্ষ থেকে রোখসত বা অবকাশ রয়েছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। কথাটি এভাবেও বলা যায়- হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় মুবাহ ও বৈধ কাজ থেকেও বিরত থাকা। এটি দ্বিতীয় স্তরের চেয়েও বেশি কামেল ও পূর্ণাঙ্গ।

চার. ঈমান ও তাকওয়ার সাথে সাথে সিফাতে ইহ্সানের দরজাও হাসিল করা। এ চতুর্থ স্তরটি ঈমান বিল গায়বের চেয়েও উর্ধ্বে। এ ব্যক্তির ইল্‌ম ও একীন প্রথম তিন স্তরধারীর মত দলিলের মাধ্যমে সাধিত হয় না; বরং সে তা অর্জন করে মোশাহাদা ও প্রত্যক্ষ অবলোকন পন্থায়। এই মাকামের তাকওয়া হলো আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছু পরিত্যাগ করা।

মোদ্দাকথা, কুরআনে কারীম এমন পথ যে পথে চলার কারণে সালেকের কুরব ও বিসাল নসীব হয়। যে ব্যক্তি এ পথ ত্যাগ করে লাঞ্ছনাই তার একমাত্র পাওনা। অনন্তর বান্দার হৃদয়ে আল্লাহ কর্তৃক নূরের দৃষ্টিপাতকেই উসূল বা লক্ষ্যার্জন বলে। একপর্যায়ে সে নূর যখন বান্দার ওপরে প্রাবল্য বিস্তার করে তখন সে আল্লাহ্ তায়ালা হতে আর ভিন্ন হতে পারে না। কেননা, এ নূরটিও আল্লাহ্ তায়ালার সিফাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বান্দা আল্লাহর নূরের শক্তিতে এ সিফতের মোশাহাদা করে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালার গুণে গুণান্বিত হওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত।

অতএব, বেসালের একক ও অভিন্ন অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ইহজগতে দর্শন লাভ হবে সির্‌র ও কলবের মাধ্যমে এবং আখেরাতে তা হবে চাক্ষুষ ভাবে। তবে অনেকে বেসালের অর্থ বুঝেছেন, বান্দার ব্যক্তিসত্ত্বা আল্লাহর সত্ত্বার সাথে মিশে যাবে। এ ধরণের আকীদা নিঃসন্দেহে কুফর ও খোদাদ্রোহীতা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের হেফাযত করুন। তিনি এজাতীয় মিলনের বহু উর্ধ্বে।

জেনে রাখা উচিত, দুনিয়াতে আল্লাহর তাওহীদ ও মা'রেফত এবং ইল্‌ম ও ঈমান যেরূপ বেলাকায়ফ (কোন দিক, অবস্থা ও ধরণ মুক্ত) হয়ে থাকে তদ্রূপ আখেরাতেও মাওলার দীদার বেলাকায়ফ হবে। দুনিয়াতে যদি কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা অনুযায়ী ঈমান হাসিল না হয় তবে আখেরাতে তার দীদার কখনো নসীব হবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত আখেরাতে ব্যর্থতা ছাড়া তার কোন উপায় নেই।

সারকথা, সহীহ্ ঈমান ও তাকওয়া বিসাল ও মিলনের দু'টি রোকন। কাজেই, এ দু'টি হারানোর অর্থ পুঁজি হারিয়ে ফেলা।

তাকওয়া

মনে রাখতে হবে, দীনের মূল বিষয়গুলো জানার পরে সর্ব স্তরের ঈমান ও তাকওয়া কায়েম রাখা অপরিহার্য। কেননা, তাকওয়া হচ্ছে, পাথেয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

"সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৭)

তাকওয়া কলবের পোশাক। তাকওয়া কলবকে আবৃত করে রাখে যাতে শয়তান কলবকে অপহরণ করতে না পারে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

"তাকওয়ার পোশাকই সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৬)

অনন্তর পোশাক ও পাথেয় ছাড়া পথ চলা ও গন্তব্যে পৌঁছার উপায় নেই। বস্তুত সিদ্‌ক্ যা বেসালের রোকন ও তাকওয়ারই ফসল।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"এরাই সত্যবাদী, এবং এরাই পরহেযগার।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৭)

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইল্‌ম নাযিল করেছেন, তা কেবলমাত্র মুত্তাকী ও আল্লাহভীরুদের হেদায়াতের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এ হচ্ছে সে কিতাব, যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। অনন্তর তা মুত্তাকীদের হেদায়েতের জন্য।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২)

ইল্‌ম তাকওয়া সহ শিখতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জান।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৪)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

"তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদের ইলম দান করবেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮২)

(সুতরাং ইল্‌ম শেখার যুগেও তাকওয়ার ব্যাপারে উদাসীন থাকা জায়েয নেই।) অনুরূপভাবে সকল কাজ-কর্ম, কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারেও তাকওয়া কাম্য।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"পূর্ববর্তী উম্মতগণের মত তোমাদের ওপরও আমি রোযা ফরয করেছি। অবশ্যই এর দ্বারা তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৩)

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

"তোমরা হজ্জের জন্য পাথেয় সঙ্গে নাও। বস্তুত সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয় বা তাকওয়া।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৭)

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কুরবানীকৃত জন্তুর গোশ্‌ত ও রক্ত কখনো পৌঁছে না; বরং তার নিকট একমাত্র তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে।" (সূরা হজ্জ : আয়াত-৩৭)

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

"বদরের যুদ্ধে আমি তোমাদের সাহায্য করেছি, যখন তোমরা শক্তিহীন ছিলে। অতএব তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১২৩)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ

"তোমরা হালাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা নাহল : আয়াত-১১৪)

وَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ

"তোমরা গনিমতের বৈধ ও পবিত্র মাল ভক্ষণ কর এবং তাকওয়া রক্ষা করে চল।" (সূরা আনফাল : আয়াত-৬৯)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوۡا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কারো নিকট সুদের কিয়দাংশ পাওনা থাকলে তা ছেড়ে দাও।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৮)

وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا وَّيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করবে, বিপদাপদে আল্লাহ্ তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন। পরন্তু কল্পনাতীত উপায়ে তার রিযিক সরবরাহ করবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত-২)

وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعۡظِمۡ لَهٗۤ اَجۡرًا

"যে তাকওয়া অবলম্বন করবে মহান আল্লাহ তার পাপরাশি মার্জনা করবেন। সর্বোপরি তাকে বড় প্রতিদান দিবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত-৫)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسۡتَطَعۡتُمۡ وَاسۡمَعُوۡا

"তোমরা যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন কর ও শুন।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-১০৮)

اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰكُمۡ

"তোমাদের মধ্যে যে যত বড় মুত্তাকী আল্লাহর নিকট সে ততো সম্মানিত।" (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَاَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথোচিৎ তাকওয়া অবলম্বন কর এবং পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১০২)

এজাতীয় অসংখ্য আয়াত কুরআন কারীমে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহর অলী কে

মহান আল্লাহ্ বেলায়াত, বন্ধুত্ব ও মহব্বতের জন্য পরহেযগার মুমিনদেরকেই নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

"আল্লাহ্ মুমিনদের কর্ম অধিনায়ক, তিনি এ গুণসমূহের অধিকারী লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। যথা- ধৈর্যশীল, পরহেযগার, ইহ্সানের গুণবিশিষ্ট, অতিশয় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, আল্লাহ্র ওপর ভরসাকারী।"

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য-

اِنۡ اَوۡلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الۡمُتَّقُوۡنَ

"মুত্তাকী ব্যতীত আল্লাহ্ তায়ালার কোন বন্ধু নেই।" (সূরা আনফাল : আয়াত-৩৪)

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, একমাত্র মুত্তাকীই আল্লাহর বন্ধু, গায়রে মুত্তাকী কখনই অলী হতে পারে না। এভাবে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাকওয়াই ইসলাম তথা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান দীনি উদ্দেশ্য। ইবলিস, বালয়াম ও বরসীসা, এদের ঘটনা সকলেরই জানা। তারা পার্থিব জগতে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও কামেল ছিল। অধিকন্তু বড় বড় কারামতও তাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাকওয়া ছেড়ে মনোবৃত্তি পূঁজার কারণে সবকিছু ভস্ম হয়ে গেছে, তাদের অবস্থান সর্বনিম্নে চলে গেছে। কবি চমৎকার বলেছেন,

لَوۡ كَانَ فِي الۡعِلۡمِ مِنۡ دُوۡنِ التُّقٰى شَرَفٌ   لَكَانَ اَشۡرَفُ خَلۡقِ اللّٰهِ اِبۡلِيۡسُ

"তাকওয়া ছাড়া কেবল ইল্ম দ্বারাই যদি সম্মানিত হওয়া যেত তবে সৃষ্টিজগতে ইবলিস শয়তান সবচেয়ে সম্মানিত হত।"

মোবারকবাদ মুত্তাকী আলেমকে যিনি চিরস্থায়ী বস্তুর জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেন এবং ক্ষণস্থায়ী নশ্বর দুনিয়া ও তদস্থিত ধন-সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে হয়ে বসেন ও এমন লোকের সংশ্রব থেকে তীরের গতিতে পলায়ন করেন; যার কথা, কাজ, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও লেনদেনের ভিতরে তাকওয়া নেই। কেননা, তার সাহচর্য ইহ ও পরকালের লাঞ্ছনা ডেকে আনবে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তায়ালার আশ্রয়ে ঠাঁই নেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ

"তোমরা তড়িৎ আল্লাহ্র দিকে ছুটে চলো।" (সূরা যারিয়াত : আয়াত-১৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

"কিয়ামত দিবসে বন্ধুরা সব শত্রু হয়ে যাবে কিন্তু মুত্তাকীদের অবস্থা হবে ভিন্নরূপ।"

(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৬৭)

তারা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব গড়লে কিয়ামত দিবসে দারুণ পস্তাতে হবে।

কুরআন মাজীদ এভাবে তাদের অবস্থা চিত্রায়িত করেছে,

يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ,يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا

"হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের পথ ধরতাম। আক্ষেপ, আমি যদি ওই বদকারের সাহচার্য অবলম্বন না করতাম।" (সূরা ফুরকান : আয়াত-২৮)

يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ

"হায় আফসোস! হে অসৎ সহচারী, তোমার ও আমার মাঝে যদি পূর্বপশ্চিমের ব্যবধান হয়ে যেত। আজ তুমি বড়ই মন্দ সাথী।"(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩৮)

এখানে বদকার সাথী দ্বারা উদ্দেশ্য কাফির, যালেম, অহংকারী, ফিতনা সৃষ্টিকারী, খেয়ানতকারী, অপব্যয়ী, সীমালঙ্ঘনকারী প্রভৃতি স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ। আল্লাহ্ তায়ালা পাক কালামের বিভিন্ন স্থানে তাদের আলোচনা করেছেন। যেমন,

فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

"আল্লাহ্ তায়ালা কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩২)

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

"আল্লাহ্ যালেমদেরকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫৭)

এভাবে কুরআন শরীফের নানা স্থানে নানাবিধ কুচরিত্রধারী লোকদের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। সবগুলোর সার নির্যাস কেবল একটি কথাই- যারা মুত্তাকী নয় তাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

সুতরাং কারো জন্য শরীয়তের বিধান ছেড়ে জাহেল সূফীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সমীচীন নয়। কারণ, তারা শয়তানের দোসর। এরূপ করলে যিল্লাত ও অপমান ছাড়া কিছুই সাধিত হবে না। ব্যাস, জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার হাবীবের ইত্তেবা' নসীব করুন এবং আপনার পছন্দ মাফিক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

অনুচ্ছেদ-১৪

খিলওয়াত বা নির্জনবাস অবলম্বনকারীদের কয়েকটি ঘটনা

হযরত ইউসুফ আ. এর আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ

"যখন ইউসুফ স্বীয় পিতা ইয়াকূব আ.কে বলল, আব্বা! আমি এগারটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্য স্বপ্নে দেখেছি, তারা আমাকে সাজদা করছে।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৪)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছিচল্লিশভাগের এক ভাগ।"

জেনে রেখ, সালেক যখন রিয়াযত-মোজাহাদা তথা সাধনা, অনুশীলন শুরু করে। নফ্স ও কলবের তাযকিয়া, তাসফিয়া তথা সংশোধন ও পরিশীলনে অত্মনিয়োগ করে, মোরাকাবা ও ধ্যানে নিরন্তর প্রয়াস চালায়, তখন আলমে মালাকূত বা ফেরেশ্তা জগতে তার বিচরণ আরম্ভ হয় ও প্রত্যেক মাকাম অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের কাশ্ফ হতে থাকে। কখনো মোকাশাফা'র সুরতে, কখনো ভালো স্বপ্নের সুরতে, কখনো ওয়াকিয়ার সুরতে এ কাশ্ফ সাধিত হয়। যিকির ও এস্তেগরাক তথা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যখন মাহ্সূসাত ও অনুভবের জগত তার থেকে গায়েব হয়ে যায়, তখন গায়ব বিষয়ক হাকীকতের কাশ্ফ ও উন্মোচন ঘটে।

ওই সময় সালেক যদি ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে তবে সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় ওই কাশ্ফকে ওয়াকিয়া বলে। যদি সরাসরি জাগ্রত অবস্থায় এমন হয় তাহলে মোকাশাফা বলে। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় হয়, তবে সেটা রুইয়ায়ে সালেহা বা ভালো স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো বাস্তবধর্মী হয় আবার কখনো অসম্ভবও হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা মোকাশাফা সে সময় দেখান যখন রূহ্ শারীরিক আচ্ছাদনের বাইরে থাকে। অনেক স্তরে নফ্স রূহের সাথে অংশীদার থাকে। যাকিছু দেখে তাতে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে। সত্যটুকু রূহের অংশ আর মিথ্যা নফ্সের অংশ। কেননা সততা রূহের চিরাচরিত গুণবৈশিষ্ট্য আর মিথ্যাচার নফ্সের স্বভাব। অনন্তর সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ বিশেষ।

হযরত আয়েশা রা. এর পূর্বোক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওহীর সূচনা হয়েছিল বাস্তব স্বপ্নের মাধ্যমে, যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সুবহে সাদিকের মত বাস্তব ও স্পষ্ট হতো। মুরীদ যখন আলমে ওয়াকিয়া তথা নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় দেখে যে, সে চতুষ্পদ জন্তু, হিংস্র প্রাণী কিংবা সাপ-বিচ্ছুর সাথে মোকাবেলায় রত অথবা কাফির বিধর্মীদের সঙ্গে বিবাদে নিরত আছে, তখন শায়খ বুঝে নেন যে, মুরীদ নফ্সের মোজাহাদায় মগ্ন আছে। তখন শায়খের কর্তব্য হচ্ছে, তাকে মোজাহাদা ও সাধনার ওপর দৃঢ়পদ থাকার হুকুম দেয়া। যাতে মুরীদ মোজাহাদা ও নফ্সের ধোঁকার ব্যাপারে গাফেল হয়ে বসে না থাকে।

মানুষ তৈরির উপাদান ও তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

স্মরণ রাখতে হবে, মানুষ তৈরির চার উপাদান যথা- পানি, অগ্নি, মাটি ও বায়ু। এর মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য অপরিহার্য স্বতন্ত্র গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পানীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সঙ্গম বা মেলামেশার আগ্রহ, দ্রুত আদর সোহাগ গ্রহণের মানসিকতা, ভ্রম ও নিদ্রার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাওয়া। এ পানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ অতিক্রম করার সময় বহু নদ-নদী, হ্রদ-সমুদ্র, কূপ-জলাশয়, সবুজ উদ্ভিদ ও তৃণলতা দেখতে পায়।

মাটির গুণগুলো হচ্ছে, ঘনত্ব, ক্লেদ, তমসা, মূর্খতা, কাঠিন্য ও রুক্ষতা। খিলওয়াত যাপন করে সালেক যখন মোজাহাদা ও সাধনা করতে থাকে, তখন তার তমসা ক্লেদ ও রূঢ়তা স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতায় পরিবর্তিত হয়। যখন সালেক এ সিফতসমূহ অতিক্রম করতে থাকে, তখন মরুভূমি, বন-জঙ্গল ও অনাবাদী ঘর-বাড়ি আলমে ওয়াকিয়াতে তার দৃষ্টিগোচর হয়।

অগ্নি উপাদানের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রোধ, অহংকার, বড় হওয়ার চাহিদা, নেতৃত্ব ও পদের মোহ, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি। এ স্তর অতিক্রমের সময় প্রদীপ, বাতি, বিদ্যুৎ, মশাল প্রভৃতি বিভিন্ন আলোকময় বস্তু দেখা যায়। উক্ত চার উপাদানের মধ্যে অগ্নির প্রভাব সর্বশেষে খতম হয়।

বায়ূ উপাদানের স্বভাব হচ্ছে, যৌনসম্ভোগ প্রীতি, অতিশয় বিরক্তি, দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন প্রবণতা। বায়ূর বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করার সময় সালেকের নিজের কাছে মনে হয়, সে যেন ওপরের দিকে যাচ্ছে বা হাওয়ায় উড়ছে।

একটি সহীহ হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সিদ্দীকীনের কলব থেকে সর্বশেষে নেতৃত্ব ও পদলোভ বের করা হয়। এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বশেষে তাঁরা আগ্নেয় গুণবৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি লাভ করে। অনন্তর এ গুণটি নুফূসের ওপর বেশিরভাগ সময় আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

জেনে রাখা উচিত, মোকাশাফা যখন রূহের হাকীকত থেকে উৎসারিত হয় তখন সূর্যের মতো দেখা যায়। যখন কলবের হাকীকত থেকে হয় তখন চাঁদের মতোদেখায়। যদি সালেকের ওপর সিফাতে কলবী তাজাল্লী ফেলে তখন তারকার চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। শেষোক্ত প্রকারের ভিতরে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলে কিন্তু পুরোটাই মিথ্যা নয়। কেননা, এতে রূহের অনুধাবন মিশ্রিত থাকে। রূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সততা আর তাই এর মোশাহাদার ভিতরে সততা অবশ্যই শামিল থাকে।

সুতরাং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর উচিত, নফসের সংমিশ্রণজনিত সন্দেহের অংশটা পৃথক করে রূহ ও আত্মালব্ধ অনুধাবন মোতাবেক ব্যাখ্যা দিবে ও নফসানি খাতরা বা সন্দেহের দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করবে না। মানুষের খেয়াল ও কল্পনা নফসানি খাতরাতের অন্তর্ভুক্ত। কল্পনা শক্তি প্রতিটি কাল্পনিক সুরতকে একটি করে পোশাক পরিয়ে নফ্সের সামনে পেশ করে।

কাজেই, নফসানী খাতরার ওই সুরতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ও ঘুমের ভিতরে তা স্বপ্ন হয়ে দৃশ্যমান হয়। যেমন- এক ব্যক্তি মানুষের মাঝে যশ-খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে রিয়াযত ও সাধনা শুরু করল। এরপর সে আলমে ওয়াকিয়াতে দেখে- সমস্ত মানুষ তাকে তা'যীম করছে, সাজদা করছে তখন ব্যাখ্যাতার কর্তব্য হচ্ছে, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিবে না; বরং একে বাতিল খেয়াল মনে করবে। পরন্তু বুঝে নিবে, যে এটা তার মনের চাহিদার প্রতিচ্ছবি। আর সে মনের বাসনা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখেছে। এ জাতীয় স্বপ্নকে "আযগাছে আহ্লাম" বা কল্পনাপ্রসূত অসার স্বপ্ন বলা উচিত। অর্থাৎ, কল্পনা শক্তি নফ্সের খেয়ালকে তার চাহিদা মোতাবেক দৈহিক পোশাক পরিয়ে নফ্সের সম্মুখে তুলে ধরেছে ফলে সে তাই দেখেছে। মোটকথা, এ ধরণের ওয়াকিয়া ও স্বপ্ন দু'টাই মিথ্যা হয়ে থাকে। এগুলো ব্যাখ্যার যোগ্য নয়।

মনে রাখবে, আলমে গায়ব বা অদৃশ্য জগতের কিছু বস্তু এমন আছে, যার প্রকৃত গঠন কেবল আলমে গায়বেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। জড় জগতে কেবল অস্থায়ী আকৃতিতে তার প্রকাশ ঘটে। যেমন- ফেরেশ্তা ও জড়মুক্ত রূহ এর ব্যাপারটিই ধরা যাক। হযরত জিবরাঈল আ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কখনো হযরত দিহ্ইয়া কালবী রা. এর আকৃতি আবার কখনো আসতেন বেদুঈন বেশে। হাজেরীনে মাজলিস তাঁকে বিশেষ আকৃতিতে দেখতে পেত।

স্পষ্ট কথা হচ্ছে, এটা তাঁর মূল আকৃতি ছিল না; বরং এটা ছিল অস্থায়ী আকার। তাছাড়া এটি দর্শকদের কল্পনাশক্তির প্রতিফলনও ছিল না। যদি তাই হতো তাহলে সবাই তাকে এক আকৃতিতে দেখত না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে দেখত। কারণ, সকলের কল্পনাশক্তি এক নয়। যাহোক, এটি ছিলো হযরত জিবরাঈল আ. এর প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ তাছার্রুফ ক্ষমতার ফল। তাই তিনি যখন যে রকম চাইতেন সে রকম আকৃতি ধারণ করতে পারতেন।

আরেক ধরণের মোকাশাফা বা অদৃশ্য অবলোকন হচ্ছে, যার সাহায্যে দূরে অবস্থিত বস্তু দেখা যায়। যেমন- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মে'রাজের সফরের কথা বললেন, তখন মক্কার কাফের সম্প্রদায় তা প্রত্যাখ্যানপূর্বক বলল, যদি এ কথা সত্যই হয়ে থাকে তাহলে বল, মসজিদে আকসার পিলার কয়টি? তৎক্ষণাত গায়বের পর্দা ওঠে গেল ও কাশ্ফের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আকসা দেখতে পেলেন, এরপর গুণে গুণে খুঁটির সংখ্যা বলে দিলেন।

একদা লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করল, যে কাফেলাটি সিরিয়া রওনা হয়ে গিয়েছে সেটি আজ কোথায় আছে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা মক্কা থেকে এক মঞ্জিলের দূরত্বে অবস্থান করছে। সেমতে পরের দিন ভোরে উক্ত কাফেলা মক্কা নগরীতে এসে পৌঁছে।

তদ্রূপ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. বলেছিলেন, আমার অন্তরে এল্‌কা হয়েছে, আমার স্ত্রী বিনতে খারেজার গর্ভে কন্যা সন্তান আছে। বাস্তবে দেখা গেল, কন্যা সন্তানই ভুমিষ্ট হয়েছে। এটিও উক্ত মোকাশাফার অন্তর্ভুক্ত।

তেমনি ভাবে হযরত ওমর ফারূক রা. এর মোকাশাফার একটি উদাহরণ হচ্ছে, তিনি হযরত সারিয়া রা. এর সেনাপতিত্বে নেহাওয়ান্দ অঞ্চলে একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে জুমুয়ার দিন কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল। কাফের বাহিনীর একটি দল পাহাড়ের পিছনের ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতেছিল। হযরত ওমর ফারূক রা. সে মুহূর্তে মদীনা মুনাওয়ারায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে জুমুয়ার খুতবা দিচ্ছিলেন। এত দূর দেশের রণাঙ্গনের চিত্র তাঁর সামনে মাকশূফ ও দৃশ্যমান হলো। তখন তিনি বললেন, হে সারিয়া! আল জাবাল অর্থাৎ, পাহাড়ের দিক থেকে নিজেদের হেফাযত কর। হযরত সারিয়া রা. হযরত ওমর রা. এর এ ধ্বনি নিজ কর্ণে শুনতে পেলেন এবং গুপ্ত শত্রু বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা চালালেন।

মাশায়েখের জীবনে এজাতীয় অসংখ্য মোকাশাফার ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

জেনে রাখা উচিত, কাশ্‌ফ দ্বারা সালেকের ফায়দা হচ্ছে, সে তার মাধ্যমে নফ্‌সের বল্যাণ-অকল্যাণ এবং সায়ের ও সুলূক তথা আল্লাহর অভিমুখে যাত্রাকালে নিজ অবস্থার উন্নতি অবনতি বুঝতে পারে। মোকাশাফা তার হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয়। অনন্তর হক, বাতিল, নফ্‌সানী, শয়তানী, রহমানী ও প্রাণীসূলভ পাশবিকতা ও ফেরেশ্‌তাসূলভ কর্মকাণ্ডের মাঝে পার্থক্য বিধান করতে পারে। কেননা, নফ্‌সের ওপর যখন পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও পার্থিব মোহ প্রভৃতি নিন্দনীয় বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করে, তখন কল্পনাশক্তি ওই বস্তুগুলোকে এমন জীব জন্তুর আকৃতিতে তার সামনে তুলে ধরে, যে জীব জন্তুর ভিতরে উক্ত নিন্দিত স্বভাবটি প্রবল। যথা- লোভের চরিত্রকে ইঁদুর ও পিঁপড়ার আকৃতিতে এবং বদনিয়তীকে শুকরের আকৃতিতে দেখায়।

তাকাব্বুরকে চিতা বাঘের আকৃতিতে ও কৃপণতাকে কুকুরের আকৃতিতে তুলে ধরে। হিংসাকে সাপের আকারে আর ক্রোধকে বানরের আকারে প্রকাশ করে। অন্যান্য হিংসস্র প্রাণির স্বভাব যেমন- যুলুম, অত্যাচারকে সিংহ অথবা অন্যান্য হিংস্র প্রাণির সুরতে আর খাহেশ ও কামবৃত্তিকে গাধার আকারে পেশ করে। পাশবিকতাকে বকরির সুরতে এবং শয়তানী স্বভাব যেমন- প্রতারণা ও বিভ্রান্তিকে শয়তান, জ্বিন বা ভূত-প্রেতের রূপে এবং চক্রান্ত ও টাল-বাহানাকে শৃগাল ও খরগোশের রূপে দৃশ্যমান করে।

সারকথা, যখন এসব সুরত নজরে আসবে মনে করতে হবে, এ চরিত্রগুলো সালেকের ওপর প্রবল ও জয়ী হয়েছে। কাজেই, তা থেকে পবিত্র ও নিস্কলুষ হওয়ার চেষ্টা করবে। যদি এসব সুরতকে নিজের অনুগত দেখে তাহলে মনে করবে, এগুলোকে সে অতিক্রম করছে। আর যদি দেখে, ওই জন্তুগুলো খাঁচাবদ্ধ অথবা তাকে হত্যা করছে তাহলে বুঝবে, এ চরিত্রগুলো থেকে মুক্তি লাভ হবে। যদি এগুলোর সাথে মোকাবেলায় রত দেখে তবে এ খেয়াল ও কল্পনা থেকে পরিত্রাণ না পাওয়া পর্যন্ত গাফেল ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না।

সুলূকের কোন কোন মাকামে এ গায়েবী বিষয়গুলো তরীকতের শিশুদের খোরাক। এর দ্বারা তরীকতের প্রারম্ভিক শিক্ষার্থীদের তরবিয়ত করা হয়, যাতে তারা এসব দেখে আনন্দচিত্তে সামনে কদম বাড়াতে পারে। পরন্তু সুলূকের অনেক মাকাম ও স্তর গায়েবী বিষয়সমূহের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া অতিক্রম করা সম্ভব নয়। (সুতরাং তাদের তরবিয়ত ও লালনের ক্ষেত্রে গায়েবী বিষয়সমূহ যে কতটা কার্যকর তা স্পষ্ট।)

এখান থেকে আরো বোঝা যায়, মুরীদের জন্য অবশ্যই কোন শায়খ থাকা জরুরি। কেননা, অস্তিত্ব ও নফ্‌স এর স্তর অতিক্রমের সীমা পর্যন্ত সালেক নিজেই পথ অতিক্রম করতে পারে। কারণ, সেগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির বহু সহায়ক চিহ্ন রয়েছে, যার অনুসরণ করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু রূহানিয়তের মাকামে পৌঁছার পর গায়েবী তাছার্‌রুফ ও সহায়তা ছাড়া সামনে চলাই দুস্কর।

অতএব, ওই মাকামে যদি শায়খের বেলায়াতের ফয়যান অথবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের কৃপা অথবা আল্লাহর সিফাত বা গুণের তাজাল্লিয়াতের মাধ্যমে গায়েবী সাহায্য পাওয়া যায়। কেবল তখনই সালেকের পক্ষে ফানা ও অস্তিত্ব নাশের স্তরে পৌঁছা সম্ভব। যে পর্যন্ত ফানা এরপর ফানাউল ফানা অর্থাৎ, অস্তিত্ব বিনাশের বিনাশ অর্জন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাকা ও বাকাউল বাকা তথা অনন্ত অস্তিত্ব লাভের স্তর ও সুলূকের মূল লক্ষ্য তামকীন তথা আমল ও হালের দৃঢ়তা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়।

প্রকাশ থাকে যে, কলবী, রূহী, মালাকী, রাহমানী প্রভৃতি বিষয়গুলোর মধ্যে প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ রয়েছে, যা নফ্স আস্বাদন করে থাকে। যখন সূধা পান করে, তখন এমন যওক, শওক ও প্রেরণা শক্তি অনুভব করে; যার ধরণ ও প্রকৃতি শারীরিক স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরপর তখন গায়েবী জগতের তত্ত্ব ও রহস্যভাণ্ডার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, তলব ও অন্বেষণ জগতের দিকে পূর্ণ মনযোগী হয়। তখন পানাহারের স্থান হিসেবে অদৃশ্য জগতকেই বেছে নেয়।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

"প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘাট জেনে নিয়েছে।" [সূরা বাকারা : আয়াত-৩০] বলে কুরআন মাজীদ সে হাকীকতকেই ব্যক্ত করেছে।

কোন কোন আকাবির বলেছেন, শয়তান যখন জানতে পারল, সালেক দীনি শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে বেশ অজ্ঞ, অথচ যখন তার গায়েবী বিষয়গুলোর মোকাশাফা বা অবলোকন হয় তখন শয়তান নানাভাবে তার সাথে ঠাট্টা করে। কখনো তার ওপরে বৃষ্টির মত প্রস্রাব বইয়ে দেয়। অথচ সে ভাবে, বোতল থেকে তার গায়ে গোলাপজল ছিটানো হচ্ছে। এভাবেই সে নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং শয়তান তার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই একজন ফকীহ্ বা দীনি ইল্মধারী ব্যক্তি এক হাজার আবেদের চেয়েও শয়তানের কাছে অধিক ভারী ও কঠিন।"

(জামে সগীর : ১/৩৭১, তাবরানি : ১০/৬৩, কানযুল উম্মাল : ৬/২৬৫)

অধিকন্তু এ কথাটি যুক্তিসিদ্ধও বটে। কারণ, আলেম ফকীহ্ যদি ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে তত তৎপর নাও হয় তবে হয়ত তাকে বোকা বলা যাবে, কিন্তু সে তার ইল্ম ও ফিক্হ দ্বারা অসংখ্য মানুষকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে, তাদেরকে দীনি মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দিবে। পক্ষান্তরে জাহেল সালেক তার অশুদ্ধ ইবাদত ও বাতিল মোকাশাফা মিশ্রিত মূর্খতার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এ ধরণের মূর্খদের সাথে শয়তানের নিম্নতম আচরণ হচ্ছে, সর্বাগ্রে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তাজাল্লী যাহের করেন, সেটিই তাঁর আসল নূর। যখন এ বিশ্বাস অন্তরে সুদৃঢ় হয় তখন আচরণ হচ্ছে, ফিরকায়ে মুজাস্সিমা (আল্লাহ্ তায়ালার শারীরিক আকৃতিতে বিশ্বাসকারী দল) এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কুফরের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়।

অতঃপর যদি কখনো আলমে ওয়াকিয়াতে দেখতে পায়, আল্লাহ তায়ালা তার ওপরে কোন এক সুরতে তাজাল্লী ফেলেছেন, তাহলে তার বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয়ে যায়। তাজাস্সুম, তাশাব্বুহ্ বা আল্লাহ তায়ালার আকার ও সাদৃশ্য বিশ্বাসের দরুণ সে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যায়।

তখন শয়তান হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখের সোহবত থেকে এ ওয়াস্ওয়াসা দ্বারা তাকে বঞ্চিত রাখে, পৃথিবীতে- এমন কে আছে যে, তোমাকে তার দ্বারস্থ হতে হবে? অথবা তার অনুকরণ করতে হবে? আল্লাহ্ তায়ালা তো তোমাকে কলবের এমন স্বচ্ছতা দান করেছেন যা নবী-রাসূগণের ভাগ্যেও জোটেনি। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা কোন দরখাস্ত ও আবেদন ছাড়াই তোমার ওপর তাজাল্লী প্রকাশ করেছেন। অথচ হযরত মূসা আ. আল্লাহর দীদারের জন্য সবিনয় আবেদন করেছিলেন?

উত্তর এসেছিল, لَنْ تَرَانِيْ অর্থাৎ, আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। এ সুযোগে অভিশপ্ত শয়তান সে নাদানকে বলে, তুমি অনর্থক ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়খে আরেফীনের নিকট কেন যাতায়াত কর? আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা অধিক ইল্মের অধিকারী আর কেউ আছে কী? তিনি স্বয়ং তোমার ওপর অসংখ্য নেয়ামত নাযিল করেছেন। অনুগ্রহপূর্বক তোমার তরবিয়ত করেছেন। তুমি কী বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তায়ালার চেয়েও তোমার লাভ-ক্ষতির জ্ঞান অথবা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের ক্ষমতা অধিক? তিনি তো আযীয, হাকীম, বাছীর, আলীম, কবী, মাতীন অর্থাৎ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞাতা, মহাশক্তিধর ও সুদৃঢ়। বস্তুত তিনিই তো তোমার জন্য যথেষ্ট। কাজেই অন্য কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

মোটকথা, এ ধরণের প্রতারণামূলক বুঝ দিয়ে তার মধ্যে অহংবোধ জাগ্রত করে তোলে। শয়তান খোদ তার শায়খ, মুর্শিদ ও মুয়াল্লিম সেজে আল্লাহ ও তার মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। আসমান ও যমীনের মাঝখানে নিজ সিংহাসন স্থাপন করে তার সামনে রং বেরঙের তাজাল্লী প্রকাশ করে। আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় ক্রমেই

তাকে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে। এরপর জনসাধারণের নিকট সে মূর্খের দরবেশী ও কামালাতকে খুব বড় করে ফুটিয়ে তোলে। এভাবে তার ভালোবাসা ও অনুকরণের জন্য সকলকে আহ্বান করে। পরিণামে সকলেই ধ্বংস হয়।

মাশায়েখ তরীকত বিষয়টি খুব পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেই বলেছেন,

"যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান।"

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেণ, আপনি কখনো তার জন্য পথ প্রদর্শক (হক্কানী পীর) ও সাহায্য কারী পাবেন না।" (সূরা কাহফ : আয়াত-১৭)

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদের অন্যত্র বলেন,

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"যদি তোমাদের ইল্ম না থাকে তবে আহলে যিকির (ওলামায়ে কেরাম) এর নিকট জিজ্ঞেস করে নাও।" (সূরা নাহল : আয়াত-৪৩)

সরওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اِنَّ أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন নক্ষত্রতুল্য। তাঁদের মধ্যে যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে বা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।" (আহকাম ফী উসূলিল কুরআন : ১/৪৪৫)

উক্ত হাদীস দ্বারা পীর-মাশায়েখের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে শয়তানের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার ব্যাপারে স্বীয় বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই, তোমরা তাকে শত্রুই ভাববে।" (সূরা ফাতির : আয়াত-৬)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا بَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا

"হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে। যেরূপ তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করেছিল এবং তাঁদের লেবাস ছিনিয়ে নিয়ে বিবস্ত্র করেছিল।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৭)

অনুরূপ অসংখ্য আয়াতে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। বড় চিন্তার বিষয় হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরাম এত উঁচু মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শয়তানের হঠকারিতা থেকে রেহাই পেতে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِه فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِه

"হে মুহাম্মদ! আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি তাঁদের প্রত্যেকের কিরায়াত বা পাঠের ভিতরে শয়তান স্বীয় বাক্যের শঠতাপূর্ণ এল্কা ও বিক্ষেপ ঘটাতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা শয়তানের বাক্য প্রতিহত করে স্বীয় আয়াত সমূহ দৃঢ় করেন।" (সূরা হজ্জ : আয়াত-৫২)

এ ছাড়া ইবলিস শয়তান হযরত আদম আ. এর সাথে কী অঘটন ঘটিয়েছিল তা কারো অজানা নয়। কাজেই, গণ্ডমূর্খের তো এ জালে আটকা পড়া খুবই স্বাভাবিক।

বেশিরভাগ সময় নানা প্রকার ধোঁকা দিয়ে জাহেলদের থেকে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দেয়। বলে, এখন আর তোমার যাহেরী আহকামের পাবন্দী করার প্রয়োজন নেই। কেননা, মোশাহাদা পর্যন্ত পৌঁছাই তো শরীয়ত ও তরীকতের মূল লক্ষ্য। যা ইতোমধ্যেই তোমার হাসিল হয়ে গেছে। যেরূপ মৃত্যুর পরে শরীয়তের বাধকতা থাকে না, অনুরূপ আসল মকসুদ হাসিল হওয়ার পরেও তা থাকে না। অতএব, এখন তুমি শরীয়তের শৃংখলমুক্ত, যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

আবার কখনো এ রকম বুঝায়, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ইবাদতের পরোয়া করেন না। তোমাকে যে শরীয়তের আহকামের মুকাল্লাফ বানিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য কেবল নফ্সের তাসফিয়া ও তাযকিয়া অর্থাৎ, নফসের পরিস্করণ ও পবিত্রকরণ। তা তো পূর্ণরূপেই তোমার অর্জন হয়েছে। কারণ, আত্মার পবিত্রতা ছাড়া মোশাহাদার মাকামে পৌঁছা সম্ভব নয়, প্রভৃতি বিভ্রান্তিকর চিন্তা-ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে তাকে গোনাহে লিপ্ত করে। অধিকন্তু সে মুহূর্তে তাকে মিথ্যা জ্যোতি ও কৃত্রিম আকর্ষণীয় সুরত দেখায়। এভাবে তার ধারণা আরো মজবুত করে দেয় যে, দেখ, এখন তো শরয়ী তাকলীফ ওঠে গেছে। কেননা, গুনাহ্ও তোমার ক্ষতি করছে না; বরং তোমার গুনাহও নেকীতে পরিণত হয়ে গেছে। তার প্রমাণ তুমি নিজ চোখে তাজাল্লী ও আলোকপাত দেখতে পাচ্ছ।

এগুলো সব শয়তানের প্রতারণা ও গোমরাহী। এগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম বহু উপায় বাতলেছেন। যেমন- এ কথা চিন্তা করবে যে, এ সকল সূফী-দরবেশ তো নবী-রাসূলগণের তাবে'। আর নবীদের মোশাহাদার স্তর অবশ্যই এদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। পরন্তু তাঁরা হাকায়েক ও বাতেনী বিষয়গুলো সবচে বেশি জানেন। এরপরও তাঁরা কখনো সামান্য নেকের কাজও ছাড়েন নি এবং ছোট থেকে ছোট গুণাহ্ করারও দুঃসাহস করেন নি; বরং তাঁরা সর্বদা গুনাহ্ থেকে পরহেয করেছেন এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মোজাহাদা করছেন। এমতাবস্থায় অন্য কারো জন্য গুনাহ করার অবকাশ কোথায়?

সাথে আরো মনে করবে, কুরআন ও হাদীসে এজাতীয় অবসর দানের কথা কোন অবস্থাতেই কারো ক্ষেত্রে বলা হয়নি; বরং কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমা অনুযায়ী শরীয়তের যাহের অথবা বাতেন সংক্রান্ত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অনিহা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনকারীর ব্যাপারে বড় হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। হদ ও তা'যীর তথা শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে; সর্বোপরি শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্জনের ওপর সীমাহীন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

কখনো অবোধ মানুষ আগুন ও সিংহাসন দেখে ধোঁকায় পড়ে যায়। তাকে আপন প্রভু মনে করে সাজদা করে। ফলে ফিরকায়ে মুজাস্সিমার মত তার পরিণতিও চরম ভয়ানক হয়।

জনৈক মিশরীয় ব্যক্তির ঘটনা : একদিন সে মরুর পথে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিল। আকস্মিক শূন্যে এক ঝুলন্ত সিংহাসনের ওপর শয়তানকে আসীন দেখতে পেল। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা যে নিরাকার সে বিশ্বাস তার পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তাকে আল্লাহ ভেবে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। বাগদাদে পৌঁছে তথাকার মাশায়েখের নিকট বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলে তাঁরা বললেন, ও তো শয়তান।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "শয়তানের বিশেষ সিংহাসন আছে; যা আসমান ও যমীনের মাঝে স্থাপন করে তার ওপর সে আসীন হয়।"

পরিশেষে লোকটি ঈমানের নবায়ন করল ও সে সময়কার সমস্ত নামায পুনরায় আদায় করল। এরপর থেকে যেখানেই সে ঐ আকৃতি দেখত অভিশাপ করত আর বলতো, নিশ্চয়ই তুই শয়তান। তোর ওপর আল্লাহর লা'নত ও অভিশাপ। অনন্তর আমি আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ঈমান রাখি।

তাজাস্সুম বা আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে দৈহিক আকৃতি বিশ্বাস থেকে পরিত্রাণের জন্য ওলামায়ে কেরাম বহু প্রমাণ পেশ করেছেন।

এক. সকল নবী-রাসূল, আউলিয়ায়ে কেরাম ও সর্বযুগের মুমিনীন ও ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন, আল্লাহ্ তায়ালার মহান সত্ত্বা জিস্ম ও শরীর থেকে মুনায্যাহ, পবিত্র। পরন্তু শারীরিক কোন বস্তু ও তার বৈশিষ্ট্যের

সাথে তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই। সকল বস্তু মাখলূক ও হাদেছ বা সৃষ্ট ও উদ্ভুত। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা সব কিছুর খালেক, কদীম, আযালী ও আবাদী অর্থাৎ তিনি স্রষ্টা অনাদি অনন্ত। কখনো বাতিলের ওপর আল্লাহর প্রিয় ও মাকবূল বান্দারা একমত হতে পারেন না, এ কথা সকলেরই জানা।

শয়তান বেশিরভাগ সময় জাহেলদের মাঝে হুলুল তথা নিজ সত্ত্বার মধ্যে আল্লাহর সত্ত্বা প্রবিষ্ট থাকার আকীদা সৃষ্টি করে। এরপর তার সমর্থনে অসংখ্য দলিল খাঁড়া করে। যেমন- তাদেরকে বুঝায়, আধ্যাত্মিক জাতীয় তোমরা যাকিছু প্রত্যক্ষ করছ, তাসবই তোমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু। কারণ, বাইরে এসব দেখা যায় না। এরপর যখন বাতেনী কোন বস্তু তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মনে করে, এগুলো আমাদের সত্ত্বার অংশ বিশেষ বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালাও তাই। তিনিও আমাদের থেকে ভিন্ন কিছু নন। তিনি আমাদের মাঝেই প্রবিষ্ট। (কেননা আমরা তাঁকে তো হৃদয় মাঝে অবলোকন করে থাকি।) নাউযুবিল্লাহ্। কাজেই, এ জাতীয় মূর্খদের আকীদা বাতিল প্রমাণিত হলো।

এক শ্রেণির আবেগপ্রবণ হালত প্রভাবিত জাহেল দরবেশ রয়েছেন, হালতেরর শক্তির কারণে কারামতস্বরূপ তার মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এসময় শয়তান তার ভিতরে এ খেয়াল সৃষ্টি করে যে, তোমার মধ্যে যে শক্তি এ হালের অবতারণ করেছে সে তো স্বয়ং আল্লাহ্। পরন্তু তিনিই তোমার ভিতর থেকে স্বীয় কুদরত দেখাচ্ছেন এবং এসব অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটাচ্ছেন। তখন ঐ মূর্খ ব্যক্তি হুলূলে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

এর থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে, গভীরভাবে চিন্তা করবে, যাকিছু হচ্ছে তা সবই হালতের তা'ছীর। বস্তুত হালত হচ্ছে, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার সদয় দৃষ্টি। স্পষ্ট কথা, দ্রষ্টা ও দৃষ্টি কখনই এক নয়।

কখনো এমন হয় যে, সালেক মনোবৃত্তির জগতে অবস্থান করে তখন স্বপ্নে অথবা হালের প্রাবল্যের কারণে বলতে থাকে, আমি আল্লাহ। ব্যাস, সে মনে করতে থাকে, বাস্তবে আমি আল্লাহই হবো। কারণ, আমার মাঝে আল্লাহ্ তায়ালার হুলূল বা অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ এ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানা খুবই জরুরি। আর তা হচ্ছে, এ ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত নফ্সের গোলাম। পরন্তু নফ্সকে মাহবূব, খাহেশাতকে মা'বূদ ও উপাস্যের স্থান দিয়ে রেখেছে।

এর চিকিৎসা হচ্ছে, নফ্স ও হাওয়া তথা প্রবৃত্তির আনুগত্য ত্যাগ করা। অর্থাৎ, নফ্সের খাহেশাতকে রিয়াযত, মোজাহাদা ও মেহনত সাধনার মাধ্যমে দূরীভূত করতে হবে। কল্পনাশক্তি কীকরে এ সকল দৃশ্য আমার মনে জাগরুক করল, এ জাতীয় প্রশ্ন এনে বিষয়টিকে কঠিন বানাবে না। কেননা, স্বপ্নদ্রষ্টাও তো অন্যদের মত একজন সাধারণ মানুষ।

যেভাবে অন্যরা স্বপ্নে নিজেকে নূহ আ., আদম আ., ঈসা আ., মূসা আ. অথবা জিব্রাঈল আ., মিকাঈল আ. অথবা অন্য কোন ফেরেশ্‌তা বা কোন হিংস্র প্রাণির সুরতে দেখতে পায়, কখনো নিজেকে উড়তে দেখে প্রভৃতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর বস্তু দেখে। এ ব্যক্তি সে দেখার মাঝে আশ্চর্যের কী আছে?

কখনো হুলূলের ভ্রান্ত ধারণা এভাবেই সৃষ্টি হয় যে, সূফী যখন আলমে নফ্স ও হাওয়া অতিক্রম করে আলমে হাকীকত ও ফানা পর্যন্ত পৌঁছে তখন আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেখেও না, জানেও না। সবকিছুকে এমনকি নিজের নফ্সকেও ভুলে যায়। সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট এর নামই ফানা বা আত্মবিস্মৃতি। এ স্তরে পৌঁছার পর সে যেদিকেই তাকায় না কেন আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই দেখে না। তখন মনে করে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমিই আল্লাহ্। আর এ সময়ই আনাল হক (আমিই আল্লাহ) জাতীয় উক্তি মুখ থেকে বের হতে পারে; যা শুনে শ্রোতারা হুলূল বা বান্দার অস্তিত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রবেশের মত ভ্রান্ত আকীদার শিকার হয়।

এ ভাবনা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে, সূফিকে মনে করতে হবে, তার ভিতরে এরূপ ধারণা কেবল এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ববিষয় ভুলে এমনকি নিজের নফ্স ও সিফাতকেও ভুলে আল্লাহ তায়ালার দীদার ও দর্শনে বিলীন হয়ে আছে। এজন্য বস্তু জগতের কোন জিনিসই তার চোখে পড়ে না। অথচ বস্তুনিষ্ঠ বিচারে সকল বস্তু পূর্বের মত স্ব স্ব অবস্থার ওপরে বহাল ও বর্তমান আছে। এ স্তরে পৌঁছা তো খুবই ভাল। কেননা, এটি একটি উঁচু স্তর। তদুপরি যেহেতু হুঁশে আসার পর নিজের মূর্খতার দরুণ স্বয়ং সূফির হুলুলের মত জঘন্য ভ্রান্ত আকীদার শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। কাজেই এপর্যায়ে আসার পর নিজের হেফাযতের জন্য কোন শায়খে কামেলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন খুবই জরুরি।

কখনো সূফী এমন স্তরে পৌঁছে যে, সে যে জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেখানেই আল্লাহকে বিদ্যমান দেখতে পায়। এটি হচ্ছে মোশাহাদায়ে মা'রেফতের স্তর। তাই বলা হয়েছে, "আমি যে বস্তুর দিকেই তাকাই আল্লাহকে পাই।"

কেউ কেউ বলেছেন, "আমি যা-ই দেখেছি তার পূর্বে আল্লাহকে পেয়েছি।" এখানেও হুলুলের ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা এর থেকে অনেক উর্ধ্বে।

এ রোগ থেকে নাজাতের উপায় হচ্ছে, একীনের সাথে জানবে, এটি আল্লাহ্ তায়ালার আযমত, কিবরিয়া বা মহত্ব ও বড়ত্বের পর্দা যা সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্ তায়ালা সকল বস্তু বেষ্টন করে আছেন। আসমান ও যমীনে একটি অণু-পরমাণুও তাঁর থেকে গোপন নয়। এতদসত্ত্বেও খালেক ও মাখলূক অর্থাৎ, স্রষ্টা ও সৃষ্ট এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় এক হওয়া কষ্মিনকালেও সম্ভব নয়।

কাজেই, খালেকের ভিতরে মাখলুক প্রবিষ্ট হওয়া অথবা মাখলুকের ভিতরে খালেক প্রবিষ্ট হওয়া উভয়টিই অসম্ভব। আম্বিয়া আ., আউলিয়া ও ওলামায়ে কেরাম সবসময় হুলূল আকীদার বিরোধী ছিলেন। এটি যে গোমরাহী সে ব্যাপারে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকতে পারে কী? কাজেই, এ থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কেননা, এ স্তরের বড় বিপদই হচ্ছে, এ ভ্রান্ত আকীদা।

অনুচ্ছেদ-১৫

উম্মতের মুহাম্মদী সা. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

মনে রাখতে হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত অন্যান্য উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ

"হে উম্মতে মুহাম্মাদী! তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১০)

جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

"আমি ন্যায়পরায়ণ জাতিরূপে তোমাদের তৈরি করেছি।" (সূরা বাকারা : আয়াত- ১৪৩)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা দু'টি হতে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে বেলায়াত কায়েম থাকবে। কখনো তারা আউলিয়ায়ে কেরামের ছায়া থেকে বঞ্চিত হবে না।

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يُبَالُوْنَ مَنْ خَالَفَهُمْ ، أَوْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একদল লোক হকের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ও হক নিয়ে জয়ী থাকবে। আল্লাহ্ কর্তৃক তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। কারো অসহযোগিতা তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" (জামেউল উসূল : ৯/২০৫)

সকল আহলে ইল্ম একমত যে, এর দ্বারা ওলামায়ে কেরামের জামায়াত উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁদের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, "আল্লাহ্ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে সজীব রাখুন, যে আমার কথা শুনে তা সংরক্ষণ করল। অতঃপর অন্যদের নিকট তা যথার্থভাবে পৌঁছিয়ে দিল।"

(আতহাফুল খিয়ারা : ১/২১৬, ফাতহুল কবীর : ৩/২৯১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলেম সম্প্রদায়কে ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে অনুপস্থিতদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।" (মুস্তাদরেকে হাকেম : ৭/২১৬)

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়পরায়ণ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছাড়া দাওয়াত বা পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া যায় না। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে এ দায়িত্ব পালনে সর্বোত্তম দল হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম রা.। অতঃপর তাবেয়ীন, তৎপর তাবে' তাবেয়ীনের তবকা।

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ, অতঃপর তার পরবর্তী যুগ, এরপর তার পরবর্তী যুগ।"

(আতহাফুল খিয়ারা : ৭/১২০, মুয়াত্তা : ৩/২৯৫, তুহফাতুল আহওয়াযী : ১২/৪৬৯)

হযরত ইব্রাহীম আ. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি যখন আসমানী সহীফা'র ভিতরে এ উম্মতের ফযীলত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দেখতে পেলেন, তখন দোয়া করলেন, "রব্বুল আলামীন! এ সম্প্রদায়কে আমার উম্মত বানিয়ে দিন।" ইরশাদ হলো, এদেরকে তোমার উম্মত বানাবো না। কেননা, এরা আমার হাবীব মুহাম্মদ এর উম্মত।" অতঃপর ইব্রাহীম আ. আরয করলেন, "মা'বূদ! যদি এদেরকে আমার উম্মত না বানান তাহলে আমার ব্যাপারে তাদের মুখকে খাঁটি রাখুন।"

হযরত ইব্রাহীম আ. এর উক্ত দো'য়া কবুল হলো। (অর্থাৎ, সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী ইববাহীম আ. কে আল্লাহর নবী ও খলীল হিসেবে স্বীকৃতি দিল।) এ কারণেই আত্যাহিয়্যাতু এর পরে যে দরূদ পড়ার কথা বলা আছে তম্মধ্যে সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নামের পরে হযরত ইব্রহীম আ. এর নামকেও শামিল করেছেন। আর তাঁর শান হচ্ছে,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

"তিনি মনের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। যা বলেন আল্লাহর হুকুম তথা ওহীর মাধ্যমে বলেন।"

(সূরা নাজম : আয়াত-৩)

এ ছাড়া অন্যান্য জায়গায়ও তাঁকে দোয়ায় শরীক করা হয়েছে। অনুরূপ হযরত মূসা আ. যখন তাওরাতে এ উম্মতের প্রশংসা দেখতে পেলেন তখন তিনি আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন, "পরওয়ারদেগার! এদেরকে আমার উম্মত হিসেবে মঞ্জুর করুন। উত্তর আসল, 'না'; তা হবে না। এরা আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। তখন তিনি দোয়া করলেন, তাহলে আমাকে এ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করুন। ঘোষণা হলো, তুমি তাদের যুগ পাবে না। কেননা, তোমার নবুয়তকাল তাদের অনেক পূর্বে।"

ঠিক এভাবে হযরত ঈসা আ. ইঞ্জিল শরীফে এ উম্মতের মর্যাদা দেখে নিজের উম্মত হিসেবে পাওয়ার আশা করেছিলেন। সে আশা পূরণ না হওয়ায় তিনি দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাকেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" তাঁর দোয়া অবশ্য কবুল হয়েছে।

তাই তো আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শেষ যুগে কিয়ামতের পূর্বে তাঁকে যমীনে অবতীর্ণ করে এ উম্মতের মধ্যে গণ্য করবেন।

পরিশিষ্ট

কয়েকটি ব্যবহারিক পরিভাষা ও তার বিশ্লেষণ

সাহাবী :

কোন কোন আলেমের মতে, সাহাবী হচ্ছে যে মুসলমান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবতে কিছু কাল অবস্থান করার সুযোগ না পেলেও কমপক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করেছে। অবশ্য কেউ কেউ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসার শর্তও উল্লেখ করেছেন। তবে সাহাবী হওয়ার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে অবস্থান করা যুক্তি ও পরিভাষার দাবী। বস্তুত সোহবত তথা সাহচর্য লাভের অর্থ এটিই।

তাবেয়ী :

অনুরূপ তাবেয়ী এর সংজ্ঞা নিয়েও বেশ মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে তাবেয়ী হওয়ার জন্য কোন সাহাবীর দর্শনই যথেষ্ট। অনেকে তাঁর সোহবতে থাকা ও তাঁর সাথে ওঠা-বসা শর্ত।

অলী :

অলী অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধু। আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধুত্বের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ওপরে ঈমান আনা। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"আল্লাহ্ ওই সকল মানুষের বন্ধু যারা ঈমান এনেছে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৭)

আকাবিরের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, বেলায়েত দু' প্রকার;

এক. বেলায়েতে আম্মা বা সাধারণ বন্ধুত্ব : যার অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার শত্রুতা থেকে মুক্তি লাভ করা। আল্লাহর শত্রুতার অর্থ কুফর ও মুনাফেকি। এ অর্থে সকল মুমিনই আল্লাহর অলী। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

"আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে কুফরের বহুবিধ আঁধার থেকে বের করে ঈমানের আলোর দিকে আনেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৭)

দুই. বেলায়েতে খাস্সা বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব : ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে যাঁরা সবসময় নিরলস অধ্যবসায়ী এ ঘনিষ্ঠতা তাঁদের হিস্সা। যেমন- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট খাস অলীর সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর অলী কারা? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "যাঁদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে।"

আল্লামা আবূ নুআঈম রহ. "হিলয়াতুল আউলিয়া" গ্রন্থে উক্ত রেওয়ায়েত নকল করেছেন। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "মানব জগতের মধ্যে আমার মুহিব্বীন ও বন্ধু ওই সকল লোক, আমার আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে যাদের আলোচনা এসে যায় এবং যাঁদের আলোচনার সময়ও আমি আলোচিত হই।"

'হাকায়েকে আসলামী'র ভিতরে উল্লেখ আছে, হযরত ঈসা আ. বলেছেন, তোমরা ওই সকল লোকের সাথে ওঠা-বসা কর, যাঁদের সাক্ষাত তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আখেরাতের আগ্রহ সৃষ্টি করে। এটিই হচ্ছে, সে বেলায়েতে খাস্সা।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে ও সকল তালেবকে এ নেয়ামত নসীব করুন।

মোটকথা, কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে আল্লাহর খাস অলীদের আগমন ধারা অব্যাহত থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "সমাজে একশ্রেণির লোক রয়েছে, যাঁদের মাথার কেশগুচ্ছ এলোমেলো, পরনে দু'টি পুরাতন কাপড় এবং জীর্ণ-শীর্ণ বেশ-ভূষার কারণে কেউ তাঁদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। (অথচ তাঁরা খাঁটি অলীআল্লাহ।) যদি তাঁরা আল্লাহর নামে কসম করে কোন কথা বলেন তবে আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তাঁদের কথা সত্য করে দেখান।"

কোন কোন সূফী বলেন, এ হাদীসটি এ কথার দলিল যে, যুগে যুগে আল্লাহ্ তায়ালার খাস বান্দা ও আউলিয়ায়ে কেরামের আবির্ভাবের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। নবুয়তের বিছানা গুটানো হলেও বেলায়াতের বিছানা দিব্যি বিছানো আছে।

কুতুব :

অন্তরের কর্ণ দ্বারা শুন। অনেকে ধারণা করে, আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কুতুব ও নবী উভয়ের মর্তবা সমান। এটি ভ্রান্ত ধারণা। কুতুবের চেয়ে নবীর মর্যাদা অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। কেননা, কুতুব স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী হন না। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ শরীয়তের ধারক বাহক হয়ে থাকেন। যদি সমস্ত অলীআল্লাহ, গাউছ, কুতুবের মর্যাদা ও কামালিয়তকে একত্রিত করে নবীর নবুয়তের সাগরে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা সবই নবীর নবুয়তের সাগরে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যেমন সাগরের জলরাশিতে পানির ফোঁটা ফেললে তা নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। কাজেই, মূর্খদের মত বাজে উক্তি করে মুখ নাপাক করে নিজেকে ধ্বংস করা কোন জ্ঞানীর কাজ নয়।

বলাবাহুল্য, নবীর মর্তবা সমস্ত উম্মত থেকে উঁচু বিধায় নবীকে নবী বলা হয়। কেননা, নবী শব্দটি نبو ধাতু থেকে উদ্‌গত, যার আভিধানিক অর্থ উঁচু হওয়া।

এক. আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

"কিতাবের ভিতর ইদ্রীসের আ. কথা আলোচনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সিদ্দীক ও নবী ছিলেন। আমি তাঁকে উচ্চস্থানে আসীন করেছি।"(সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৬)

অর্থাৎ, জীবদ্দশায়ই তাঁকে আলা ইল্লিয়্যীনে পৌঁছিয়েছি।

দুই. হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনব এবং কাফেরদের হাত থেকে তোমাকে রেহাই দেব।"

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫৫)

তিন. আরো বলেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

"আমি পার্থিব জীবনে তাদের রিযিক বণ্টন করে দিয়েছি এবং কারো অপেক্ষা কারো মর্যাদা উঁচু করেছি।"

(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩২)

অর্থাৎ, নবী-রাসূলগণকে আউলিয়ায়ে কেরামের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

এভাবে সাধারণ মুমিনদের চেয়ে আউলিয়ায়ে কেরামের ও কাফেরের চেয়ে মুসলমানের এবং গায়রে নবীর চেয়ে নবীর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ তায়ালা ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দার প্রতি অহী প্রেরণ করেছেন।" [সূরা নাজম : আয়াত-১০] অর্থাৎ, কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে যে সকল রহস্য এল্‌কা করেছেন তা কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে আপন পালনকর্তার যিয়ারত করেছেন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى , اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى

"কলব যা দেখেছে সে ব্যাপারে কোন মিথ্যাচার করেনি। তিনি যে আল্লাহর যাত ও সিফাত প্রত্যক্ষ করেছেন সে ব্যাপারে কী তোমরা সন্দেহ পোষণ করছ?" (সূরা নাজম : আয়াত-১১-১২)

মোটকথা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চর্মচোখ দ্বারা আল্লাহকে দর্শন করেছেন। এটিই প্রবল অভিমত। এ ব্যাপারে কখনো সংশয়ের প্রশ্রয় দিবে না। আরেকবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার যিয়ারত লাভের মহাসৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى , عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

"অবশ্যই মুহাম্মদ মেরাজকালে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দ্বিতীয়বারের মত আপন পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করেন।" (সূরা নাজম : আয়াত-১৩-১৪)

অর্থাৎ, উক্ত সাক্ষাত লাভের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহার নিকট অবস্থান করছিলেন।

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى এর তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. এভাবে করেছেন, "মুহাম্মদ সাল্লাম নিকটবর্তী হলেন এবং অতিশয় নিকটবর্তী হলেন।" অন্য আকাবির অর্থ করেছেন, তিনি নিকটবর্তী হলেন। অর্থাৎ, পর্দাসমূহ অপসারিত ও উত্তমরূপে উন্মোচিত হল। এমনকি তিনি সকল পর্দা ভেদ করে সমধিক নিকটে পৌঁছলেন। কুরআন কারীমের ভাষ্যানুযায়ী তথায় পালনকর্তার মিলনে ধন্য হলেন। ইরশাদ হয়েছে,

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

"মধ্যখানে কেবলমাত্র দু' ধনুক অথবা তদাপেক্ষা কম ব্যবধান অবশিষ্ট ছিল।" (সূরা নাজম : আয়াত-৯)

সাবধান! দু' ধনুক পরিমাণ জায়গার ব্যবধান থাকার হাকীকত আরেফের নিকট স্পষ্ট। মূর্খরা এর তাৎপর্য বুঝতে না পেরে হালাক ও বরবাদ হতে থাকে। বস্তুত تدلى (তাদাল্লী) অর্থ পর্দা সরে যাওয়া। বস্তুত পর্দা ওঠে গেলে তো কুর্‌ব ও নৈকট্য হাসিল হয়েই গেল। এ কুর্‌বকে অজ্ঞরা হুলূল অর্থাৎ, বান্দার সত্ত্বা মাঝে আল্লাহর অনুপ্রবেশ ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১৭

আত্মশুদ্ধির ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নফ্সকে নূরে রূপান্তরিত করা সম্ভব

জেনে রেখ, সালেকের নফ্স যখন নফ্সে মুতমায়িন্নায় পরিণত হয় তখন তা মোমের মতো নূরানী ও আলোকোজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকে সে সময় নফ্সের পরিভ্রমণ শুরু হয়। তখন তার কিরণ রূহানী জগতে বিরাজ করে। সায়েরের ফলে নফ্স বুযুর্গ ও সম্মানিত হয়ে যায়। বস্তুত সায়ের যত বেশি হয়, সে অনুপাতে তার বুযুর্গী ও আযমত তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নফ্সের সায়ের

تواضع, عبودیت، تسلیم، انقیاد حضور, مراقبہ,

ধ্যানমগ্নতা, সমক্ষ উপস্থিতি, বিনয়, দাসত্ব, সপর্দন ও সমর্পণের ওপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গ বহু হাদীস বর্ণিত আছে-

এক. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তাওয়াযু ও বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা তার মর্তবা বুলন্দ করেন।” (জামে’ সগীর : ৪/৯০৯, মুসান্নাফে আবি শাইবা : ৯/৩৫৭)

দুই. আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা আ. কে জিজ্ঞেস করেন, “মূসা! আমি কী কারণে তোমাকে সমস্ত মানুষের চেয়ে উঁচু ও কালীম বা সংলাপী বানিয়েছি জান কী? ” তিনি আরয করলেন, “পরওয়ারদেগার! আমার তো জানা নেই।” ইরশাদ হল, “আমি তোমাকে আমার পাক দরবারের সবিনয় পতিত দেখেছি, সেজন্য তোমাকে এ মর্যাদা প্রদান করেছি।”

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. রেওয়ায়েত করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কোনো মুসলমানকে তুচ্ছ করবে না। কেননা, নিম্নস্তরের মুসলমানও আল্লাহর নিকট অনেক বড়।” হযরত ইবনে আব্বাস রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন, “বনী আদমের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার মাথায় দু'টি শিকল নেই। যার একটি শিকল সপ্তম আসমানে ও অপরটি জিহ্বার সাথে টানা দেয়া।

যদি আদম সন্তান বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা আসমানি শিকলের সাহায্যে তাকে সপ্তম আকাশেরও উর্ধ্বে নিয়ে যান। আর যদি অহংকার করে তাহলে যমীনওয়ালা শিকল দিয়ে যমীনের নিচে পৌঁছে দেন।” হযরত আবূ হোরায়রা রা. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, “আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার সাথে বিনয় অবলম্বন করে, মাখলুকের সাথে নম্র ব্যবহার করে ও ইহসান এর সাথে জীবন যাপন করে এবং আমার যমীনে থেকে অহংকার করে না, আমি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই। এমনকি তাকে আ'লা ইল্লিয়্যীনে নিয়ে যাই।”

এজাতীয় অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, উবূদিয়ত ও তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা দাসত্ব অবলম্বন ও আত্মা পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা ও এখতিয়ারের বিশেষ দখল রয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কার ভাষায় বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

“নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে নিজের নফ্সের তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধি করেছে।”

(সূরা আ'লা : আয়াত-১৪)

অর্থাৎ, মোজাহাদার তরবারি দ্বারা নফ্সের কামনা-বাসনার কদার্যতা কেটে ফেলেছে। উল্লেখ্য, সায়ের ও পরিভ্রমণের কারণে মানুষের নফ্স নূরানী হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বলেছেন,

قَدْ جَآئَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ

“নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নূর ও স্পষ্ট কিতাবে এসেছে।”

(সূরা মায়েদা : আয়াত-১৫)

এখানে নূর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভয়প্রদর্শনকারী, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং সিরাজে মুনীর তথা উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বানিয়ে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৪৬)

মুনীর অর্থ আলোকদাতা। যিনি অন্যকে আলো প্রদান করেন। যদি অন্যকে আলোকিত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হতো তাহলে এ যোগ্যতা ও কামাল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভিতরেও পাওয়া যেত না। কারণ, তিনি তো আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি আপন সত্তাকে এত পূত-পবিত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি নির্মল নূরে পরিণত হয়েছিলেন। পরন্তু আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁকে নূর বলে অভিহিত করেছেন। বলাইবাহুল্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ছায়া ছিল না। অথচ দেহ বলতেই তার ছায়া থাকে। কেবল নূরেরই কোনো ছায়া থাকে না।

যেভাবে মহানবী স্বয়ং নূর আলোকবর্তিকা ছিলেন, তেমনিভাবে তাঁর অনুসারীদের অন্তরাত্মা পবিত্র করে তাঁদেরকেও নূরে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁদের কারামাতের বর্ণনা দ্বারা কিতাব ভরপুর। এমনকি সেগুলো এত প্রসিদ্ধ যে, বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

"যারা আমার হাবীবের প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের নূর তাদের সামনে এবং ডানে ছুটাছুটি করতে থাকবে।" (সূরা তাহরীম : আয়াত-৮)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

"স্মরণ কর সে দিনটি যেদিন মুমিন পুরুষ ও নারীদের দেখবে, তাদের নূর ছুটছে তাদের সামনে ও ডানে।" (সূরা হাদীদ : আয়াত-১২)

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ

"ওই দিনকে স্বরণ কর, যেদিন মুমিনদের নূর তাদের সামনে ও ডানে ছুটবে। মুনাফিকরা বলবে, একটু থাম, আমরাও তোমাদের আলো থেকে কিছু জ্যোতি নেই।" (সূরা হাদীদ : আয়াত-১৩)

আলোচ্য আয়াতদু'টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ দ্বারা ঈমান ও নূর উভয়টি সাধিত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা আপন নূর দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সকল মুমিনকে।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দোয়াও করেছেন,

"হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার কান, চোখ ও কলবকে নূর বানিয়ে দিন; বরং আমাকেই নূর বানিয়ে দিন।"

যদি মানুষের নফ্স আলোকিত হওয়া অসম্ভব হত, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দোয়া কখনই করতেন না। কেননা, ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে অসম্ভব কাজের দোয়া করাও নিষেধ। হযরত আবুল হাসান নূরী রহ. কে নূরী বলার কারণ হচ্ছে, বহুবার তাঁর থেকে নূর দেখা গেছিল। এভাবে অসংখ্য আউলিয়া, সাধারণ মুসলমান ও শহীদের কবর থেকে নূর উঠতে দেখা যায়। এটি মূলত তাঁদের পবিত্র আত্মারই নূর। কেননা, যখন নফ্সের কাজ عاَلِي হয়ে যায়, তখন তার নূর সম্পূর্ণ শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অতঃপর তা শরীরের মেজাজ ও স্বভাবে পরিণত হয়। এরপর যদি নফ্স শরীর থেকে আলাদাও হয়ে যায়, তবুও সে শরীর নূরের অনুরূপ উৎস ও কেন্দ্রস্থল থেকে যায় যেমন ছিল জীবদ্দশায় নফ্স বাকী থাকা অবস্থায়।

উপসংহার

নফ্সের উবূদিয়ত, মোহাফাযা, মোরাকাবা ও হুযূর এর প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য। এক নিমিষের জন্যও অলসতা করা যাবে না। কেননা, মোহাফাযা বা সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা বান্দার কর্তব্য, পরন্তু এটি তার ইচ্ছাধীন বিষয়। সায়ের তথা আল্লাহর যাতের ভিতরে পরিভ্রমণের তাওফীক আল্লাহর ফযলের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত হেদায়াতের এ তাওফীক নির্ভর করে আগ্রহ, প্রফুল্লচিত্ততা ও আনন্দের সাথে উবূদিয়ত এখতিয়ার করা, পরন্তু অনুগত ও অধিনস্ত হয়ে থাকার ওপর।

এজন্যই বলা হয়ে থাকে, অসংখ্য মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা হাসিল করে ফেরেশ্তা ও আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গী হয়েছে, যেমন প্রভুভক্ত গোলাম ছায়ার মত সবসময় মনিবের সাথে লেগে থাকে। অনেকে অলসতা করে জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছেছে। (সুতরাং উসূল ইলাল্লাহ বা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাকে সরাসরি আল্লাহর তাওফীক ও ফযলের প্রসূত ফলও বলা চলে। কেননা, আল্লাহর তাওফীক ছাড়া বান্দা হিম্মতও করতে পারে না। একে রিয়াযত ও মোজাহাদার ফল বললেও ভুল হবে না। কেননা হিম্মতওয়ালদের ওপরই আল্লাহ্‌র ফযল হয়ে থাকে।)

মোটকথা, নফ্সকে নূরানী বানানো ও তাযকিয়া'র জন্য হুকুমের অনুগত গোলাম হওয়া। এ গোলামী ও দাসত্বের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অত্যন্ত জরুরি। মূলত উচিত হচ্ছে, নিজের গোলামীর ওপরে গর্ব করবে ও দাসত্বকে নিজের ইয্যত মনে করবে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার মহব্বত ও আপনার হাবীবের মহব্বত নসীব করুন। নিঃসন্দেহে যাবতীয় বিষয়গুলো মহব্বতেরই ফসল। আপনার তাওফীক ছাড়া মহব্বত লাভ করা অসম্ভব।

স্মর্তব্য, ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মূসা আ. মাটির ওপরে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। অবশ্য সে মাটি বলতে পৃথিবীর মাটি বা যমীন নয়; বরং রূহের জগতের রূহানী মাটি উদ্দেশ্য, যার ওপর নফ্স ও রূহ্ গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

বলাবাহুল্য, এ গড়াগড়ি খাওয়া বান্দার উপার্জন ও কর্ম। এ গড়াগড়ি কী ধরণের তা একমাত্র তিনিই জানেন, যিনি রূহের জগতে বিচরনশীল। কাজেই, যে এর পদ্ধতি শিখতে চায়, সে যেন এ বিষয়ের অভিজ্ঞ মহান ব্যক্তিদের থেকে শিখে নেয়। এ কারণেই এ রাস্তায় চলার জন্য শায়খের হাত ধরা ও নিজকে তাঁর হাতে সোপর্দ করা নেহায়েত জরুরি। যেহেতু তিনি রূহের জগতে উপনীত, তাই এ পথ তিনিই বাতলাতে পারেন।

হযরত মূসা আ. প্রথম দিকে প্রত্যহ একবার সে মাটিতে লুটোপুটি খেতেন। যখন তাঁর কামালিয়ত ও মর্যাদা আরো বুলন্দ হল, তখন তিনি দিনে হাজারবার লুটোপুটি খেতে লাগলেন। (কেউ যেন আদৌ এ ধারণা না করে যে, উঁচু মর্যাদা লাভ হওয়ার পর তিনি বিনয় প্রকাশের এ আমলটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।) কেননা মানুষের আত্মা যে পরিমাণ স্বচ্ছ, নূরান্বিত ও উন্নত হয় ততই তার ইবাদত, ইখলাস, উবূদিয়ত, খালেকের হামদ ও প্রশংসা এবং স্বভাব-চরিত্রের সৌন্দর্য বাড়তে থাকে।

শায়খ আবূ সাঈদ আবুল খায়ের রহ. বলেন, উপকারী ইলম তার বাহকের অন্তর হতে অহংকার দূর করার পর বিনয়, সংশ্রবের পর নির্জনতা এবং দুনিয়ার লোভ ছাড়িয়ে দুনিয়া ত্যাগের প্রতি অনুরাগী করে। অনন্তর যে ইল্‌ম আলেমের ভিতরে অহমিকা ও নাম যশের অনুরাগ সৃষ্টি করল সে ইল্‌ম থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি ক্ষতিকর ইল্‌ম থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

শায়খ আবূ সাঈদ রহ. আরো বলেন, মা'রেফতের সূচনা তারকার মত ও তার মধ্যমাংশ চাঁদের মত উজ্জ্বল হয় আর শেষভাগ হয় আকাশের সূর্যের মত প্রখর আলোকিত, যা সকল আধাঁরকে আলোতে পরিণত করে এবং সমস্ত আয়েব থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে একীনের তাজাল্লী দ্বারা সীনা ও কলবের ময়দানকে উদ্ভাসিত করে তোলে। আল্লাহ্ তায়ালা এ অমূল্য রত্ন আমাদের নসীব করুন, গাফেলদের গাফেলতির নিদ্রা ভেঙ্গে দিন।

পরিশেষে সকল তা'রীফ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হোক পরিপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান রহমতের বারিধারা নবীকূল সরদার হাবীবে কিবরিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর আওলাদ, আসহাব, সকল মুত্তাবেয়ীন ও মুহিব্বীনের ওপর। অবতীর্ণ হোক চির নির্মল করুণাধারা। পরন্তু মাওলা পাক সন্তুষ্ট হোন আমাদের সকলের প্রতি। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

بِعَوْنِ اللهِ تَعَالٰى تَمَّتْ بِالْخَيْرِ